জাতিভেদ-রহস্য

(প্রথম ভাগ)

প্রণেতা ও প্রকাশক

শ্রীতুষ্টলাল বিদ্যাবিনোদ

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

পোষ্ট—কুমারী, নদীয়া।

মাহ শ্রাবণ সন ১৩৩৪, খৃষ্টাব্দ ১৯২৭।

কলিকাতা।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

"পদে স্থিতস্য মিত্রা যে তে তস্য রিপুতাং গতাঃ
ভানৌ পদ্মে জলে প্রীতি স্থলোদ্ধরণে শোষিণ ॥'

"প্রহৃষ্যতি ন সম্মানে নাবমানেন কুপ্যতি।
নক্রুদ্ধঃ পরুষ ব্রুয়াদেতৎ সাধোস্তুলক্ষণম্ ॥"

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে
শ্রীনলিনচন্দ্র পাল বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

ভগবৎ কৃপায় চতুর্দ্দশ বৎসর পরে **জাতিভেদ-রহস্যের** দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে সমর্থ হইলাম। এই সংস্করণে পূর্ব্বকার কোন কোন বিষয় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং কয়েকটী নূতন বিষয়ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। দুরূহ বিষয়ের সরল ব্যাখ্যা এবং অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি নিম্নরেখ করিয়া পাঠকগণকে বিচার করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং গ্রন্থের কলেবরও কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

গ্রন্থের সমধিক "কাট্তি" এবং সমাজে সমাদর হইলে বিশেষতঃ গ্রন্থকার জীবিত থাকিতে, গ্রন্থের দ্বিজত্ব প্রাপ্তিতে এত দীর্ঘকাল বিলম্ব ঘটিল কেন—সে বিষয়ে আমার সহৃদয় বন্ধুবর্গ, পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক, অনুগ্রাহক মণ্ডলী বিশেষতঃ মাননীয় সমালোচকগণ নিশ্চয়ই একটী কৈফিয়ৎ তলব করিবেন মনে হয়।

দীন গ্রন্থকারের কৈফিয়ৎ এই—

১। মদীয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় অসাধারণ গুরুত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ! ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে যে "বর্ণাশ্রমের" অস্তিত্বই নাই, সেখানে বঙ্গীয় বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়, স্ব স্ব "জাতির" বর্ণ নির্ণয় পূর্ব্বক একটী "পছন্দসই" নাম ও উপনয়ন গ্রহণ এবং তদনুসারে জাতীয় জীবন গঠনের যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে আমার ইচ্ছা থাকিলেও আস্থা নাই। সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে, বঙ্গেশ্বর বল্লালসেনের সময়ে যে প্রথা এ দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান শোচনীয়তা আনয়ন করিয়াছে বলিয়া অনেকে অনুতাপ করেন, তাঁহারাই দেখি আবার ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বা বৈশ্যত্বের দাবী করিয়া সমাজে ভেদ-নীতি ও

বিচ্ছিন্নতারই পোষকতা করিতেছেন ! আমার বিশ্বাস বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের পক্ষে ঐরূপ কার্য্য Refined Caste System বা অভিনব জাতিভেদ প্রথার পুনরাভিনয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্বদেশহিতৈষীগণ যে "জাতি-সংগঠন" বা জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন করিতেছেন—দেশমাতৃকার এক্ষণে যাহা প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, ঐ নীতি তাহার বিরোধী বলিয়াই প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমার মনে হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় তখন আমার তেমন পৃষ্ঠপোষক এবং পক্ষ-সমর্থক কেহ ছিলেন না। যথোচিত বিদ্যা, শক্তি, সহায় ও সামর্থ্যাদিও আমার নাই। কাজেই সুসময়ের অপেক্ষা করাই একান্ত শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলাম। পক্ষান্তরে বঙ্গদেশের শ্রোত্রিয় নাপিত সম্প্রদায়কে যদি আবার হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বর্ণাশ্রমের আশ্রয় লইতে হয়, তবে তাহাদিগকে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—ইহাই আমার অনুমান হইয়াছিল। আমার অনুমান ও সিদ্ধান্ত যে নেহাৎ অমূলক বা নিরর্থক হয় নাই, তাহা বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের প্রকৃত মঙ্গলকামী, সূক্ষ্মদর্শী, নিরপেক্ষ সুধীমাত্রই স্বীকার করিবেন, আশা করি।—

অগতির গতি, বিশ্বপতির বিচিত্র বিধানে স্বভাবের গতি রোধ করে কাহার সাধ্য; এই সুদীর্ঘ ১৪ বৎসরের মধ্যে পরিবর্ত্তনশীল জগতের পরিবর্ত্তনচক্র যে কত দ্রুত গতিতে চলিয়াছে, তাহা বঙ্গদেশের স্বদেশী আন্দোলন, ভারতে সম্রাটের শুভাগমন, অসহযোগ নীতির প্রবর্ত্তন, বিশ্বত্রাস জার্ম্মাণ সমরের সংঘটন, ভীষণ ভীষণ জল প্লাবন, দেশময় ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ, চরকা চক্রের পুনরাবর্ত্তন, রেলগাড়ীর ঘন ঘন লোমহর্ষণ সংঘর্ষ, হিন্দুমুসলমানে সংঘর্ষ, মটরকার, এরোপ্লেন, তারহীন টেলিগ্রাফ, টরপেডো, জেপ্লিন প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ও অবশেষে মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুনারী হরণ ও তাহাদিগের প্রতি পাশবিক নির্য্যাতনের বিষয় ভাবিলেই

যথোচিত উপলব্ধি হইবে। কে বলিবে ভারতের ভাগ্যবিধাতা বিশ্বপিতা ভারতবাসীর চিরনিদ্রা ভাঙ্গিবার জন্যই এই সকল ভয়াবহ, অলৌকিক ও অভূতপূর্ব্ব ঘটনার সৃষ্টি করিতেছেন না? যে দেশে "জাতি" বিশেষের ছায়া মাড়াইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, সেই দেশে এখন "অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন" সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সর্ব্বজন গ্রাহ্য হইয়া উঠিয়াছে। যে দেশের হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য দেশবরেণ্য, পরম ব্রাহ্মণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও পূর্ণমনোরথ হইতে পারেন নাই, আজ সেই দেশে প্রতি সপ্তাহে কতগুলা হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রকাশ করিয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকগণও ধন্য হইতেছেন!

যে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু উচ্চশ্রেণীর পূজার দালানে প্রতিমা দর্শন করিবারও সুযোগ পাইত না, সেই হিন্দু সমাজে অধুনা "শুদ্ধি" প্রথার দ্বারা খৃষ্টান, মুসলমান পর্য্যন্ত সাদরে গৃহীত হইতেছে, এবং তাহারা আবার ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির উপাধিও প্রাপ্ত হইতেছে! বিশেষতঃ হিন্দু মুসলমানে সসম্মানে ২।১টী উচ্চঘরের বিবাহও ইতঃমধ্যে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। অতএব এক্ষণে আমার সেই দায়ীত্বপূর্ণ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা একান্তই সময় ও স্বভাবের অনুকূল বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। "অসময়ে দিলে চাষ, পুরে কি মনের আশ!"

২। বিগত ১৯১১ সালের সেন্সাস্ (মানুষ গণনা) হইবার পূর্ব্বে উক্ত সেন্সাসে বঙ্গীয় নাপিতগণের সাম্প্রদায়িক নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কি লেখান উচিত, ইহা লইয়া উক্ত সমাজের নেতৃস্থানীয় কতিপয় সমাজ বন্ধু কলিকাতায় আসিয়া আমার সহকারিতা চাহেন। বঙ্গীয় অন্য কতিপয় হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুকরণে তাঁহারা ১৯০৮ সালের পূর্ব্বেই এই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনেক সভা সমিতির অধিবেশন, অধ্যাপক

ব্রাহ্মণাদির ব্যবস্থা গ্রহণ, এবং নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টাও হইয়াছিল। অবশেষে স্থির হইয়াছিল যে নাপিতজাতি—"সূক্ষ্মাস্ত্রজীবী ক্ষত্রিয় !" তখন কলিকাতাই বৃটিশ ভারতের রাজধানী ছিল এবং বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম তখন বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অধীন ছিল। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের Translators অনুবাদকগণের মধ্যে "ঠাকুর তুলসীপ্রসাদ সিংহ" নামে একজন উপবীতধারী "নাই ঠাকুরও" ছিলেন। তিনিই এই বিষয়ে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া তখনকার সর্ব্বজনমান্য দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি সম্পাদিত "বেঙ্গলীতে" ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলে ঐ ব্যাপার লইয়া বঙ্গীয় নাপিত সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এমন কি ১৯১১ সনে সেন্সাস্ হইবার সময়ে সেন্সাস্ কর্ম্মচারীগণও সে জন্য বিশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছিলেন। (১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস্ রিপোর্ট দেখুন) কিন্তু ঐ ব্যাপার তখন বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত ও সর্ব্ববাদী সম্মত হয় নাই। অধিকাংশ লোকই ঐ বিষয়টীর পরিণাম ও গুরুত্ব বুঝিতে পারে নাই। বিশেষতঃ কলিকাতা সহরবাসী নাপিতবন্ধুগণ তখনও সাড়াই দেন নাই; উক্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক একখানা ইতিহাসও তখন ছিল না। তথাপি ঠাকুর তুলসী প্রসাদ সিংহ (বেহারি) প্রমুখ কতিপয় সমাজ নেতা বঙ্গীয় "মসিজীবী ক্ষত্রিয়ের" অনুকরণে "সূক্ষ্মাস্ত্রজীবী ক্ষত্রিয়" লেখাই নাপিত সমাজের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। "দেব বর্ম্মার" অনুকরণে বঙ্গীয় নাপিত সমাজে ২১ জন "দেব সরকারও" দেখা দিয়াছিল। আমার তখনকার যৌবন সুলভ উচ্ছৃঙ্খল প্রাণেও কিন্তু এই উদ্যম ও অনুষ্ঠান আদৌ ভাল লাগিল না, অধিকন্তু আমি দেখিলাম যে, সামান্য যে কিছু প্রমাণাদি তাঁহারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক নাপিতের "ব্রাহ্মণত্বের"ই পরিচায়ক ! ভুল ধারণার বশে অথবা দূরদর্শিতার অভাবে তাঁহারা ঐ রূপ অনর্থকরী চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন। সুতরাং আমারই প্রতি-বন্ধকতায় তাঁহাদের সেই চেষ্টা একরূপ বিফল হইল।

আমি তখন নাপিত সমাজের ভাল করিয়াছিলাম কি মন্দ করিয়াছিলাম, তাহা যাঁহারা আমার এই সামান্য পুস্তক পড়িয়াছেন ও পড়িবেন তাঁহারাই বিচার করিয়া দেখিবেন। আরও শুনিয়া সুখী হইবেন যে সেই ঠাকুর তুলসী প্রসাদ সিংহকে যখন এই পুস্তকের একখণ্ড উপহার দেওয়া হইল, তিনি তাহা পড়িয়া অনুতপ্ত ও মর্ম্মাহত হইলেও কিন্তু কলিকাতার চাকুরী ছাড়িয়া দেশে যাইয়া বৃদ্ধাবস্থায়, তাহার সেই "সিংহ" উপাধিরূপ লেজটী কাটিয়া "তুলসী প্রসাদ শর্ম্মা" সাজিয়াছেন এবং আমার সেই নাপিত কুলদর্পণের অনুকরণে বা অবলম্বনে হিন্দীভাষায় "নাই-কুল-উৎপত্তি" বলিয়া এক পুস্তকও নাকি হিন্দুস্থানে প্রচার করিয়াছেন। পরিণামে সারা হিন্দুস্থান, পাঞ্জাব এবং দাক্ষিণাত্যের নাপিতেরা "নাই ব্রাহ্মণ" নামে পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছে এবং "নাই ব্রাহ্মণ পত্রিকা," "নাই ব্রাহ্মণ সভা" ও গুরুকুল প্রভৃতি অনেক শুভানুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং হইতেছে। বাংলা জুড়েও ঐ রব উঠেছে। বঙ্গদেশেও নাপিত-সমাজে প্রায় ৩০।৩৫টী সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আরও আনন্দের বিষয় এই যে বিগত ২০।২১ চৈত্র ১৩৩২ সালে কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরীতে "নিখিল বঙ্গীয় শ্রোত্রিয় নাপিত জাতির" এক Conference অর্থাৎ মহাসভায়, এ দীন গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ দিয়া এক প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং আমার নামশূন্য, বাচালতাপূর্ণ, সেই সামান্য পুস্তক খানাই যে এত সফলতা উৎপাদন করিয়াছে, আমার নিশ্চেষ্টতা ও নীরবতাই তাহার গৌণ কারণ এবং পরম সহায় স্বরূপ হইয়াছে।

৩। "বেঙ্গলী"তে শ্রীযুক্ত তুলসীপ্রসাদ সিংহ যে প্রবন্ধ ছাপাইয়াছিলেন (বোধ হয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে) উহার অবিকল নকল আবার চট্টগ্রামের শীল বাবুদের ব্যয়ে Foolscap কাগজে উক্ত তুলসীপ্রসাদজীর সাক্ষরিত ও মুদ্রিত হইয়া বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র নাপিত-সমাজের মধ্যে

বিতরিত হইয়াছিল। ইংরাজীতে লেখা সেই "সূক্ষ্মাস্ত্রজীবী ক্ষত্রিয়ের" ইস্তাহার এখনও বোধহয় অনেকের ঘরে আছে। বাহুল্য বোধে আমি আর উহা প্রকাশ করিলাম না। যেহেতু

"সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তি মরণা তিরিচ্যতে।"

এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য অনেকেই বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হইয়া আছেন, অনেক অর্ডারও আসিয়াছে। আমারও দুই খণ্ড একত্রে ছাপাইয়া বাঁধাইবার ইচ্ছাই ছিল, কিন্তু তাহা হইলে মূল্যাধিক্যবশতঃ অনেকেই ক্রয় করিতে পারিবে না বিচার হওয়ায়, স্বতন্ত্রভাবেই ২য় খণ্ড ছাপান হইতেছে। বঙ্গীয় শ্রোত্রিয় নাপিতগণের সম্প্রাদায়িক নাম কি হওয়া উচিত, প্রমাণাদিসহ তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে সবিশেষ বর্ণিত হইবে এবং আশা করি পাঠকগণের নিকট ১ম খণ্ড যেরূপ প্রীতি, আদর ও সহানুভূতি পাইয়াছে, ২য় খণ্ডও তদনুরূপ পাইবে। তবে উহার আকার ও মূল্য এই খণ্ডেরই অনুরূপ হইবে, পূর্ব্বকার ১ম খণ্ডের মত ডিমাই সাইজের পুঁথির আকার হইবে না।

এই পুস্তকে প্রসঙ্গক্রমে বাঙলাদেশের প্রায় সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের বিষয়ই স্বল্পাধিক পরিমাণে আলোচিত হইয়াছে। এবং ইহাতে অবলম্বিত মূলনীতি সকল সম্প্রদায়েরই উপকার সাধক সুতরাং অবলম্বনীয় হইবে বোধে ইহার নাম এখন হইতে **জাতিভেদ-রহস্যই** রাখা হইল। জাতিভেদ-পীড়িত বাঙালী জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যা, শিক্ষা ও সমালোচনাদি দ্বিতীয় খণ্ডে থাকিবে। নিবেদন ইতি—
২৯শে শ্রাবণ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ ভট্টারকবার।

কলিকাতা।

ত ল ব

দীন গ্রন্থকার

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশের প্রায় সকল হিন্দু জাতিরই এক একখানা জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ জাতি হইয়াও হতভাগ্য নাপিত জাতি কেবল এ বিষয়ে পশ্চাদ্‌পদ। শিক্ষা ও অর্থের অভাবই ইহার মুখ্য কারণ। পরন্তু অন্যান্য জাতির বিবরণ যেন ছাই চাপা ছিল, সামান্য বাতাসেই প্রকৃত বৃত্তান্ত বাহির হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু নাপিত জাতির ইতিহাস পাষাণ-চাপা! সেই ভীষণ পাষাণকে অপসারিত করিয়া প্রকৃত তথ্য উৎঘাটন করা বাস্তবিকই দুঃসাধ্য। এইজন্যই বোধ হয় জাতি-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে কেহ অদ্যাবধি নাপিত জাতির আদ্যোপান্ত ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হয়েন নাই। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই হউক আর স্বজাত্যনুরাগবশতঃই হউক, প্রায় ৪ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই কঠোর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম। প্রথমতঃ জাতিগত ভাবেই লিখিতে আরম্ভ করি, কিন্তু ক্রমশঃ এমন কতকগুলি উপকরণ সংগৃহীত হইল যদ্বারা বুঝিলাম যে নাপিতের ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটী প্রয়োজনীয় অংশ। এবং উহা সম্পন্ন করিতে পারিলে বাস্তবিকই ভারতের ইতিহাসের অঙ্গ পুষ্ট হইবে। এবং বাঙ্গলার জাতি বিভ্রাটেরও অনেক রহস্য-ভেদ হইবে। এইজন্য ইহার নামকরণ করা হইল "জাতিভেদ-রহস্য"। লোকমত সংগ্রহ করা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। সময় ও সামর্থ্যে কুলায় নাই বলিয়া পুস্তক খানিকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিতে হইল। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের মতামত বুঝিয়া দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিব, আশা করিতেছি।

যেরূপ দেশ কাল পড়িয়াছে এবং সামাজিকগণের মধ্যে যেরূপ রুচির নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় অনেকে আমার এই উদ্যমকে

লক্ষ্য করিয়া—"চ্যাঙ্গ যায়, ব্যাঙ্গ যায়, খল্‌সে বলে আমিও যাই"—ইত্যাকার কত বিদ্বেষ ও উপহাসপূর্ণ বচনই না আওড়াইবেন। কিন্তু আমি যদি নাপিতকে স্বকর্ম্ম ত্যাগ করিতে এবং পৈতা বিভ্রাটে যোগ দান করিতে পরামর্শ না দিই, তবে নিশ্চয়ই কাহারও "পাকাধানে মই দেওয়া" হইবে না। আমার বিশ্বাস সুধী সজ্জনের কাছে ঐরূপ বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত অসার বাক্য কখনই স্থান পাইবে না। পক্ষান্তরে গ্রন্থের শুভ উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সফল হইলেও একটী চিরদরিদ্রীকৃত সজ্জাতির মহান্ উপকার সাধিত হইতে পারে। নাপিত জাতি ভারতীয় আর্য্যজাতির একটী প্রধান শাখা। ইহাকে বাদ দিলে ভারতের ইতিহাসেরই অঙ্গ ভঙ্গ হইবে। ইতিহাস সমাজের তথা দেশের প্রাণ-স্বরূপ। যে সকল জাতির ইতিহাস নাই, তাহাদের হৃদয়, আত্মসম্মান এবং সার্ব্বজনীন উন্নতিও নাই। মুখ ও মস্তকের কলঙ্ক ও জড়তাপনয়ন পূর্ব্বক দেহের সৌন্দর্য্যবিধান করিতে যেমন দর্পণের আবশ্যক, জাতীয় ইতিহাসও সমাজ গঠন পক্ষে তাদৃশ কার্য্যকরী,—এই কারণেই গ্রন্থের অন্য নাম "নাপিত-কুল-দর্পণ" রাখা হইল। ইহা দ্বারা নাপিত সমাজের এবং পাঠকবর্গের মধ্যে কাহার কোন উপকার সাধিত হইলে শ্রম সফল মনে করিব।

প্রকাশ থাকা আবশ্যক—এই ইতিহাস-বৃক্ষের প্রধান শাখা—বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচার পদ্ধতি; এবং যাঁহার ঐশ্বর্য্য, বীরত্ব, অসীম সেনাবল ও অসাধারণ রণনৈপুণ্যের কাহিনী শুনিয়া, ইতিহাস-বিশ্রুত দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজণ্ডার সিন্ধুনদ পার হইতে সাহস করেন নাই, ভারতের সেই একছত্র সম্রাট মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের জীবনীর সহিত নাপিত সমাজের ইতিহাস ওতপ্রোত-ভাবে সম্বন্ধ। এইরূপ শাখা প্রশাখা, ও তাহাদের অধঃপতন এবং মীমাংসাদি বিবরণ লইয়া দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ হইবে। সংপ্রতি মূল কাণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে ভুল ভ্রান্তি ও ত্রুটী থাকাই স্বাভাবিক।

নানাকারণে ইহার প্রুফ্‌গুলিও ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। যদি কোন মহানুভব দয়া করিয়া গ্রন্থের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া দেন অথবা নাপিত জাতি সংক্রান্ত কোন নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহা সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব। ইহাতে জাতিভেদ-পীড়িত ক্ষত-বিক্ষত সমাজে তুলনায় সমালোচনা দ্বারা নাপিতজাতিকে "খুঁড়িয়ে বড়" করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয় নাই। অপরকে খাটো করিয়া আপনাকে বড় করার নীতিতে লেখকের আদৌ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নাই। সমাজের মস্তক ব্রাহ্মণ হইতে জল আচরণীয় যাবতীয় জাতি লইয়া যে সমাজ, তাহার সহিত যে জাতি অবিচ্ছিন্ন-ভাবে জড়িত, এই গ্রন্থ সেই নাপিত জাতির যথাসম্ভব সম্পূর্ণ ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টা এবং শাস্ত্রোক্ত তথ্য সমূহের বিচার মাত্র। তথাপি গ্রন্থকারের নামের দোষ বা গুণে অনেকস্থলে সমালোচনার দোষ গুণ ঘটিতে দেখা যায়, এজন্য গ্রন্থকারের নাম আপাততঃ প্রকাশিত হইল না। এবং সেই জন্যই নাপিতের বর্ণ-নির্ণয় করিয়াও পুস্তকের ১৬৯ পৃষ্ঠায় বন্ধনীর মধ্যে উহ্য রাখা হইল। সমালোচকগণ সানুগ্রহ খাঁটী কথা বলেন, ইহাই দীন গ্রন্থকারের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

এই পুস্তক সঙ্কলন ব্যাপারে প্রাচীন গ্রন্থাদি ছাড়াও, আধুনিক জাতি-তত্ত্ববিদ্ অনেক গ্রন্থকারের গ্রন্থ সাহায্য লইয়াছি। তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। অভিন্নহৃদয় সুরেন্দ্রনাথের নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই কার্য্যে তিনি আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন। অলমতিবিস্তরেণ।

জনৈক নদীয়াবাসী।

কলিকাতা, মাহ আশ্বিন
১৩২০ সাল।

সূচনা।

প্রায় ৩ বৎসর হইল একদিন সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বাসায় ফিরিবার সময় হাওড়া পুলের অনতিদূরে দেখি ২।৩টা লোক ছুটাছুটি করিতেছে। একটা বোতল হাতে করিয়া একজন আর একজনকে বলিতেছে "ব্রাহ্মণের প্রসাদ অমান্য করিও না বাবা, সাম্নে গঙ্গা, তোমার কিছুতেই ভাল হইবে না।" পেছন থেকে আর একজন বলিতেছে "যানে দেওনা খুড়ো ঠাকুর, বেটা ছোট লোকের খোসামোদ করিয়া কি হইবে; এস খুড়ো ভাই-পো যেটুকু আছে, সাবাড় করে দিই"। ঠিক এই সময় একটি ২৫।২৬ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক গঙ্গা স্নান করিয়া একাকী আর্দ্র বস্ত্রে ঘরে ফিরিতেছিল। আর যায় কোথা, মদের নেশায় বিভোর উক্ত খুড়ো-ঠাকুর টলিতে টলিতে উক্ত স্ত্রীলোকটীকে ধরিবার জন্য উদ্যত হইল। জনবহুল কলিকাতা মহানগরী ও হাওড়া পুলের সন্ধিস্থলে এই ঘটনা, বিশেষতঃ বিদ্যুতের আলোকে ঐ স্থানটী রাত্রি-কালেও দিনমানের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সহসা অনেক লোক জড় হইল। ব্যাপার দেখিয়া স্থানীয় দোকান হইতে একটা লোক বলিয়া উঠিল "আরে ঠাকুর করো কি, করো কি? ও যে ম্যাথরাণী, এইমাত্র ময়লা সাফ্ ক'রে স্নান করতে গিয়েছিল! অমনি ঠাকুর "রাম, রাম" বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। এই দৃশ্যে যুগপৎ মনে হর্ষ, বিস্ময় ও ক্ষোভের উদয় হইতে লাগিল। বাসায় আসিয়া দেখি ডাক পিয়ন কয়েকখানা চিঠি রাখিয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে একখানা পুরাণ ছাপান কাগজের টুক্‌রাও কোথা হইতে আসিয়া পড়িয়া আছে। চিঠিগুলি পড়া শেষ হইলে অন্যমনস্ক-

ভাবে ঐ ছাপান কাগজের টুকরাটুকুও উঠাইয়া লইয়া পড়িতে লাগিলাম, তাহাতে লিখিত রহিয়াছে—

আচম্বিতে পরাশর আইল সেই পথে।
কৈবর্ত্তকুমারী কন্যা দেখিল নৌকাতে॥
আনন্দিত অঙ্গ তার প্রথম যৌবন!
প্রমত্ত কোকিলস্বর জিনিয়া বচন॥
তাহার লাবণ্য দেখি মোহ-প্রাপ্ত মুনি।
জিজ্ঞাসিল কহ তুমি কাহার নন্দিনী॥
কন্যা বলে আমি দাসরাজার কুমারী।
পিতামাতা নাম দিল মৎস্যগন্ধা করি॥
মুনি বলে কন্যা তুমি জগন্মোহিনী।
আমারে ভজহ আমি পরাশর মুনি॥
এত শুনি কন্যা বলে জুড়ি দুই কর।
কন্যাজাতি প্রভু আমি নহি স্বতন্তর॥
সহজে কৈবর্ত্তকন্যা হই নীচজাতি।
অঙ্গেতে দুর্গন্ধ মম দেখ মহামতি॥
দুর্গন্ধেতে নিকটে না আইসে কোন জনে।
আমারে পরশ মুনি করিবে কেমনে॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন পরাশর।
আমি বর দিব কন্যা নাহি কোন ভয়॥
মৎস্যের দুর্গন্ধ আছে তব কলেবরে।
পদ্মগন্ধা হইবেক আমার এ বরে॥
অনূঢ়া আছহ তুমি প্রথম যৌবনে!
সদা এইরূপে থাক আমার বচনে॥

বলিলা আমার জন্ম কৈবর্ত্তের ঘরে ।
মহারাজ বিবাহ করিবে মম বরে ॥
এতেক বচন যদি সে মুনি বলিল ।
পূর্ব্বগন্ধ ত্যজি কন্যা পদ্মগন্ধা হইল ॥
অত্যন্ত সুন্দরী হইল মুনি-রাজ বরে ।
আপনা নেহারি কন্যা হরিষ অন্তরে ॥
পুনরপি কন্যা বলে যুড়ি দুই কর ।
খণ্ডিতে কাহার শক্তি তোমার উত্তর ॥
যমুনার দুই তটে আছে লোকজন ।
যমুনার জলে আছে নৌকা অগনন ॥
ইহার উপায় প্রভু চিন্তহ আপনি ।
লোকেতে প্রচার যেন না হয় কাহিনী ॥
শক্তপুত্র পরাশর মহাতপোধন ।
আজ্ঞায় কুজ্ঝটীকা মুনি করিল সৃজন ॥
যমুনার মধ্যে দ্বীপ হইল তখন ।
মৎস্যগন্ধা কন্যা মুনি করিল রমণ ॥
সেই কালে গর্ভ হইল কন্যার উদরে ।
ব্যাসদেব জন্মিলেন বিখ্যাত সংসারে ॥
দ্বীপে জন্ম হেতু তার নাম দ্বৈপায়ন ।
চারিভাগ কৈল বেদ ব্যাস সে কারণ ॥
জন্মমাত্র জননীরে বলেন বচন ।
আজ্ঞা কর মাতা আমি যাব তপোবন ॥
যখন তোমার কিছু হবে প্রয়োজন ।
আসিব তোমার ঠাঁই করিলে স্মরণ ॥

জননীর আজ্ঞা পাইয়া গেল তপোবন।
তোমারে কহিনু এই পূর্ব্ব-বিবরণ ॥

পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কাশীরাম দাসের মহাভারতের ব্যাসদেবের জন্মবিবরণ হইতে উক্ত খণ্ডাংশটুকু কিরূপে ছিন্ন হইয়া উপেক্ষিত ভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। যাহা হউক উক্ত মৎস্যগন্ধার বিবরণপাঠান্তে আবার সেই মাতাল ও ম্যাথ্রাণীঘটিত বিষয় স্বতঃই আমার মনে উদিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ মহামুনি পরাশর ও ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধার সহিত পূর্ব্বোক্ত মাতাল "খুড়োঠাকুর" ও সেই ম্যাথরাণীর চরিত্রের তুলনা আরম্ভ হইল। বিষয় কিনা পাপ-তাপ-জড়িত, দুর্ব্বার-কলি-কলুষিত এই অধম যুগে একজন মাতাল ব্রাহ্মণ, "ম্যাথরাণী নাম শুনিয়াই ঘৃণাসহকারে নিজের পাপপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারিল, আর সেই ধর্ম্মযুগে, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায়নিরত, মহাজপ-তপঃ-সম্পন্ন একজন পরম ব্রাহ্মণ নিজের কামপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারিল না; লজ্জা ও বিবেকের মাথায় পদাঘাত করতঃ মনুষ্যসমাজে যথেচ্ছাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল! ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, সেকালেও একালে কি এত প্রভেদ!! ক্রমশঃ এই রহস্যময় জটিলতত্ত্বের কারণানুসন্ধানে যতই বিব্রত হইতে লাগিলাম, ততই যেন বিস্ময়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কারণ আর খুঁজিয়া পাই না। এইরূপ চিন্তাতে অনেক রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর একটু তন্দ্রা আসিলে, কে যেন সহসা বলিয়া দিল উহার প্রধান কারণ **জাতিভেদ**।

পূর্ব্বকালে আর্য্যসমাজে জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত ছিল না, ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তাঁহারা বেদোক্ত ধর্ম্মপালনে ও পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন, জীবহিংসা ছিল না, চন্দনে বিষ্ঠায় সমান জ্ঞানে

আত্মপরের মঙ্গল সাধন করিতেন। শাস্ত্র বলিতেছে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ডপ্রয়োজনম্'' এই জন্য একটী পুত্রের দরকার। কিন্তু রোগ-শোক-পীড়িত সংসারে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া ঘর কন্না করিতে গেলে তপস্যাদি নির্ব্বাহ করা কঠিন হইত। এখনকার কালের মত জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকিলে হয়ত পরাশর মুনিকে ব্রাহ্মণসমাজে "একঘরে" হইয়া থাকিতে হইত। কিন্তু এ সব ঝঞ্ঝাট তখন ছিল না, সুতরাং নীচ জাতীয়া, দুর্গন্ধময়ী ধীবর-কন্যার গর্ভে ব্যাসদেবের ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত একটী পুত্রোৎপাদন করিয়া মহামুনি পরাশর ধর্ম্ম বা সমাজবিরুদ্ধ কোন অন্যায় অনুষ্ঠান করেন নাই। পরন্তু উদারতা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও সমাজ-ধর্ম্ম-রক্ষার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। আর ঐ কলির বামুন "খুড়োঠাকুর" মেথরাণীকে ছাড়িয়া দিল, কেবল জাতি যাওয়ার ভয়ে! উহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জ্ঞান নাই, শুদ্ধাচারের কোন ধারও ধারে না, বিশেষতঃ মাতাল অবস্থাহেতু ভালমন্দ বিচার করিবার অবসরও তাহার ছিল না। তবুও সে দুষ্প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারিল, কেন?—না জাতি যাওয়ার ভয় আছে, রাজদণ্ডের ভয়ও আছে। এখন আর বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ বলিয়া নিস্তার পাইবার আশা নাই।

পাঠক এই সামান্য উদাহরণদ্বারা বর্ত্তমান জাতিভেদের উপকারিতা ও অপকারিতা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

আচ্ছা যখন জাতিভেদ ছিল না, ব্রাহ্মণ শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন, শূদ্রও ব্রাহ্মণকন্যার পাণিপীড়ন করিতেন, তখন আবার বর্ণসঙ্কর কিরূপে উৎপন্ন হইল আর সেই বর্ণসঙ্কর দ্বিজসেবী শূদ্র বলিয়াই বা কেন পরিগণিত হইল; অধিকন্তু আমরা এই নাপিত জাতি চিরদিন বৈদিকক্রিয়াকর্ম্মে ব্রাহ্মণের সাহায্য করা স্বত্ত্বেও বা কেন এরূপ হীনাবস্থায় পতিত হইলাম ইত্যাদি ব্যাপার অনুধাবন করিতে করিতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ-রচনার সূচনা হইল—১৩১৬ সাল, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ।

উ ৎ স র্গ

স্বর্গীয় পিতৃদেব,

জানিনা কোন সূত্রে আপনি "ভাগবত" নাম ধারণ করিয়াছিলেন। আর আমার ন্যায় অকৃতি, অধম, ভাগ্যহীন সন্তানকে লালনপালন করতঃ অবশেষে দুর্ব্বার-সংসার-সাগরে ভাসাইয়া দিয়া নিজে পরপারে গিয়া শান্তি-সুখ ভোগ করিতেছেন। ইহাই কি ভাগবতের লীলা! অবোধ অর্ব্বাচীন সন্তানের জন্য কষ্ট পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া পিতা কি পুত্রের আব্দার রক্ষা করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইবেন? পর-পারে থাকিলেও যে মাঝে মাঝে স্নেহের ডুরীতে টান লাগে! পিতঃ, ঐ স্বর্গীয় স্নেহের আকর্ষণই যেন দীনহীন সন্তানকে সর্ব্ববিধ পাপতাপ হইতে রক্ষা করে। সেই ভরসাতেই আমি আমার এই বাচালতাপূর্ণ ক্ষুদ্র "জাতিভেদ-রহস্য" আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম। অকিঞ্চনের আশা— পিতা সন্তুষ্ট হইলে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট হইবেন; যেহেতু—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ওঁ তৎ সবিতুঃ

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃনু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

জাতিভেদ-রহস্য

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

জাতিভেদের নিদান ও তাহার পরিণাম এবং অবতার-তত্ত্ব।

বিশ্ব-নিয়ন্তার অপার করুণায়, বিচিত্র বিধানে ও অলঙ্ঘ্য নিয়মে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে নানাবিধ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে এই সকল প্রাণী আবার বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক বিভিন্ন প্রাণী-সমষ্টি, এক একটী "জাতি" নামের বিষয়ীভূত হইয়াছে। মানুষ এই প্রাণীর রাজ্যে, শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। দেশ-কাল-ভেদে এবং জল বায়ুর উৎকর্ষ বা অপকর্ষানুসারে একই প্রাণী বিভিন্ন আকার ও স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কারণে একই মানুষ ইংলণ্ডে বা আফ্রিকার মরুময় দেশে জন্মিলে যেরূপ আকার ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, আমাদের বাঙ্গালা দেশে জন্মিলে সেরূপ আকার ও স্বভাব-যুক্ত হয় না। আকারে সাদৃশ্য থাকিলেও প্রকৃতির অর্থাৎ স্বভাবের পার্থক্য থাকিবেই। এইজন্য ঋষি বলিলেন—"আকৃতি-প্রকৃতি-গ্রাহ্যাঃ জাতিরিতি ন সংশয়ঃ"। বাস্তবিক

আকার এবং প্রকৃতিগত এই পার্থক্যই, জগতের এই বিশাল মনুষ্য সমাজকে নানাবিধ জাতিতে বিভক্ত করিয়াছে। ইংরাজিতে এইরূপে বিভক্ত মনুষ্য সম্প্রদায়কে এক একটি Nation (নেসন্) অর্থাৎ জাতি বলে যথা—ইংরাজ, জার্ম্মাণ, রুসিয়ান, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, নেপালি প্রভৃতি। এইরূপে বিভক্ত নেসন বা জাতি আবার আমাদের দেশে নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া হিন্দু সমাজের নেতাগণের অপূর্ব্ব বিধানে "**জাতিভেদ**" (Division of Nation) নামে পরিচিত হইয়াছে, ইহারই অপর নাম Caste system বা জাতিভেদ প্রথা। পরিণামে একই বাঙ্গালী জাতি গোপ, নাপিত, তিলি, তাম্বুলি, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মালাকর, কর্ম্মকার প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া অধুনা এক একটী স্বতন্ত্র "জাতি" নামে কথিত হইতেছে। অতএব অধুনাতন হিন্দু সমাজের, এই **জাতিভেদ**—"আকৃতি প্রকৃতি গ্রাহ্যাঃ" নহে—অর্থাৎ ঈশ্বর-কৃত নহে। এই রহস্য ভেদ করিতেই এই "**জাতিভেদ রহস্যের**"—সৃষ্টি।

আমরা হিন্দু—স্বভাবতঃই অদৃষ্টবাদী, শাস্ত্র ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী। বর্ত্তমান যুগে সর্ব্ব উপনিষদের সার শ্রীমদ্ভাগবৎগীতা আমাদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই প্রধান অবলম্বন স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। এই গীতা অবলম্বন করিয়াই জাতি-রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করা যাউক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই গীতায় স্বয়ং বলিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহং॥

অর্থাৎ জগতে যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয় তখনই তিনি নিজেকে সৃষ্টি করেন অর্থাৎ অবতার গ্রহণ করেন। সাধারণের সুবিধার্থে আরও পরিস্কার করিয়া বলিলেন—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

অর্থ—জগতের সাধুগণের রক্ষা ও পাপীগণের বিনাশ এবং ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা বা ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করিয়া থাকি।

এইরূপেই আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে দশাবতারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে! যথা—

মৎস্যঃ কুর্ম্মঃবরাহশ্চ নৃসিংহ বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চবুদ্ধঃ কল্কী চতে দশঃ॥

মৎস্য, কুর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কী এই দশ অবতার। এতন্মধ্যে নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম ও বলরাম-রূপে তিনি যথাক্রমে হিরণ্যকশিপু, বলী, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, রাবণ ও প্রলম্বাদি অসুরগণকে বিনাশ করিয়া বসুমতীর পাপভারের লাঘব করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধাবতার গ্রহণের প্রত্যক্ষ কোন কারণ দেখা যায় না। আবার উল্লিখিত শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামগন্ধও নাই! শ্রীমদ্ভাগবতের মতে "এতে চাংশঃ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" অর্থাৎ উপরে যে সকল অবতারের নাম করা হইয়াছে, তাঁহারা পূর্ণাবতার নহেন—অংশ বা কলা মাত্র। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ অবতার এবং স্বয়ং ভগবান। যে যে কারণে উল্লিখিত অংশাবতারগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদপেক্ষাও কোন গুরুতর কারণ না ঘটিলে আর স্বয়ং ভগবান পূর্ণব্রহ্মের আবির্ভাব হয় নাই—ইহা সহজেই অনুমেয়! যিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্ভব, তাঁহাকে কোন্ অপরিহার্য্য কারণে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, গোপনে 'গোয়ালার ভাতে পুষ্ট' হইয়া কৃষ্ণ নাম ধারণ করিতে হইল! জগতের সাধুগণের প্রতি কে বা কাহারা তখন অত্যাচার, উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিল? কোন্ পাপীর বিনাশ সাধন তখন ভগবানের

অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছিল? গৌণ কারণ অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু মুখ্য কারণ ত আমরা দেখিতেছি ক্ষত্রিয়-বিনাশ! শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, যে পরশুরাম একবিংশতি বার ক্ষত্রবংশ ধ্বংস করিলেও যাহারা কোনরূপে বাঁচিয়া গিয়াছিল এবং আবার বংশবিস্তার করিয়া সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের বিঘ্নস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল করিবার জন্যই কৃষ্ণাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছিল। তাই ভারতের বিভিন্ন জনপদ হইতে কুরু-ক্ষেত্রসমরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ক্ষত্রিয়ের আনয়ন ও নিধন এবং কিছুকাল পরে আবার স্বকীয় যদুবংশের ছাপ্পান্নকোটী ক্ষত্রিয়ের বিনাশ-সাধন! সে আবার কিরূপ বিনাশ? আত্ম-পর ভেদ নাই, লঘু গুরু মানা নাই। "বিনাশ, বিনাশ" করিয়াই যেন কৃষ্ণাবতারের অবসান হইয়াছে। এই সকল নিহত ক্ষত্রিয়ই কি তখনকার কালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের ভিত্তিস্বরূপ ছিল না? ভারতের ব্রাহ্মণ ত চিরদিনই ক্ষত্রিয়ের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং চতুষ্পাদ হিন্দু-সমাজের প্রধান দুই পদ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পতন হইলে, আপনিই আবার নবভাবে নূতন সমাজ গঠিত হইয়া পুনরায় বৈদিক ধর্ম্মের সংস্থাপন হইবে—ইহাই কি তাঁহার লক্ষ্য ছিল না? ভণ্ড, পাষণ্ড, দুরন্ত, পাপাত্মাগণের বিনাশই যদি তাহার অবতারের উদ্দেশ্য হয়, তবে ত কৃষ্ণাবতারে তিনি ক্ষত্রিয়-বিনাশ করিতেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের রাধার ভাব ত গীতার মধ্যে পাই না। পক্ষান্তরে ক্ষত্রিয়-বিনাশ করা, আর চাতুর্ব্বর্ণ্যের ধ্বংস করা একই কথা। কারণ দেশের রাজার জাতি বিনষ্ট হইলে, নিগৃহীত, নিরাশ্রয় প্রজাগণ, ধন-মান-প্রাণ রক্ষাকারী, পরমোপকারীর চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, তাঁহাকেই হৃদি-সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিয়া থাকে। সুতরাং প্রাচীন বর্ণাশ্রম ব্যভিচার ধ্বংস করাই যেন শ্রীকৃষ্ণলীলার গূঢ় উদ্দেশ্য। কি ভয়াবহ ঘটনা,

কি ভীষণ দৃশ্য ! কি শোচনীয় পরিণাম ! ভাবিতেও কষ্ট হয়। কোথায় জার্ম্মাণ যুদ্ধের ভীষণতা ! তুলনায় সমালোচনা করিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে এই ভারতে যে ধ্বংস-লীলার তাণ্ডব নৃত্য এককালে চলিয়াছিল, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য দেশের কোন যুদ্ধাপেক্ষা প্রাণবিনাশ বিষয়ে, তাহা কোন অংশে ন্যূন নহে। ন্যূনাধিক বিংশতি বৎসরের মধ্যে কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী আর প্রভাসতীর্থে ছাপ্পান্ন কোটী ! পাঠক, একবার ভাবুন দেখি —কোন্ জার্ম্মান, কোন্ ইংরাজ বা কোন্ অসভ্য বুয়র পিতামহ, শিক্ষাগুরু ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের বক্ষে জ্ঞানপূর্ব্বক অস্ত্রাঘাত বা বাণাঘাত করিয়া তাঁহাদের প্রাণপাত করিয়াছে ? এই যুদ্ধোপলক্ষে অর্জ্জুন তাঁহাকে বর্ণভেদ বা চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—

মর়াসৃষ্টং চাতুর্ব্বর্ণ্যং গুণ-কর্ম্ম বিভাগশঃ,
তস্যকর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যা কর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥

আমার সৃষ্ট যে চাতুর্ব্বর্ণ্য, তাহা গুণ কর্ম্মের বিভাগানুসারে হইয়া থাকে। উহার কর্ত্তাও আমি আবার অকর্ত্তাও বটে। কারণ আমি "অব্যয়" সুতরাং আমার কোন আসক্তি থাকিতে পারে না।

জন্ম লাভের পর মনুষ্য আপনাপন গুণ ও কর্ম্মানুসারে আপনা হইতেই চারিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে সুতরাং ভগবান চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা। স্বার্থপর স্বেচ্ছাচারী মানুষের নিষ্ঠুর বিধানের সহিত ভগবানের কোন সংশ্রবই থাকিতে পারে না।

মহাবীর অর্জ্জুন তখনও মোহাচ্ছন্ন। পিতামহ ভীষ্ম, যিনি পরের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে তাহাকে লালন পালন করিয়াছিলেন, যাঁহার বক্ষে উঠিয়া অর্জ্জুন শৈশবে কতবার "দাদামশায়", "দাদামশায়" বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন,

যাঁহার নীতি কথা তখনও অর্জ্জুনের হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে, সেই পক্ককেশ, অতিবৃদ্ধ, পিতামহের শ্বেতশ্মশ্রু-বিলম্বিত-বিশাল-বক্ষে, আজ প্রাণঘাতী বাণ মারিতে হইবে! আর ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—অস্ত্র-গুরু দ্রোণাচার্য্য, যাঁহার প্রসাদে ও শিক্ষাগুণে আজ অর্জ্জুন জগতে অজেয়., অদ্বিতীয় মহাবীর, যিনি নিজের পুত্রাপেক্ষাও তাঁহাকে অধিক স্নেহ ও শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, আজ সেই শিক্ষাগুরু বৃদ্ধব্রাহ্মণের প্রাণ বিনাশ করিয়া ক্ষত্রধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইতে হইবে! অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ও সমাগত যোদ্ধগণের ত কথাই নাই। আজ কুরুক্ষেত্রের মহা প্রান্তর এক বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। কিছুকাল মধ্যেই এই জন-সমুদ্র এক ভীষণ শোণিত-সাগরের সৃষ্টি করিবে। ভারতের-রাজধানী হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ হতে এক মহাশ্মশানে পরিণত হইবে। শকুনি, গৃধিনী শৃগাল, কুক্কুরের বিকট রবে আর কিছুক্ষণ পরে সমরক্ষেত্রে তিষ্ঠান দায় হইবে। পক্ষান্তরে মৃত যোদ্ধবর্গের আত্মীয় স্বজন,—শিশুপুত্র, স্ত্রী, কন্যা, বৃদ্ধা মাতা, বিধবা ভগিনী প্রভৃতির ক্রন্দন, শোক ও দুর্দ্দশায় দেশের অবস্থা কি শোচনীয় হইবে—তাহা চিন্তা করিয়া মহাবীর অর্জ্জুন সহসা গাণ্ডীব ছাড়িয়া শোকাভিভূত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় কুলের আভিজাত্যগৌরব তখনও অর্জ্জুনের ছিল। তাই কৃষ্ণ বলিলেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ"! উদ্দেশ্য—যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেও ত তুমি বাধ্য। যুদ্ধ তোমাদের বর্ণধর্ম্ম আর যুদ্ধে জীবের নাশই হইয়া থাকে। আত্মীয় হউন, পর হউন, শত্রু হউন আর মিত্র হউন, যুদ্ধে আহূত হইলে অস্ত্রধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। অতএব হে অর্জ্জুন, তোমার কুলধর্ম্ম রক্ষা করাও তোমার একান্ত কর্ত্তব্য।*

* স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ (গীতা ২য় ৩১ শ্লোক)

অর্জ্জুন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। তখন ভগবান তাঁহাকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন, তাহাতে অর্জ্জুন দেখিলেন,—মাত্র ভারতবর্ষই সসাগরা ধরা নহে, আর শ্রীকৃষ্ণকে চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ত্তা ধরিলে, তাহাকে বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান বলা যায় না। কারণ পৃথিবীর প্রায় ১৫ আনা অংশে বর্ণাশ্রম বিধান নাই, তবুও সেখানে প্রকৃত ব্রাহ্মণের অভাব নাই। আবার ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রমের সুদৃঢ় প্রাচীর থাকা সত্ত্বেও কোথাও বা অনাচার, কোথাও বা ব্যভিচার, আর কোথাও বা অবিচারের অভিনয় অবিশ্রান্তভাবে চলিতেছে। শাস্ত্রের বিধান শাস্ত্রেই আছে, কিন্তু শাস্ত্র-কর্ত্তা ব্রাহ্মণ না করিতেছেন এমন কর্ম্মই নাই। জগতের অন্যান্য সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকের একটা না একটা কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু "ষট্‌কর্ম্মা" ব্রাহ্মণ বিয়াল্লিশ কর্ম্মা হইয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। আর দেখিলেন কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি জীব যাহারা পূর্ব্বে অর্জ্জুনের প্রত্যক্ষীভূত ছিল, তাহা ছাড়াও অসংখ্য রকমের জীব, অসংখ্য রকমের পুষ্প ও ফল এবং বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন আকারের মানুষও ভগবানের মুখগহ্বরে রহিয়াছে। কুমারিকা অন্তরীপ হইতে আরম্ভ করিয়া বেরিং প্রণালী পর্য্যন্ত গ্রীস, ইজিপ্ট, মিশর, বাবিলোনিয়া, পাটাগণিয়া, উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, মেক্‌সিকো, মাদাগাস্কর, ক্যাম্বোডিয়া, বেলজীয়াম, চীন তাতার, কামস্কাট্‌কা প্রভৃতি কত দেশ, কত নগর, কত লোহালক্কড় বোমা পট্‌কার কারখানা ও বিরাট যুদ্ধের উপকরণ সেই মুখগহ্বরে বিরাজমান।

আর ককেসিয়ান্, মঙ্গোলিয়ান্ প্রভৃতি জাতির বংশধরগণ, এমন কি যিশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদের পূর্ব্বপুরুষগণও সেই মুখগহ্বরে বসবাস করিতেছেন। আবার দেখিলেন, কোন কোন দেশের মানুষের দেহ তখনও পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয় নাই। কোথাও বা নর-বানর অথবা ঋক্ষ (ভালুক) ও মানুষ একই গুহায় বাস করিতেছে। কাপড়ের ব্যবহার ত নাইই, একটু আগুন

জ্বালিবার জন্য কত রকমের চেষ্টাই তাহারা করিতেছে। আবার ভারতের ঋষিগণের অনুরূপ ঋষিও অন্য দেশে দেখা যাইতেছে। আরও কত নদ, নদী, পর্ব্বত, সাগর, উপসাগর, মহাসাগর, দ্বীপ, উপদ্বীপ সেই মুখগহ্বরে বিদ্যমান থাকিয়া বিশ্বপতির অপার মহিমা, অনন্ত শক্তি ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বিধানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ইহাই ত অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন।

বাস্তবিক অর্জ্জুনের সন্দেহ ও সঙ্কীর্ণতা দূরীকরণার্থই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। ইহার পরও যখন অর্জ্জুন অস্ত্রধারণ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপদেশ দিলেন—

"ময়ি সর্ব্বানি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুদ্ধস্ব বিগতজ্বরঃ॥

"হে অর্জ্জুন, তুমি আমার স্কন্ধে সমস্ত কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়া নিরাশী এবং নির্ম্মম হইয়া সুস্থ-চিত্তে যুদ্ধ কর"। যেহেতু আমি তোমার ঐ সকল আত্মীয় ও জাতিভাইগণকে পূর্ব্ব হইতেই বিনষ্ট করিয়া রাখিয়াছি—তুমি উপলক্ষ মাত্র। যে দিন তোমার সহধর্ম্মিণী, লক্ষ্মী-স্বরূপিনী, পরমা সতী দ্রৌপদীকে রাজান্তঃপুর হইতে দুরাত্মারা বলপূর্ব্বক কেশাকর্ষণ করিয়া প্রকাশ্য রাজ-দরবারে তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছিল, সে দৃশ্য কি ভুলিয়া গেলে? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহাজ্ঞানী মহারথীগণ কি তথায় উপস্থিত ছিলেন না? তাঁহাদের বিবেক ও বীরত্ব কি তখন লোপ পাইয়াছিল? আমি রক্ষা না করিলে, তাহারা ত সেই নিরাশ্রয়া, অগম্যা, রাজকুলবধু, পরামাত্মীয়াকে সভামধ্যেই বিবস্ত্রা করিয়া ফেলিত! মনে নাই কি, সম্রাট দুর্য্যোধনের সেই রাজসভায় তোমাদের ন্যায় মহাবীর, উচ্চবংশ-সম্ভূত পঞ্চ-স্বামীর সম্মুখেই দ্রৌপদীকে, পাপাত্মার সেই বিপুল সুগঠিত উরুদেশ দেখাইয়া পাশব প্রবৃত্তির চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন! মানবের এমন শোচনীয় অধঃপতন

কখনও, কোন দেশে হইয়াছে, অর্জ্জুন? সখে, সমস্ত পাপের দণ্ড বিধান মনুষ্য দ্বারা এই জগতেই হইতে পারে; কিন্তু দুরাত্মা কপটীর সমুচিত দণ্ড মানুষে দিতে পারে না। কপটতার দণ্ড একমাত্র বিনাশ।

এইবার "দ্রৌপদীর বেণী বাঁধা পণ" অর্জ্জুনের মনে পড়িল। আত্মীয়-স্বজনের বিনাশ অর্থাৎ যুদ্ধও আরম্ভ হইল।

এইখানেই যবনিকার শেষ নহে। কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী বিনাশ করিয়া আবার স্বকীয় যদু বংশেরও ছাপ্প'ন্ন কোটী ক্ষত্রিয়ের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক তাঁহার কৃষ্ণলীলার অবসান করিলেন। শেষোক্ত এই ব্যাপারে আবার অর্জ্জুন তাঁহাকে নিবারণ করিতে গেলে, ভগবান শ্রীমুখে যে উত্তর দিয়াছিলেন, কবির ভাষায় তাহা এই—

কেমনে নিবারি, হে অর্জ্জুন!
নহি যাদবের, আমি,
জগতের স্বামী! (নবীন সেন)

আবার বর্ণগত ক্ষত্রিয়ত্ব ও আভিজাত্য যে কিছুই নয়, জগতে তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিবার জন্য ভগবান তাঁহার লীলাবসানের অব্যবহিতপূর্ব্বে, এক নগণ্য, অসভ্য, অস্পৃশ্য, অরণ্যবাসী, বন্য-পশুর মাংসজীবী ব্যাধের দ্বারা গাণ্ডীবধারী, দিগ্বিজয়ী ক্ষত্রবীর অর্জ্জুনকে পরাস্ত করাইয়া, সেই ব্যাধের শরে বিদ্ধ হইয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। যিনি কত আপদে, কত বিপদে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি একাদিক্রমে অষ্টাদশ দিবস অর্জ্জুনের রথে সারথ্য করিয়া, দুরন্ত, দুর্জ্জয় বিপক্ষদলের সমূহ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া অর্জ্জুনের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, অর্জ্জুন সেই পরম সখার প্রাণ-রক্ষার্থ আহূত হইয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না। ব্যাধের তীর-ধনুকের দ্বারা মহাবীরের গাণ্ডীব পরাস্ত হইল। কোথায় রইল আভিজাত্য গৌরব! আর কোথায় রইল ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব ও রণকৌশল!

অতএব জগতবাসীর সুখশান্তি বিধানার্থ এবং ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন-জন্য ক্ষত্রিয় বিনাশ তথা বর্ণ-ভেদ-উচ্ছেদ করাই কৃষ্ণাবতারের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই জন্যই তিনি বৃন্দাবনে "গোয়ালার ভাতে পুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ" নাম ধারণ পূর্ব্বক জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে রাখালের বেশে, আপামর সাধারণের সঙ্গে মেলা মেশা করিয়া প্রেমের বন্ধনে সকলকে বাঁধিয়া গিয়াছিলেন। কেমন করিয়া মানবধর্ম্ম পালন করিতে হয়, তাহাও স্বয়ং জগতবাসীকে দেখাইয়া ও শিখাইয়া গিয়াছেন।

এইরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে প্রাচীন বর্ণভেদ ভাঙ্গিয়া মানবের গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে তথাকথিত জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ভারতে কিছুদিন শান্তিস্থাপন হইয়াছিল, কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসাদি পাঠে বুঝা যায় যে বর্ণাশ্রম-পুষ্ট ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত, শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিরোধ বশতঃ গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আবার এক ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতের সামাজিক অবস্থা ঠিক কিরূপ ছিল, বুঝিবার উপায় নাই। তবে ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে যুগাবতারগণের অন্তর্দ্ধানের পর হইতেই তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও সমাজনীতি শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। মোটামোটী ৪০০।৫০০ বৎসরের অধিক কোন অবতারের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বা রীতিনীতি জগতে সমভাবে টিকিতে পারে নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছিল। ফলে ভারতে আবার স্বজাতি-হিংসা, সমাজ-সংঘর্ষ, রাজ-বিদ্রোহ ও প্রাণীহত্যার তাণ্ডব-লীলা আরম্ভ হইয়াছিল। সেই জন্যই "অহিংসা পরম ধর্ম্মের" গুরু হইয়া বুদ্ধদেবকে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। নৈলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যদুকুলধ্বংস হইলে পৃথিবীতে এমন কোন্ দুর্দ্দান্ত দানব, মানব বা রাক্ষসাদির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে তাহাদের অত্যাচার হইতে জগদবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধরূপে আবার তাঁহাকে ধরাধামে আসিতে হইয়াছিল?

মুসলমানদের রাজত্বকালে ভারতে নানাবিধ অত্যাচার হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেও বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহুকাল পরে। তবে তাঁহার এই অবতারের উদ্দেশ্য কি ? আছে, উদ্দেশ্য আছে, বিনা উদ্দেশ্যে সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ কোন কার্য্যই করেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরই এক প্রবল শক্রর জন্ম হইয়াছিল। খুব সাবধানে সঙ্গোপনে সে নিজের দেহ পুষ্ট করিয়াছিল, এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া ঘুরিয়া শেষে সর্ব্বত্র একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিল। মানবের এমন মহাশক্র বোধ হয় কংস, রাবণাদিও ছিলেন না। তাহার অব্যর্থ সন্ধান, মহাবীর অর্জ্জুন বর্ত্তমান থাকিলেও সে তীক্ষ্ণশর সহ্য করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। কারণ এ শক্র লোকচক্ষুর অগোচর, তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না ; সে অদৃশ্য থাকিয়া মানুষকে কবলিত করে। ইহার নাম বর্ণাশ্রমব্যভিচার বা **বংশগত জাতিভেদ**।

প্রাচীন বর্ণভেদ ভাঙ্গিয়াই বর্ত্তমান জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইজন্যই ইহার নাম বর্ণভেদ। বর্ণভেদ শ্বেত, লোহিত, পীত ও কৃষ্ণ এই ৪ বর্ণগত ছিল,

যথা—

ব্রাহ্মণানাম্ শ্বেতোবর্ণঃ শূদ্রাণামসিত স্তথা।
বৈশ্যানাম্ পীতকোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াস্তু লোহিতঃ॥

জাতিভেদ বংশগত হইয়াছে।

অতি প্রাচীনকালে বর্ণ ও জাতি আদৌ একার্থ বোধিক ছিল না। শ্বেত, লোহিত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে আর্য্যসমাজ গঠিত ছিল। ব্রাহ্মণ সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা হইলেও গুণের আদর ছিল। গুণ ও কর্ম্মানুসারে লোকের উন্নতি ও অবনতি ঘটিত। এখন যেমন ৪টী ক্লাসযুক্ত কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ

করিয়া প্রমোসন্ দেওয়া হয়, তখন সেইরূপ মানুষের গুণ ও কর্ম্মানুসারে উচ্চক্লাসে উঠাইয়া দেওয়া হইত। এই স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন ব্রাহ্মণগণ, ২য় শ্রেণীতে ক্ষত্রিগণ ৩য় শ্রেণীতে বৈশ্যগণ এবং সকলের শেষ চতুর্থ শ্রেণীতে ছিল শূদ্রগণ। শূদ্র যদি ক্রমশঃ গুণোৎকর্ষে ব্রাহ্মণের সমোপযোগী হইত, তবে সেও প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইত। যুগধর্ম্মের প্রাবল্যেই হউক, আর নিজকর্ম্মদোষেই হউক, যখন ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছাচারে জীবনাতিবাহিত করিবার মতলব করিলেন, তখন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যশ্রেণীও তাহাদের অনুগমন করিতে লাগিল, ফলে ইহারা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সর্ব্বনিম্নশ্রেণীটিকে বড় করিয়া তুলিলেন। ক্রমশঃ বঙ্গদেশ হইতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণদ্বয় বিলুপ্তপ্রায় হইল, কাজেই ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র অর্থাৎ তাঁহাদের দাস, এই দুই শ্রেণীই পরিদৃশ্যমান রহিল। ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকর্ম্ম ও বাহ্যিক লক্ষণাদি বিলুপ্তপ্রায়ে হইলেই "আপনারা!" অর্থাৎ জাতি জিজ্ঞাসা করিবার প্রথা প্রচলিত হইল। কারণ ব্রাহ্মণ দেখিলেই প্রণাম করিতে হইবে অথচ চিনিবার উপায় নাই। সর্ব্বত্রই শূদ্রাচার, বর্ণের (বর্ণ অর্থাৎ রং) কোন পার্থক্য রহিল না। বাস্তবিক চণ্ডীপাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া বিনামা বিক্রয় পর্য্যন্ত করিতে হইবে, অথচ ব্রাহ্মণত্ব বজায় থাকিবে—এই নববিধান কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যখন ব্রাহ্মণেরা বদ্ধপরিকর হইলেন, তখনই বুদ্ধদেবের আবির্ভাব, জাতিহিংসা নামক দুর্জ্জয় দানবকে ধ্বংস করিবার জন্যই তিনি "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" রূপ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। ঐ জাতি-হিংসারই নামান্তর বর্ত্তমান জাতিভেদ। ভারতের এই সর্ব্বনেশে শত্রুকে বিনাশ করিবার জন্য ভগবান নাকি চৈতন্যরূপেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন এবং কেশবচন্দ্রও এই উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধনের অভাব ছিল না, জ্ঞানেরও অভাব ছিল না, তবুও তাঁহারা

"পরের তবে আপন ভুলে, পরের প্রাণে প্রাণ" মিশাইবার জন্য সারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, কিন্তু জাতিভেদকে সমূলে নাশ করিতে বোধ হয় স্বয়ং ভগবানও অক্ষম। জানি না আর কতকাল আমাদিগকে এই শত্রুর বশে থাকিতে হইবে।

পাঠক, এই শত্রু কিরূপে এত প্রবল হইল এবং কিরূপে ইহার অধিকার বিস্তৃত হইল তাহার পরিচয় একটু গ্রহণ করুন।

মনুসংহিতা।

মানবধর্ম্ম-প্রণেতা স্বায়ম্ভুব মনু যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন তাহার নাম মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং ইহার উদ্দেশ্যও মহৎ ছিল। কিন্তু এক্ষণে আর সে সংহিতা দেখা যায় না। এক্ষণে মনুসংহিতা বলিয়া আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা ভৃগুর রচিত বলিয়া প্রকাশ, উহাও আবার নানা মুনির হাতে পড়িয়া নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পণ্ডিতগণ বলেন যে উহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, সুতরাং ইহা আধুনিক। যাহা হউক এক্ষণে আমরা যে মনুসংহিতা দেখিতে পাই, উহার প্রথম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে বলিতেছে—

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ।

ইহার অর্থ-লোকসমূহের বৃদ্ধিমানসে পরমেশ্বর (ব্রহ্মা) নিজের মুখ, বাহু, উরু ও পাদদেশ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র সৃষ্টি করিলেন। ইহাই নাকি, মানবসৃষ্টির সূচনা। আবার ৩২ হইতে ৪০ পর্য্যন্ত ৯টী শ্লোকে তিনি যাহা বলিলেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এই যে, সেই প্রভু অর্থাৎ ব্রহ্মা আপনার দেহকে দ্বিধা করিয়া অর্দ্ধাংশে পুরুষ এবং অর্দ্ধাংসে নারী সৃষ্টি করিলেন এবং সেই নারীর গর্ভে বিরাট্ পুরুষকে

উৎপাদন করিলেন। ৩২। হে দ্বিজসত্তমগণ! সেই বিরাট পুরুষ তপস্যা করিয়া স্বয়ং যাহাকে সৃজন করিলেন, আমি সেই স্বায়ম্ভুব মনু, আমাকে এই সমুদয়ের দ্বিতীয় স্রষ্টা বলিয়া জানিও। ৩৩। আমিই প্রজাসৃষ্টি-মানসে সুদুষ্কর তপস্যা করিয়া প্রথমতঃ মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা পুলহ, পুলস্ত, ক্রতু, প্রচেতাঃ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশজন মহর্ষি প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিলাম। ৩৪। এই দশজন প্রজাপতি আবার মহাতেজস্বী অপর সপ্তমনুর সৃষ্টি করিলেন এবং যে দেবসমূহকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন নাই, এমন দেবগণ ও তাহাদের বাসস্থান, অসীম ক্ষমতা-সম্পন্ন বহু মহর্ষি, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, অসুর, নাগ, সর্প গরুড়াদি পক্ষী এবং পৃথক্ পৃথক্ পিতৃগণ, বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, নানাবর্ণ জ্যোতির্দণ্ড, ইন্দ্রধনু, উল্কা নির্ঘাত অর্থাৎ ভূমি ও অন্তরীক্ষগত উৎপাতধ্বনি ধূমকেতু, ধ্রুব ও অগস্ত্যাদি নানা প্রকার জ্যোতিঃ পদার্থ, কিন্নর, বানর, মৎস্য, নানা প্রকার পক্ষী, মৃগ, মনুষ্য ও দুই পংক্তি-দন্ত-বিশিষ্ট সিংহাদি হিংস্রজন্তু, কৃমি, কীট, পতঙ্গ যুক (যোঁক) মক্ষিক, দংশমশকাদি এবং বৃক্ষলতাদি পৃথক পৃথক্ স্থাবর সৃষ্টি করিলেন। ৩৫—৪০।

পাঠক দেখিতেছেন উদ্ধৃত অংশমধ্যেই মনুষ্যসৃষ্টির কথা রহিয়াছে, এই স্থানে শ্লোকটী যথাযথ উল্লেখ করা উচিত মনে করি।

কিন্নরান্, বানরান্, মৎস্যান্, বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্।
পশূন্ মৃগান্ মনুষ্যাংশ্চ ব্যালাংশ্চোভয়তোদতঃ॥ ৩৯

ইহার বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে দেখুন প্রথমোক্ত শ্লোকে ব্রহ্মা মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে মানব সৃষ্টি করিলেন, আবার স্বায়ম্ভুব মনুর পরবর্ত্তী প্রজাপতিগণও মানব সৃষ্টি করিলেন। সুতরাং একই লোকসৃষ্টি দুইবার হইল, ইহা অপ্রাসঙ্গিক এবং অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না কি? আবার পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন।

এবমেতৈরিদং সর্ব্বং যন্নিয়োগান্মহাত্মভিঃ
যথাকর্ম্ম তপোযোগাৎ সৃষ্টং স্থাবরজঙ্গমম্। ৪১

অর্থ—পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণ আমার আজ্ঞাক্রমে, কর্ম্মানুসারে এই সকল স্থাবর জঙ্গম এই প্রকারে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৪১।

তাহা হইলে দেখুন এইখানেই সৃষ্টি বিষয়ে উপসংহার হইল। প্রথমোক্ত (৩১) শ্লোকে বলা হইয়াছে (লোকানাস্তু "বিবৃদ্ধ্যর্থং") মানবসমূহের সংখ্যাকে বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিবার জন্যই মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি মানবগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে পূর্ব্বে আদৌ মনুষ্য ছিল না, ব্রহ্মার মুখ বাহু ইত্যাদি ইহতেই সৃষ্টির সূচনা। কিন্তু আমরা বৃদ্ধি করি কাহাকে! যাহা আছে তাহাকেই নয় কি? যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহাকে বাড়াই কি করিয়া। আমরা বলিয়া থাকি, প্রদীপের শলিতাটী বাড়াইয়া দাও কিম্বা অমুক জিনিষটা একটু বৃদ্ধি করিয়া দাও। ইহার দ্বারা আমরা স্বতঃই বুঝিতে পারি যে প্রদীপের শলিতাটী আছে বা অমুক জিনিষটা আছে, তাহাকে তাহার তাৎকালিক অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ বৰ্দ্ধিত করিতে হইবে। সুতরাং "বিবৃদ্ধ্যর্থং" শব্দের প্রয়োগে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মুখ, বাহু, উরু ও পদ-সম্ভূত মানব জন্মিবার পূর্ব্বেও মানুষ ছিল। যদি না থাকিত তবে "বিবৃদ্ধ্যর্থং" স্থলে "সৃজনার্থং"ও বলিতে পারিতেন। আবার কার্য্যতঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মনুর উক্ত বিধানানুসারে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃ ক্ষয়ই হইতেছে। কারণ মহামান্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আমলে মানুষ গণনার ফলে বঙ্গদেশে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে। *

(বিগত ১৯১১ ও ১৯২১ সালের সংখ্যা দ্বিতীয় ভাগে দেখুন)

সাল	হিন্দুর সংখ্যা	মুসলমানের সংখ্যা	মন্তব্য
১৮৭২	১৭১ লক্ষ	১৬৭ লক্ষ	হিন্দু ৪ লক্ষ অধিক
১৮৮১	১৭২½ লক্ষ	১৭৯ লক্ষ	মুসলমান ৬½ লক্ষ অধিক
১৮৯১	১৮০ লক্ষ	১৯৬ লক্ষ	মুসলমান ১৬ লক্ষ অধিক
১৯০১	১৯৪ লক্ষ	২২০ লক্ষ	মুসলমান ২৬ লক্ষ অধিক।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে হিন্দুদিগের সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা ৪ লক্ষ অধিক ছিল। ৩০ বৎসর পরে সেই মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা ২৬ লক্ষ অধিক হইয়াছে। (লেপ্টন্যাণ্ট কর্ণেল ইউ, এন্, মুখার্জ্জি কৃত ১৩১৭ সালের "হিন্দু সমাজ" দেখুন) প্রাচীন ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বে ভারতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৬০ কোটি, এই কয়েক শত বৎসরে প্রায় ৪০ কোটি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

এক্ষণে এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব লোকক্ষয়ের কারণ কি? আর যে ভারতে মুসলমানের নাম মাত্র ছিল না, তাহাদেরই বা সহসা এরূপ বৃদ্ধিসাধন কেন হইল? কথায়ও আছে 'উড়ে এল সেখ, তার বাড়াবাড়িটা দেখ।' হিন্দুও যে নদীর জল খায়, মুসলমানও সেই নদীর জল খায়, উভয়েই এক রোদে ধান শুকায়, এবং এক রকমের অন্নই উদরস্থ করে, কলেরা ম্যালেরিয়া তাঁহাদেরও যেমন আছে, হিন্দুদিগেরও তেমনি আছে, পরন্তু মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তবুও হিন্দুক্ষয়ের কারণ কি? বোধ হয় অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে ধর্ম্ম, জাতিভেদ, বিদ্যাচর্চ্চা, বিধবাবিবাহ ও সামাজিক একতা, এই কয়েকটী বিষয়ে প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান সমাজে অনৈক্য আছে'। তন্মধ্যে ধর্ম্মের পার্থক্যে লোক-সংখ্যা হ্রাসের কোন কারণ দেখা যায় না, কারণ সকল ধর্ম্মেরই মূল উদ্দেশ্য এক; কিন্তু পরবর্ত্তী ৪টি কারণে হিন্দুসংখ্যা প্রধানতঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে অর্থাৎ মুসলমানদিগের মধ্যে জাতিভেদ না থাকায়, শিক্ষা স্রোত

অব্যাহত থাকায়, বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকায় এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পরের একতা থাকায়, তাহারা ক্রমশঃ সংখ্যায় বাড়িয়া যাইতেছে, আর হিন্দুদিগের মধ্যে ঐগুলির অভাবে ক্রমশঃ সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে, এই ৪টী কারণের মধ্যে সামাজিক একতার অভাব, আবার জাতিভেদ বা জাতি-বিদ্বেষ-সম্ভূত। যে সকল হিন্দু অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণিত ও উপেক্ষিত, তাহাদিগকে অনেক সময় বাধ্য হইয়া ধর্ম্মান্তরও গ্রহণ করিতে দেখা যায়। বাঙ্গালী জাতি স্বভাবতঃই নিরীহ, সরল ও শান্তিপ্রিয়। জাতি বিচারের ফলে এই জাতি শতধা বিভক্ত; অবাধ-বিবাহও অপ্রচলিত হইয়াছে। পরিণামে বিধর্ম্মী, বৈদেশিক, প্রবল আক্রমণকারীগণের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেও ইহারা অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। Unity অর্থাৎ সামাজিক একতা হইবার কোন উপায় নাই। কাজেই বিজেতার ধর্ম্ম গ্রহণই বিজিত বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ এবং সরল পন্থা অনুমিত হইয়া পড়ে। বঙ্গেইংরাজ-রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত এই কারণেই বহু হিন্দু মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। এখনও সে স্রোত বন্ধ হয় নাই। অধিকন্তু অধুনা আবার বিজেতা ইংরাজ-জাতির খৃষ্টধর্ম্ম, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের প্রাণ জুড়াইবার স্থান হইয়াছে। বঙ্গের হিন্দু মুসলমান উভয়েই এক্ষণে ইংরাজ রাজের প্রজা, কিন্তু মুসলমানদিগকে যিশু খৃষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রায়ই দেখা যায় না, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ এখনও দলে দলে, প্রতিবৎসর খৃষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। হিন্দু সমাজে "অস্পৃশ্যতা" বলিয়া জাতিভেদের এক সহোদর বর্ত্তমান। তাহাকে ছাড়িয়া জাতিভেদ থাকিতে পারে না। এই অস্পৃশ্যতার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই, সহস্র সহস্র হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং জাতিভেদই হিন্দুক্ষয়ের প্রধান কারণ, পক্ষান্তরে এই জাতিভেদ মনুক্ত বর্ণাশ্রমেরই নামান্তর, সুতরাং মনু লোক-বৃদ্ধি-মানসে যে চারিটী

আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই আশ্রমবিধিই কার্য্যতঃ লোকক্ষয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। অতএব বলিতে হইবে যে "লোকনান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং"না হইয়া "লোকনান্তু ক্ষয়ার্থং" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের জন্ম হইয়াছিল।

মনুর পিনাল কোডের ঐ ৩১ ধারা অনুসারেই যত গোল বাধিয়া উঠিতেছে, ঐ ধারাটী নাকি বেদেও আছে "যথা—

ব্রাহ্মণোহস্য মুখামাসীৎ, বাহু রাজন্যঃকৃতঃ
উরুতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।

বেদ স্বয়ং ঈশ্বরের মুখ-নিঃসৃত সুতরাং অভ্রান্ত এবং অপৌরুষেয়, এই জন্য উহা হিন্দুর পরম আদরের ধন। উহাকে অমান্য করিবার উপায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উপরোক্ত শ্লোকটীর সম্বন্ধে আধুনিক অনেক পণ্ডিতের মতদ্বৈধ আছে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে বিরাট্ পুরুষের বর্ণনা কালে উক্ত মন্ত্রটী রচিত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী, এম এ মহাশয় তাঁহার "জাতিভেদ" নামক পুস্তকে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের ভাষার ও ছন্দের সহিত উক্ত শ্লোকটির সামঞ্জস্য নাই। অর্থাৎ শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত। পাঠকের মনোনয়নার্থে উক্ত শ্লোকটী এবং উহারই সংস্পৃষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রটী এই খানে উদ্ধৃত হইল। শ্লোক ২ টীর ভাষা ও ছন্দে কত প্রভেদ দেখুন।

যৎপুরুষং ব্যদধু কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কৌ উরু পাদা উচ্যেতে। ১১
ব্রাহ্মণোহস্য মুখামাসীৎ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ
উরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥ ১২

প্রথম শ্লোকটীর অর্থ এই যে, বিরাট্ পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছিল। উহার মুখ কি? বাহুদ্বয় বা কি? উহার উরু এবং পাদই বা কি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে? ১১

উত্তর—"ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীৎ"—ব্রাহ্মণ ইহার মুখ ছিলেন, রাজন্য (ক্ষত্রিয়) ইহার বাহু ছিল! বৈশ্যই ইহার উরুদ্বয়। পদ হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল!

পাঠক দেখুন, প্রশ্ন হইল পদদ্বয়কে কি বলে।

উত্তর হইল—পা হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বেলা (১মা কর্ত্তৃকারকের বিভক্তি) যথাক্রমে মুখ, বাহু ও উরুর সহিত অলঙ্কারস্থলে তুলনা করা হইয়াছে, আর শূদ্রের বেলা একেবারে (অপাদানে ৫মী বিভক্তি)—"পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত" কি না পা হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল।

এ সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বলিবার নাই,—জাতিতত্ত্ববারিধি-প্রণেতা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত-শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা যাহা করিয়াছেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"কৌ পাদৌ উচ্যেতে?" (উত্তর)—পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত। ইহার পদদ্বয়কে কি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে—এই প্রশ্নের উত্তর পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছেন, এইরূপ কথা কখনই উক্ত হইতে পারে না। ইহার পদদ্বয় কি বলিয়া উক্ত হইত? অবশ্যই উত্তর হইবে "শূদ্র বলিয়া" সুতরাং "পদ্ভ্যাং শূদ্র অজায়ত" এই অংশের অপাদানকে নিরঙ্কুশ আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া মনে করিতে হইবে, তাই আমরা উক্ত ১২শ মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। ... ...

দেহের মধ্যে মুখ শ্রেষ্ঠ, বর্ণের মধ্যেও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তাই মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি ব্রাহ্মণজাতিকে আদিমানব বিরাটের মুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

যে প্রকার বাহুবলে দেশ ও সমাজ রক্ষিত হয়, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়জাতি দেশ ও সমাজকে ক্ষত হইতে ত্রাণ করিতেন বলিয়া তাঁহারা ক্ষত্রিয়নামে বিঘোষিত হয়েন। এবং তজ্জন্য ঋষি ও উহাদিগকে আদিমানবের বাহুর

সহিত তুলনা করিয়াছেন। মানুষ উরুতে ভর দিয়া দাঁড়ায়, দেশের লোকেরাও কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য্যে বৈশ্যগণের সাহায্যে সমাজে তিষ্ঠিত থাকেন, তাই ঋষি বলিলেন, যেন বৈশ্যগণই আদিমানব বিরাটের উরুদ্বয়। দেহের মধ্যে পাদদ্বয় নিকৃষ্টাঙ্গ, শূদ্রগণও বিদ্যা ও অবদানাদিরিক্ততা নিবন্ধন নিকৃষ্টতম; তজ্জন্য ঋষি বলিলেন, আদিমানব বিরাটের পদদ্বয়ই যেন শূদ্রজাতি। অতএব বর্ণ বা জাতি কোন ব্রহ্মা বা প্রজাপতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গপ্রভব ইহা ঠিক হইতেছে না। ঐকারণে সায়নের ব্যাখ্যাও সাধীয়সী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ফলতঃ দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর ও মনুষ্যাদি (মাতা মনুর সন্তান) সকলেই মৈথুনসম্ভব। ত্রেতাযুগের ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ও সম্পূর্ণ মৈথুনসম্ভব, সুতরাং উহাদিগকে কাহারও মুখনাসিকাদিপ্রভব বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না।"

(জাতিতত্ত্ববারিধি, ২য় সংস্করণ ১৫।১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

আমাদের মতে,

১। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিজাতি ব্রহ্মার পৃথক্, পৃথক্ চারি অঙ্গসম্ভূত হইলে তাহাদের আকৃতিও বিভিন্ন হইত। কারণ জাতি-"আকৃতি ও প্রকৃতিগত। বিশ্বনিয়ন্তার অলঙ্ঘ্য বিধানে যে যাহা হইতে জন্মিবে, সে সেইরূপ আকার ধারণ করিবে, এইজন্য সন্তান পিতা বা মাতার সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ' ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইহারা ব্রহ্মার পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উক্ত হইলেও প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহাদের আকার বা বর্ণগত কোন পার্থক্যই নাই।

২। আবার ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, তাঁহার অঙ্গই নাই। সুতরাং তাহা হইতে সাকার মানবাদি কিরূপে উৎপন্ন হইল?

৩। আবার দেখুন সংহিতাকার মনু, আদিমানব বিরাট্, তাহা হইতে স্বায়ম্ভুব মনু, তদপত্য মরীচ্যাদি ১০ প্রজাপতি ও দেব, দানব, মানব

প্রভৃতির উৎপত্তির পৃথক্ বিবরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

৪। ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পাদদেশ হইতে যাহারা জন্মিল, তাঁহারা পুরুষ বলিয়াই প্রখ্যাত। পক্ষান্তরে স্ত্রীপুরুষের সহবাস ব্যতীত অপর পুরুষ বা স্ত্রীর উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ব্রহ্মার মুখাদি হইতে যথাক্রমে, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়ানী, বৈশ্যানী, ও শূদ্রাণী জন্মিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সহিত পরিণয়াবদ্ধ হইয়াছিল, এরূপ কোন প্রমাণ দেখা যায় না। স্ত্রীপুরুষে এক যোড়া ব্রাহ্মণ, এক যোড়া ক্ষত্রিয়, এক যোড়া বৈশ্য ও এক যোড়া শূদ্র না জন্মিলে কি করিয়া লোক সৃষ্টি হইল, এবং কিরূপেই বা বর্ণধর্ম্ম রক্ষা হইল, তাহা প্রকাশ নাই।

৫। আজ কাল শূদ্র বলিলে উপবীতধারী দ্বিজ ছাড়া আর যত প্রকার জাতি আছে, সকলকেই বুঝায়। ব্রহ্মার পাদ হইতে যিনি জন্মিয়াছিলেন, তিনিই শূদ্র বলিয়া সুবিদিত। কিন্তু তিনি কোথায়? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদির ন্যায় তাঁহারও ত একটী নির্দ্দিষ্ট নাম ও বৃত্তি থাকার দরকার। নবশায়কাদি যত প্রকার জাতি শূদ্র বলিয়া পরিচিত, তাহারা সকলেই আবার বর্ণসঙ্কর, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সহযোগে উৎপন্ন বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত ও তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার দ্বিজসেবা ভিন্ন তাহাদের স্বতন্ত্র বৃত্তিও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহা হইলে প্রকৃত ব্রহ্মার পাদসম্ভূত সেই দ্বিজ-পদসেবী শূদ্র কে?

৬। আর পা হইতে জন্মিলেই বা তিনি এরূপ নিন্দিতই ও নিগৃহীত হইবেন কেন? পাও ত ব্রহ্মারই একটী অঙ্গ। বিশেষতঃ যোগী, ঋষি, বৈষ্ণব, তপস্বী প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মাদিগের একমাত্র লক্ষ্যস্থল যে পদ, এবং যে পদ হইতে পতিতপাবনী, কলুষনাশিনী গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি, শূদ্রদিগের পক্ষে সেই পদ এত দূষণীয় ও নগণ্য হইল কেন, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না।

৭। গীতাতে ভগবান্ নিজেই আবার বলিতেছিলেন, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"—মনুষ্যের গুণ ও কর্ম্মানুসারে বিভাগ করিবার জন্যই তিনি চতুর্ব্বর্ণ্য (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মহাভারতও এইমত সমর্থন করিতেছে। যথা :—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণাপূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভিঃ বর্ণতাং গতং।—শান্তিপর্ব্ব।

অর্থাৎ ব্রহ্মণাদি ৪ বর্ণের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। এই জগৎ ব্রহ্মময়, পূর্ব্বে সকলেই ব্রাহ্মণরূপে সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণেরাই কর্ম্মানুসারে অন্যান্য বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তাহা হইলে মানুষ যে ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু, বা পাদ হইতে জন্মে নাই, তাহা বুঝা গেল, সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কেহ জাতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, ইহাও সপ্রমাণ হইল। পরন্তু চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠা গুণ ও কর্ম্মানুসারে ভগবানের সৃষ্ট হইলেও, এখন যে জাতিভেদ চলিতেছে, উহা মনুষ্যকৃত। ঈশ্বরকৃত নহে। যাহাদের ধারণা হইয়াছে যে তাহারা নিজ নিজ কর্ম্মদোষে নিম্নজাতিতে জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ইহজন্মে আর তাহাদের উদ্ধারের উপায় নাই, তাহা ঠিক নহে। দয়ার নিদান ভগবান্ মনুষ্যকে একই নিয়মে, একই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। গুণ ও কর্ম্মানুসারে নিম্নবর্ণের মানবও যে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার কয়েকটা প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করিব।

১। কান্যকুব্জদেশের রাজা গাধি নামক নৃপতির পুত্র বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠকে পরাস্ত করিবার জন্য তিনি রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশায় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বর দিতে আসিলে, তিনি ব্রাহ্মণত্ব

পাইবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা প্রথমতঃ ব্রাহ্মণত্ব দিতে অস্বীকার করতঃ বলেন যে, পরজন্মে তুমি ব্রাহ্মণরূপে জন্মিতে পার; এবার ক্ষত্রিয়ই থাকিতে হইবে। বিশ্বামিত্র তাহাতে আপত্তি করিয়া আবার কঠোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন, ফলে ইহজন্মেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব দিতে হইয়াছিল।

২। কুরুবংশীয় ঋষ্টীসেনের পুত্র দেবাপি ও শান্তনু দুই ভাই। ছোট ভাই শান্তনু রাজা হইলেন, দেবাপি তপস্যার্থে নিযুক্ত রহিলেন। শান্তনুর রাজ্যকালে বার বৎসর দেবতা বারি বর্ষণ করিলেন না, সুতরাং অরাজক উপস্থিত হইল; শান্তিশূন্য হইয়া শান্তনু ব্রাহ্মণগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজা না করিয়া তুমি নিজে অভিষিক্ত হইয়াছ; এজন্য দেবতা বারিবর্ষণ করিতেছেন না। তখন শান্তনু দেবাপির নিকট যাইয়া তাঁহাকে সিংহাসন গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু দেবাপি রাজ্যগ্রহণ না করিয়া ছোট ভাইয়ের জন্য যজ্ঞ করিতে লাগিলেন এবং নিজে ছোট ভাইয়ের পুরোহিত নিযুক্ত হইলেন। এইখানে আমরা একপরিবারে দুই জাতি দেখিতে পাইতেছি, এক ভাই ব্রাহ্মণ আর এক ভাই ক্ষত্রিয়।

৩। নাভাগাদিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছিলেন যথা—

নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।

হরিবংশ ১১ অধ্যায় ৫৮

৪। ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিবাদ করিয়া শূদ্র কবষ ঐলুষ ঋষিপদবাচ্য হইয়াছিলেন। কবষ ঐলুষ একজন শূদ্র ছিলেন। ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত এই ঋষির প্রণীত। এক্ষণে বেদের স্ব উচ্চারণ করিলে শূদ্রের জিহ্বা কর্ত্তন করিবার নিয়ম হইয়াছে, কিন্তু বৈদিকযুগে অনেক শূদ্র-ঋষিই বেদের মন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আবার দেখুন—

৫। জাত্যা ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদাখ্যঃ তথোলুক্যাঃ সুতোঽভবৎ ।২২
মৃগীজ ঋষ্যশৃঙ্গোঽপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মন্দপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্যমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥
মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্তু মণ্ডুকীগর্ভসম্ভবঃ।
বহবোঽন্যেপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে শূদ্রবৎ দ্বিজাঃ ॥ ২৪ ॥

ভবিষ্যপুরাণ।

জন্মই যে জাতির নিদান নহে,—শূদ্রবৎ জন্মিলেও যে পরমব্রাহ্মণ মুনি ঋষি হওয়া সম্ভব, উক্ত ৩টী শ্লোকে শাস্ত্রকারই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। যেহেতু—

বেদবিভাগকর্ত্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব কৈবর্ত্ত-কন্যার গর্ভসম্ভূত।

যুগধর্ম্মের কর্ত্তা পরাশর	...	শ্বপাককন্যার গর্ভসম্ভূত।	
সর্ব্বজনবিদিত মহাত্মা শুকদেব	...	শুকী	... ।
বৈশেষিকদর্শনকার মহর্ষি কণাদ	...	উলুকীর	... ।
মহাতপাঃ ঋষ্যশৃঙ্গ	...	হরিণীর	... ।
সূর্য্যবংশের কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ		স্বর্গবেশ্যার	... ।
মুনিশ্রেষ্ঠ মন্দপাল ...	...	নাবিককন্যার গর্ভসম্ভূত।	
মহামুনি মাণ্ডব্য ...	...	মণ্ডুকীনাম্নী অতিহীনবংশ-	

সম্ভূতা নারীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই পরম ব্রাহ্মণ এবং মুনিঋষি বলিয়া সমাদৃত ও পূজিত। এইরূপ শূদ্রবৎ আরও অনেক দ্বিজ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আবার একই পিতার পুত্রগণ গুণকর্ম্মানুসারে যে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহারও দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নহে।

পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ॥

হরিবংশ ২৯ অধ্যায় ও বায়ুপুরাণ দ্রষ্টব্য।

অস্যার্থ—

রাজা গৃৎসমদের পুত্র শুনক, এই শুনকের পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রবর্ণে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব বুঝাগেল যে, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ চাতুর্বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াও পুরাকালে মানবের গুণ কর্ম্মানুসারে প্রমোসন্ দিতেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিলে শূদ্রকেও ব্রাহ্মণশ্রেণীতে উঠাইয়া লইতেন। আবার ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি কেহ পাপ কার্য্য করিতেন, তবে ক্রমশঃ ক্রিয়াহীন হইয়া শূদ্রের ন্যায় গণ্য হইতেন। এই জন্য পরাশর বলিয়াছেন।

শূদ্রোঽপি শীলসম্পন্নো গুণবান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণোঽপি ক্রীয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যবরো ভবেৎ॥

অর্থাৎ শূদ্রও যদি উত্তম স্বভাব প্রাপ্ত হয়, সে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইবে। আবার ব্রাহ্মণও ক্রীয়াহীন হইলে তিনি শূদ্রাপেক্ষাও অপকর্ষতা প্রাপ্ত হইবেন।

এই শুভ ও নির্ব্বিরোধ উদ্দেশ্য বিনষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ শতধা বিভক্ত এবং জাতিভেদের বিষে জর্জ্জরীভূত। আমাদের হিন্দুসমাজের শোচনীয় পরিণামের ইহাই অবশ্যম্ভাবী কারণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিবিধ জাতির পরিচয়।

মন্বাদিশাস্ত্রে বিবিধজাতির উৎপত্তির যেরূপ বিবরণ দেখা যায়, তদ্দৃষ্টে কতকগুলি জাতির পিতামাতার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত অন্যরূপ।

(অকারাদিক্রমে)

উৎপন্নজাতি।	পিতার জাতি।	মাতার জাতি।	দ্রষ্টব্য শাস্ত্র।
অম্বষ্ঠ	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	মনুসংহিতা।
অন্ধ্র	বৈদেহিক	কারারব	ঐ
অয়োগব	শূদ্র	বৈশ্য	ঐ
উগ্র (আগুরি	ক্ষত্রিয়	শূদ্র	ঐ
করণ	বৈশ্য	শূদ্র	ঐ
কর্ম্মকার	ব্রাহ্মণ	শূদ্র	বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ
ঐ	তৈলী	বারুই	পরশুরাম সংহিতা
কারাবর	নিষাদ	বৈদেহী	মনুসংহিতা
কাংস্যকার	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ
কুম্ভকার	মালাকার	কর্ম্মকার	পরাশরসংহিতা
ঐ	পটিকার	তৈলী	পরাশর পদ্ধতি
ঐ	ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়	বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ
কৈবর্ত্ত (দাস)	নিষাদ	অয়োগব	মনুসংহিতা
কোটক	ঘরামি	কুমার	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত
গন্ধবণিক	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ

উৎপন্নজাতি।	পিতার জাতি।	মাতার জাতি।	দ্রষ্টব্য শাস্ত্র।
মালাকর	ব্রাহ্মণ	শূদ্র	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত
গোপ	ক্ষত্রিয়	শূদ্র	পরাশরসংহিতা
ঐ (আভীর)	ব্রাহ্মণ	অম্বষ্ঠ	মনু
চণ্ডাল	শূদ্র	ব্রাহ্মণ	মনু
চর্ম্মকার	তীবর	চণ্ডাল	পরাশরপদ্ধতি
চিত্রকর	স্থপতি	গন্ধবেণে	পরশুরামসংহিতা
ডোম	লেট	চণ্ডাল	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত
তন্তুবায়	মনিবন্ধ	মণিকর	পরাশরপদ্ধতি
ঐ	ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়	বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ
তৈলি	বারুই	গোপাল	পরশুরামসংহিতা
তৈলকার	কুম্ভকার	কোটক	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত
তাম্বুলি	বৈশ্য	শূদ্র	বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ
তীবর	ক্ষত্রিয়	রাজপুত্রী	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত
ঐ	পুণ্ডক	চূর্ণক	পরাশরপদ্ধতি
ধীবর	কৈবর্ত্ত	তীবর (সংসর্গদোষ)	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত
ঐ	বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	গৌতমসংহিতা
নিষাদ (পারশব)	ব্রাহ্মণ	শূদ্র	মনুসংহিতা
পুক্কশ	নিষাদ	শূদ্র	ঐ
বাগাতীত (বাগ্‌দী)	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত
বারুই	ব্রাহ্মণ	শূদ্র	বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ
বৈদেহ	বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	মনু
মাগধ	বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	,,
মাহিষ্য	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	যাজ্ঞবল্ক্য

উৎপন্নজাতি।	পিতার জাতি।	মাতার জাতি।	দ্রষ্টব্য শাস্ত্র।
ঐ	কর্ম্মকার	তৈলী	পরাশরপদ্ধতি
মেদ	বৈদেহিক	নিষাদ	মনুসংহিতা
মূর্দ্ধাভিষিক্ত	ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়	যাজ্ঞবল্ক্য
রাজপুত	ক্ষত্রিয়	করণ	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত
রজক	ধীবর	তীবর	ঐ
শাঁখারী	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ
শৌণ্ডিক	বৈশ্য	তীবর	,,
,,	কৈবর্ত্ত	গান্ধিক	পরাশরপদ্ধতি
স্বর্ণকার	ব্রাহ্মণ	শূদ্র	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত
স্বর্ণকার	স্থপতি	সরাকী	পরশুরাম
সূত	ক্ষত্রিয়	ব্রাহ্মণ	মনু
ক্ষত্তা	শূদ্র	ক্ষত্রিয়	মনু

এতদ্ভিন্ন আরও প্রায় ১০৬ টী "জাতির" নাম বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্রে পাওয়া যায়। বাহুল্যবোধে তাহাদের বিষয় কিছুই উদ্ধৃত করিলাম না। কারণ সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে ও মাননীয় রিজলী সাহেবের কৃপায় এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে উল্লিখিত ৪২ এবং ১০৬ সর্ব্বশুদ্ধ এই ১৪৮ টী জাতি ছাড়াও শত শত বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায় এই সুবিশাল ভারতবর্ষে বসবাস করিতেছে (সেন্সাস রিপোর্ট দ্রষ্টব্য) ঐ সকল হিন্দু জাতি আসিল কোথা হইতে? উহাদের পিতামাতাই বা পাওয়া যাইবে কোথায়? এই দুরূহ ব্যাপারের মীমাংসা করিতে গেলেই দেখা যাইবে চাতুর্ব্বর্ণ্যের গোড়ায় গলদ্ ছিল। ২।১ টী সুপ্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায় যথা গোপ-নাপিতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এখনও সে গলদ্ বাহির হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্থলে নাপিত জাতির ইতিহাসই লিখিতে অতঃপর প্রবৃত্ত হইব।

তৃতীয় অধ্যায়।

নাপিত জাতির বর্ত্তমান অবস্থা।

কোন জাতির ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই জাতির নাম, ভাষা দেশ, গঠন, উৎপত্তির বিবরণ ও আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিতে হয়। ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস থাকিলে এই সকল বিষয় নির্ণয় করা সহজ হইত। কিন্তু প্রাচীন ঋষিরা সংহিতা, পুরাণ, ইত্যাদি যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছেন, উহার অধিকাংশই কেবল বর্ণাশ্রম, শুদ্ধিতত্ত্ব অথবা ধর্ম্মালোচনার বিষয়ীভূত। বস্তুতঃ মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর আলেক-জেণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে এদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে অনেক বিষয়ে কেবল কল্পনার উপরই নির্ভর করিতে হয়। এজন্য আজকাল ভাষা, ব্যবসা ও জাতীয় সংজ্ঞা অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য প্রণালীতে জাতি নির্ণয় করিবার প্রথা অনেকেই অবলম্বন করিয়াছেন। বাঙ্গালী হিন্দুর উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের মধ্যে কোন না কোন একটিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। দেখা যাউক নাপিত শাস্ত্রমত কোন্ বর্ণের অধিকারী। পাঠক! পুরাণাদি আজ কাল এতই "প্রক্ষিপ্ত" ও "নিক্ষিপ্ত" দোষে দূষিত যে, তদনুসারে কোন একটী স্থির মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া সুকঠিন। সেজন্য প্রথমে আমরা নাপিত সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আচার ব্যবহার এবং জাতীয় সংজ্ঞা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমাদের এই নাপিত সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময় ও ক্ষোভের সীমা থাকে না। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, যাঁহাদের অভাবে হিন্দুসমাজের বেদবিহিত অনেক ক্রিয়াকর্ম্মই সমাধা হয় না,

যাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ন্যায় গোত্রও দৃষ্ট হয়, অধিকন্তু আবহমান কাল যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত শুদ্ধাচার রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই কি না নগণ্য, নমান্য ও জড়ভাবাপন্ন হইয়া হিন্দুসমাজের অতি নিম্নস্তরে অবস্থান করিতেছেন! পূজনীয় স্বজাতি মহাশয়গণের মধ্যে আমাপেক্ষা অনেক বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, ও ধনবান আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা সমগ্র নাপিত সমাজে সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর ন্যায়। সেই জন্য আশা করি তাঁহারা যেন আমার কোন অপরাধ গ্রহণ না করেন। আমি সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না, সুতরাং সমাজের আভ্যন্তরিক বৃত্তান্ত যতদূর জানি সমস্তই লিপিবদ্ধ করিব। নাপিত কুলের এই শোচনীয় অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, অজ্ঞতা, বিদ্যাহীনতা ও অর্থা-ভাবই আমাদের সমাজে এই শোচনীয় দুরবস্থা আনয়ন করিয়াছে। বলা বাহুল্য ডোমচণ্ডালাদি অস্পৃশ্য জাতির নাপিতের বৃত্তান্ত আমার আলোচনার বহির্ভূত।

ক্ষৌরব্যবসা—পরিশ্রম মাত্রেরই একটা নগদ ও নিরূপিত মূল্য আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা পাড়াগাঁয়ে প্রাচীন পদ্ধতি মতে ক্ষৌর কার্য্য করেন, তাঁহারা বৎসরান্তে পারিশ্রমিক স্বরূপ বেলনোক্তা সামান্য বেতন বা ধান্যাদি শস্য পাইয়া থাকেন। ইহাতে অনেক স্থলে ক্ষৌরকারের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। কারণ যজমান বৎসরান্তে উক্ত পারিশ্রমিক না দিলে, উহা আদায় করিবার কোন উপায় থাকে না, হীনাবস্থা হেতু অবস্থাপন্ন লোককে কিছু বলিতেও বোধ হয় কেহ সাহস করেন না। দ্বিতীয়তঃ বন্যা বা অনাবৃষ্টির দরুণ ফসল না জন্মিলে, যজমানের নিকট হইতে সম্বৎসরের পাওনার আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। যজমানও সুযোগ পাইলে অন্য নাপিতের দ্বারা ক্ষৌরি করাইয়া নিজের কর্ম্মোদ্ধার করিয়া থাকেন। ফলে আত্মকলহের সৃষ্টি ও সমাজে নানা কেলেঙ্কারী হয়। এই জন্য ক্ষৌর-

কর্ম্মদ্বারা কাহারও উন্নতি দেখা যায় না। তবে কলিকাতার ন্যায় সহরে যাঁহারা ক্ষৌর ব্যবসা করেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

অন্যান্য বৃত্তি—চাষ, চাকুরী, চিকিৎসা, বাণিজ্যাদি ব্যবসায়ও আমাদের সমাজে প্রচলিত, ইহার মধ্যে চাষ ও চিকিৎসা অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, অনেকে পুরুষানুক্রমে ঐ উভয় বৃত্তির কোন না কোন একটী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। আর চাকুরী ও বাণিজ্য আধুনিক বলিয়াই বোধ হয়। তবে আজকাল অনেকেই ক্ষৌরি ত্যাগ করিয়া ব্যবসান্তর গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় কেহ কখনও অপর জাতির দাসত্ব করেন না।

শ্রেণীবিভাগ—দেশাচার বা পরগণা ভেদে নাপিতের মধ্যে অনেকগুলি শ্রেণী হইয়া পড়িয়াছে। যথা আনরপুরিয়া, বামনবেন, কমলাবাড়ী বারেন্দ্র, উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, পশ্চিমরাঢ়ী, মামুদসাহী, সপ্তগ্রাম, সাতঘরিয়া, ফুল, ভুলু, সন্দীপ, হালদার, কোলা, হংসদহা, মুজগঞ্জী, ও খোট্টা। খোট্টা-নাপিত পশ্চিমাঞ্চল হইতে সংপ্রতি বঙ্গদেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। খোট্টা নাপিতের সঙ্গে বাঙ্গালী নাপিতেরা কোন সংস্রব রাখে না। বঙ্গদেশে অবস্থিতি নিবন্ধন পাঞ্জাবাদি স্থানের নাপিতেরাও উহাদিগকে ঘৃণা করে। হালদার কোলা, হংসদহা, মুজগঞ্জীদিগকে ২৪ পরগণায়, আর নোয়াখালীতে ভুলু ও সন্দীপ দেখা যায়, এই সকল শ্রেণীও এক একটী পটী বা থাক নামে অভিহিত। বিবাহাদি আদান-প্রদান-কার্য্য নিকটবর্ত্তী অথবা স্ব স্ব পটী ভিন্ন দূরবর্ত্তী পটীতে খুব কমই হয়। ইহার পরিণামে ভাষা ও ভাবের বিনিময় না হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে তাদৃশ একতা ও সহানুভূতি দেখা যায় না। এই কারণে সমাজের অবস্থা আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

দশবিধ সংস্কার—উপনয়ন ব্যতীত দশবিধ বৈদিক সংস্কারের আর সমস্তই প্রায় প্রচলিত আছে। অজ্ঞতা ও অসমর্থতা প্রযুক্ত সকলে যথা-বিধানে ঐ সকল সংস্কার সমাধা করিতে পারে না; তবে জাতকর্ম্ম, বিবাহ গর্ভাধান, সাধভক্ষণ, নিষ্ক্রামণ, কর্ণবেধ ও শ্রাদ্ধাদি শাস্ত্রানুসারেই নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বাল্যবিবাহ সমধিক প্রচলিত, বয়স্থা কন্যা প্রায়ই দেখা যায় না। কন্যাপণ অনেক স্থলে চলিতেছে, এই জন্যই বোধ হয় কন্যার বয়স ১০ বৎসর হইতে না হইতেই বিবাহ হইয়া যায়। মৃতদার ব্যক্তির পক্ষে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা বড় কষ্ট সাধ্য; বয়স্থা পাত্রী মিলে না অথচ পণের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই, বহু বিবাহও দেখা যায় না।

গোত্র—আলম্যান, কানাইমদন, কাশ্যপ, গর্গঋষি, দৈবকী, মৌদ্গল্য, মহানন্দ, রাম, রাঘব, রাজিব, বাৎস্য, শাণ্ডিল্য ভরদ্বাজ এবং শিবগোত্রও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কালে ঐ সকল গোত্র উল্লেখ করিয়া কার্য্য হইয়া থাকে, তবে অজ্ঞতাবশতঃ অনেকে "যথানাম গোত্র" বলিয়াও সংকল্প করে।

জাতীয় সংজ্ঞা—নাই, নাপিত, গ্রামণী, ছত্রী, বাৎসীসূত, ভাণ্ডপুট, ক্ষৌরকার, ক্ষুরী, মুণ্ডী, দিবাকীর্ত্তি, অন্তাবশায়ী, মুণ্ড, নখকুট, ও চন্দ্রিল এবং নরসুন্দর। কিন্তু সকল নাপিতকে নরসুন্দর বলা উচিত নহে। বারেন্দ্রশ্রেণীস্থ নাপিতেরাই সাধারণতঃ ঐ নামে পরিচিত।

উপাধি—প্রামাণিক, বারিক, শীল, ভাণ্ডারী, বৈদ্য, চন্দ্রবৈদ্য, দাশ, খান, নন্দী, বিশ্বাস, জোয়াদ্দার, রায়, মূর্দ্ধানি, মজুমদার, স্বাহা, সিকদার, নাগ, মাঝ, মণ্ডল, সরকার, লাহা, সিংহ, চন্দ্র, ঠাকুর মল্লিক, মহাপাত্র ইত্যাদি

শিক্ষা—বিদ্যা শিক্ষার স্রোত অতি মৃদুভাবে চলিতেছে, দৈবাধীন

যিনি নিজে লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সন্তানদিগকে লেখা পড়া শিখাইতে চেষ্টা করেন। আর যাঁহারা জাতি-ব্যবসায় করেন তাঁহারা প্রায়শঃ ঐ জাতীয় ব্যবসায়কেই একমাত্র অবলম্বন মনে করিয়া বিদ্যা শিক্ষার দিকে তত মনোযোগী হয়েন না। আজকাল সদাশয় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে সর্ব্বত্র জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে অবাধ-শিক্ষা প্রচার হওয়ায় আমাদের স্বজাতির মধ্যেও অনেকে ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষাতে সুপণ্ডিত হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারীও অনেক আছেন, এবং উচ্চ পদেও অনেকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সুখের বিষয় এই যে নাপিতের ছেলেকে পড়াইলে, তাহাকে প্রায়ই প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে দেখা যায়। বি, এ; এম, এ; বি, এ, বি, এল; প্রভৃতি উপাধি-ধারীও আছেন। তবে এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়িয়া অর্থাভাব-নিবন্ধন অনেকেই পাঠ শেষ করিতে বাধ্য হইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় দেখিতেছেন। এল, এম, এস এবং এম, বি উপাধি-ধারী খ্যাতনামা ডাক্তারও কয়েকজন আছেন। বহুপুরুষ হইতে চিকিৎসা-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ অনেক সংস্কৃতজ্ঞ কবিরাজের বংশাবলী বর্ত্তমান আছে। এজন্য সংস্কৃত শিক্ষা চিরদিনই প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা অনেকেই ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অনেকে আয়ুর্ব্বেদীয় উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যোগ্যতার সহিত চিকিৎসা করিতেছেন।

খাদ্য—হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণের খাদ্যই নাপিতের খাদ্য। বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীরা প্রায়ই মাংস খায় না, এমন কি অনেকে মৎস্যও খায় না। মদ্যপান করিতে খুব কম লোককে দেখা যায়। শাক্তদিগের মধ্যে পাটার মাংস ও মৎস্যের ব্যবহার আছে। বিধবাদিগের মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই বঙ্গদেশের উচ্চবর্ণের ন্যায় (স্মার্ত্ত রঘুনন্দের বিধানানুযায়ী) আহারের প্রচলন আছে।

ধর্ম্ম—বৈষ্ণব ধর্ম্মই সমধিক প্রচলিত। শাক্ত ও শৈব ধর্ম্মের প্রচলন খুব কম।

আবশ্যকতা—হিন্দুর যাবতীয় বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মে নাপিতের আবশ্যক। জনন, মরণ, দীক্ষা, চূড়াকরণ, উপনয়ন, এবং বিবাহাদিতে নাপিতের কার্য্য অপরিহার্য্য। নাপিত ভিন্ন অশৌচ নাশের কোন উপায় নাই। দেশভেদে নাপিতকে ব্রাহ্মণের অনুপস্থিতিতে পৌরহিত্য পর্য্যন্ত করিতে দেখা যায়। এবিষয়ে পরে যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে। ফলতঃ নাপিতের আবশ্যকতা হিন্দু সমাজে অপরাপর জাতি অপেক্ষা অনেক অধিক। এজন্য একটা প্রবাদও আছে যে,

"ধাই বলে হউক, বামুন বলে মরুক
আর নাপিত বলে যা হয় তাই করুক।"

স্বভাব—ইঁহারা পরিশ্রমী, স্বভাবতঃ সরল ও স্বল্পে সন্তুষ্ট। ইঁহারা নির্ব্বিবাদে হিন্দুর অন্তঃপুরেও প্রবেশাধিকার পাইয়া থাকেন; পরন্তু এমন বিশ্বাসী 'জাত' খুব কমই দেখা যায়। অতি বিশ্বস্ত লোক ভিন্ন ভাণ্ডার রক্ষার ভার কেহ কখনও কাহাকেও দেয় কি? যজ্ঞ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে নাপিত ভাণ্ডার রক্ষার ভার পাইত বলিয়া ইহাদের একটী উপাধি "ভাণ্ডারী।" যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঐ সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদের বংশধরেরা ঐ উপাধিটী অদ্যাবধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। দুঃখের বিষয় "নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ" এই অপবাদটী পুরস্কার দিয়া কর্ত্তারা নাপিতের মান্য রক্ষা করিয়াছেন; আমরা এ বিষয়ে পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব

আচার ব্যবহার—বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই শুদ্ধাচার রক্ষা করায় আবহমান কাল হইতে নাপিত জাতি হিন্দু সমাজে আদরণীয়। এজন্য শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণে ইঁহাদের পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। ইঁহারা নবশাখার অন্তর্ভুক্ত

ও সৎশূদ্র বলিয়া এক্ষণে পরিগণিত। ভুলক্রমে বা অর্থ-লোভে কেহ কোন অস্পর্শীয় জাতিকে ক্ষৌর করিলে, তাহাকে সমাজচ্যুত অর্থাৎ 'একঘরে' হইয়া থাকিতে হয়। আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সত্য ও তীর্থপরায়ণতা প্রভৃতি যে সকল গুণ অর্থ-সাপেক্ষ নহে, কুল-লক্ষণের সে সমস্তই নাপিত সমাজে বর্ত্তমান। আর্য্যোচিত আভ্যুদয়িক ও কুশণ্ডিকা ক্রিয়াও প্রচলিত আছে এবং অসপিণ্ড প্রথা অনুসারেই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক এক জন "প্রামাণিকের" নেতৃত্বে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম পরিচালিত হয়। এই সকল প্রামাণিক অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ও উচ্চকুলসম্ভূত বলিয়া সমাজ-মর্য্যাদাও পাইয়া থাকেন।

নাপিতের জাতীয় সংজ্ঞা।

নাপিতের পর্য্যায় লিখিতে **অমর কোষ** মাত্র ৫টী সংজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"ক্ষুরি মুণ্ডিঃ, দিবাকীর্ত্তী নাপিতান্তাবশায়িনঃ"।

ইহা ছাড়াও নাই, ছত্রী, বাৎসীসুত, নখকুট, গ্রামণী, চন্দ্রিল, মুণ্ড ও ভাণ্ডপুট এই কয়েকটী নামও অনেক আধুনিক ও পুরাতন অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল জাতীয় সংজ্ঞার কতকগুলি বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, আমরা কোন একটা মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি কি না।

১। নাই—"নাই" বলিলে কিছুই নাই, তবুও দেখি যদি কিছু পাই। "নাই" কথাটী অভাবার্থক অথবা প্রাণিগণের নাভিকে বুঝায়। উশন—সংহিতায় দেখা যায়।—"নাভেরূর্দ্ধে বপতে ইতি নায়া" অর্থাৎ নাপিতেরা নাভির উপর দেশে ক্ষৌর করে বলিয়া নাভি (নাই ইতি ভাষা) নামে অভিহিত। নাভির উর্দ্ধে ক্ষৌর করে বলিয়াই যদি "নাই" সংজ্ঞা হয়

তবে নাপিত জাতির একটু শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ আধুনিক নাপিতেরা নাভির অধঃদেশের অর্থাৎ পায়ের নখাদিও কর্ত্তন করিয়া থাকে, পূর্ব্বে ঐরূপ ছিল না—এরূপ আভাষ পাওয়া গেল।

২। নাপিত—এই শব্দের ধাতু ও ব্যুৎপত্ত্যর্থ দেখুন।

ন—আপ্+ক্ত অর্থ—(কিছুই উল্লেখ নাই)—শব্দকল্পদ্রুম।

ন—আপ্+ক্ত অর্থ—আত্মসমীপে নেয় যে—অমরকোষ টীকা।

ন—আপ্+ক্ত অর্থ—মান্য পায় না যে—বাচস্পতি।

ন—আপ্+ক্ত+ইট্ অর্থ—ন আপ্নোতি সরলতামিতি।

নঞ্‌্আপ্ ইট্ চ—বিশ্বকোষ।

পাঠক দেখিতেছেন উপর্য্যুক্ত ব্যুৎপত্তিগত অর্থগুলি নাপিতের হীনতাসূচক। বিদ্বেষ-বশতঃই হউক আর যে কোন কারণেই হউক, কোষ-কারগণ নাপিতের প্রকৃতার্থ কেহ লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহাদের সময়ে যিনি যেরূপ অবস্থায় নাপিতকে দেখিয়াছেন, সেই অবস্থানুরূপ ব্যাখ্যা তাঁহাদের স্ব স্ব কৃতাভিধানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন আভিধানিক যদি দৈবাৎ একটী ভুলও করিয়া থাকেন, তৎপরবর্ত্তী অপর কোন কোষ-কার আবশ্যক না হইলে ঐ ভুলই বজায় রাখিয়া যান, সামান্য এক আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া নূতনত্বের পরিচয় রক্ষা করেন মাত্র! উল্লিখিত চারিটী দৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ। যেহেতু—

“আপ্” ধাতুর অর্থ পাওয়া, আর “ন” অভাবার্থক, সুতরাং প্রকৃতি-প্রত্যয় দেখিয়া বুঝা গেল “কোন একটা কিছু না পাওয়া”। ইহাতেই কেহ বলিলেন “মান্য পায় না যে” অর্থাৎ নগন্য, কেহ বলিলেন সরলতা পায় না যে অর্থাৎ ক্রূর-স্বভাব ইত্যাদি। ফলতঃ ন—আপ্+ক্ত প্রত্যয় করিয়া “নাপিত” শব্দ সিদ্ধই হইতে পারে না,—“নাপ্ত” হয়, যেমন প্র—আপ্ +ক্ত=প্রাপ্ত। এই জন্যই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক কোষ-কর্ত্তা

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, ন—আপ্ +তন ইট্ চ যোগ করিয়া উক্ত শব্দ নিষ্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আবার "ন আপ্নোতি সরলতামিতি" এই অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া নাপিতকে আরও হেয় করিতে চাহেন। কেন? "ন আপ্নোতি পাপম্"—বলিলেও ত বলা যায়। নাপিত না হয় অর্থহীন, দীনভাবাপন্নই হইয়াছে, কিন্তু তাহারা "সরলতা-বর্জ্জিত" কখনই নহে। বস্তুতঃ তাহারা যাবতীয় হিন্দুর পাপ-রাশিই নাশ করিয়া থাকে। ব্রহ্মার কায়া হইতে উৎপন্ন হইলেও সরলপ্রাণ নাপিত ভিন্ন অশৌচ নাশ বা উপনয়নাদি কোনরূপেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। পুষ্করতীর্থে স্বয়ং ব্রহ্মাকেও যথাবিধানে ক্ষৌরকার্য্য করিয়া যজ্ঞে ব্রতী হইতে হইয়াছিল। চূড়াকরণে নাপিতকে এখনও সর্ব্ববর্ণে ধ্যান করিয়া থাকেন। এ সকল বিষয় বিশ্বকোষকার নিশ্চয়ই অবগত আছেন। দুঃখের বিষয় নাপিতের ভাগ্যে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবেও করুণা-বিন্দুর অভাব; নাপিতের উপাদান তাঁহার বিশ্বকোষে যথেষ্টই আছে।

যাহাহউক আমাদিগকে দেখিতে হইবে তবে কিরূপে নাপিত শব্দ নিষ্পন্ন হইল? আমরা দেখিতে পাই, বাঙ্গালাভাষায় যে সকল শব্দ প্রচলিত, তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃতে "নপাত" ও "নপ্তা" বলিয়া দুইটী শব্দ আছে, ইহাদেরই অপভ্রংশে নাপিত শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। এই দুইটী শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থের সহিত নাপিতের অতীত ও বর্ত্তমান বৈদিক অনুষ্ঠানের অনেক সাদৃশ্যও আছে। যথা—নপাত (পুং) নাস্তি পাতো যত্র। ন পাতং করোতি যঃ সঃ নপাত। "অবিৎসি নপাতং বিক্রমণঞ্চ বিষ্ণোঃ" (শুক্লযজুঃ ১৯।৫৬)। ন পাতো যত্র সঃ নপাতো; দেবযানপথঃ। যত্র গতানাং পাতো নাস্তি (বেদদীপ) যেখানে গমন করিলে পতন হয় না, ইহাই হইল নপাত শব্দের ভাবার্থ।

পুরাকালে এবং বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজে বেদ-বিহিত যে সকল

ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত এবং হইতেছে তাহাতে নাপিতের আবশ্যকতা সর্ব্বাগ্রে। বিশ্বকোষও বলিতেছেন "হিন্দুদিগের যাবতীয় শুভকার্য্যে নাপিতের উপস্থিত থাকা আবশ্যক।" চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহাদি দশবিধ সংস্কারে নাপিতকে একটী প্রধান উপকরণস্বরূপ ধরা হইয়া থাকে ; সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে, নাপিতকে কেবল ক্ষৌর করণার্থ ই দরকার, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। নাপিতকে স্পর্শ করিলে পবিত্র হয়, ইহাই অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহা না হইলে অন্য জাতীয় লোক দ্বারাও নাপিতের কার্য্য সমাধা হইতে পারিত। এই জন্যই "স্পর্শমণি" বা পরশ-চিকিৎসা-মণি বলিয়া নাপিতের একটা নামও হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে ; অদ্যাবধি বিবাহ সংস্কারে "গৌর বচনে" নাপিতের ঐ নামটীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জনন-মরণাদি অশৌচ এবং প্রায়শ্চিত্তাদিতেও নাপিতকে স্পর্শ না করিলে, কোনরূপ ধর্ম্মাচার অনুষ্ঠান করা যায় না ; সুতরাং নাপিত ঐ দেবযান পথস্বরূপ। কারণ নাপিতের নিকট গমন (পত্ ধাতু—গমনে) করতঃ মুণ্ডনাদি কর্ম্মসম্পাদনীয়, পক্ষান্তরে উহাদিগকে স্পর্শ করিলে আর পতন হয় না অর্থাৎ তাহারা স্পর্শ ও ক্ষৌরকার্য্য করিলে, পাতকী ধর্ম্মাচার অনুষ্ঠানের উপযোগী হয়। ইহা প্রত্যক্ষ এবং সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং ঐ নপাত শব্দ হইতেই নাপিত শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। নিপাতন করিলেও নপাত শব্দ হইতে (নপাত+ষ্ণ্য) নাপিত শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে কিম্বা ন-আপতয়তি (পাতিত্যং করোতি ইতি)ন-আ—পত্+ইট্ করিলেও হইতে পারে। আর নপ্তা শব্দের বিষয় পরে বলিব।

(নপাত ও নপ্তা শব্দের সামঞ্জস্য "বৈদিক আভাষে" দেখুন)।

৩। গ্রামণী—গ্রাম—নী ধাতু+ক্বিপ=গ্রামং (সমূহং) নয়তি প্রেরয়তি স্বস্বকর্ম্মেসু ইতি গ্রামণী,—যিনি সকলকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করেন ; গ্রামের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিকে বা অধিপতিকে গ্রামণী বলে, এই

শব্দ হইতেই ব্রাহ্মণদিগের বর্ত্তমান "গাঁই" কথার উৎপত্তি হইয়াছে (পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, ইহা ছাড়া বামুন নাই)। জগতের আদি গ্রন্থ ঋক্ সংহিতায় গ্রামপতি গ্রামণী নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৈদিক সময় হইতেই গ্রামপতিত্বের ভার ব্রাহ্মণদিগের প্রাপ্য ছিল।

হিন্দু রাজগণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহাকেও গ্রামণীত্ব বা গ্রামপতিত্ব প্রদান করিতেন না। কারণ শাস্ত্র বলিতেছেন—

গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যোহি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥

অর্থ—ব্রাহ্মণকে গ্রামপতি, কায়স্থকে লেখকের কার্য্যে, শুল্ক আদায় কার্য্যে বৈশ্যকে এবং দারোয়ানের কার্য্যে পাদজ অর্থাৎ শূদ্রকে নিযুক্ত করিবে। (শুক্রনীতি ১।৪২৬)

সুতরাং গ্রামপতি বা গ্রামণীর পদ ব্রাহ্মণেরাই লাভ করিয়া স্ব স্ব গ্রামের অধিবাসীদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। এখন কিন্তু গ্রামণী বলিলে সাধারণতঃ নাপিতকেই বুঝায়। বহু প্রামাণ্য অভিধানে এই অর্থই আছে। "শব্দসার" নামক বিখ্যাত অভিধানে ৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ও এই অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু এই নাপিতের একটী উপাধিও আছে, যাহাতে সে গ্রামের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হয়, ঐ উপাধিটী "প্রামাণিক"—অপভ্রংশে পরামাণিক। আজ কাল অনেক জাতির মধ্যে "প্রামাণিক" প্রধান বা মণ্ডল এই উপাধি সৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রামাণিক বলিলে সাধারণতঃ নাপিতকেই বুঝায়। অনেক স্থলে আবার নাপিতের মান-মর্য্যাদাও আছে। সেই স্থানের বা গ্রামের বাসিন্দাগণ নাপিতকে বেশ মান্যও করে এবং সামাজিক ক্রিয়া সম্বন্ধে তাহার নিকট হইতে উপদেশাদিও লইয়া থাকে (মাননীয় রিজলী সাহেবের রিপোর্ট দেখুন); ইহাদের বসতিও সেইরূপ, প্রতি গ্রামে সকল রকমের জাতি না থাকিলেও

পুরুষানুক্রমে গ্রামে নাপিত একঘর বাস করিতেছে, ইহা বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন।

৪। প্রামাণিক—(প্রমাণ+ষ্ণিক)=মর্য্যাদার্হঃ, শাস্ত্রজ্ঞ, পরিচ্ছেদক ও প্রামাণ-কর্ত্তাকে বুঝায়; সুতরাং গ্রামণী ও প্রামাণিক প্রায়ই একার্থ বাচক। পাঠক দেখিতেছেন, উপর্যুক্ত তিনটী পরিভাষাতেই নাপিতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিতেছে। মূর্দ্ধনি, মহাপাত্রাদি উপাধিও নাপিতের শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচায়ক। ক্রমশঃ দেখিতে পাইবেন, নাপিত নগণ্য ও নেহাৎ নরাধম নহে। এই সকল শব্দ ও অর্থ অতি প্রাচীন এবং প্রামাণ্য অভিধানে আছে।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, "গঙ্গাপুত্র" শব্দের অর্থ ভীষ্মদেব হইতে পারে, আবার মুদ্দাফরাসও হইতে পারে; সুতরাং গ্রামণী শব্দও সেইরূপ ব্রাহ্মণকে একার্থে এবং নাপিতকে ভিন্নার্থে বুঝাইয়া থাকে। আমরা বলি "গ্রামণী" শব্দে তাহা হইতে পারে না, কারণ সর্ব্বজন বিদিত "প্রামাণিক" এই ভারত-বিখ্যাত উপাধিটী নাপিতের সপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে।

"**শব্দকল্পদ্রুম**" আবার কি বলিতেছেন—শুনুন।—

৫। বাৎসীসুত—বাৎস্য (বৎস+ষ্ণ্য) মুনিবিশেষ-বাৎস্যসাবর্ণি-গোত্রয়ো রৌর্ব্ব চ্যবন-ভার্গব-জামদগ্ন্য-প্লুবৎপ্রবরাঃ।—(ইত্যুদ্বাহতত্ত্বম্)

এই সম্বন্ধে **বিশ্বকোষ** বলিতেছেন—

বাৎসী (স্ত্রী) বাৎস্যশাখাসম্ভূতা স্ত্রী।

বাৎসীপুত্র—আচার্য্যভেদ, নাপিত!

বুঝা গেল বাৎস্য নামে এক মুনি ছিলেন, বৎস গোত্রে তিনি জন্মিয়াছিলেন। এই গোত্রের ৫টী প্রবর যথা—ঔর্ব্ব; চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্লুবৎ। এই বাৎসী গোত্রীয় কোন স্ত্রীর গর্ভে নাপিতের উৎপত্তি, এজন্য নাপিতের এক নাম বাৎসীসুত। চ্যবন মুনি মহর্ষি ভৃগুর পুত্র এবং অতি তেজস্বী ও মহাতপঃবলসম্পন্ন ঋষি ছিলেন। তাঁহারই জন্য প্রসিদ্ধ

"চ্যবন-প্রাস" নামক আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনিই সূর্য্য—তনয় অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে স্বর্গের সমাজের সকল কর্ম্মেই দেবতাদের সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়াইয়াছিলেন! এই জন্যই তাঁহারা দেব-বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত। নাপিতও সৃষ্টির গোড়া হইতে চিকিৎসক, আর ঔর্ব্ব ঋষি সূর্য্য বংশীয় ক্ষত্রিয়-রাজ সগরের জাত-কর্ম্মাদি নাপিতের ন্যায় সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এ বিষয় পরে যথাস্থানে সন্নিবেশ করিব। নাপিতের গোত্র মধ্যে "বাৎস্য" গোত্রও আছে। (বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য)

৬। চন্দ্রিল—(চন্দ্র+ইল) পুং শিবঃ। নাপিতঃ বাস্তুকম্ মেদিন্যাম্—ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ।

মহাদেবের কপালে চন্দ্রদেব আছেন বলিয়া তাঁহার এক নাম চন্দ্রিল বা চন্দ্রশেখর। বিবাহের "গৌরবচনে" শিবের নাভি হইতে নাপিতের উৎপত্তি বলিয়া কিম্বদন্তী আছে, আবার শিবগোত্র নাপিতও দেখা যায়; সুতরাং শিবের সন্তানকেও চন্দ্রিল বলা যাইতে পারে।

৭। ছত্রী—ক্ষত্রি শব্দের অপভ্রংশ। পশ্চিমা বামুন, সুতরাং বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক দেখি না।

৮। ভাণ্ডপুট—নাপিতঃ ইতি জটাধর। কেন নাপিতকে ভাণ্ডপুট বলে?

বৃহদ্ভাণ্ডে তুষৈঃ পূর্ণে মধ্যে মূষাং বিধারয়েৎ।
ক্ষিপ্তাগ্নিং মুদ্রয়েদ্ভাণ্ডং তদ্ভাণ্ডপুট মুচ্যতে॥—ইতি ভাবপ্রকাশ।

এইটী চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা, নাপিতের মধ্যে সহস্রপুট-লৌহাদি প্রস্তুতকারক অনেক সংস্কৃত-বিদ্যা-বিশারদ কবিরাজ এখনও বিদ্যমান আছেন, অতি প্রাচীন কালে চিকিৎসা ব্যবসায়টী বোধ হয় নাপিতেরই ছিল। বড় বড় জালায় করিয়া ধাতু ও তৈলাদি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের পাক জারণ, মারণাদি কার্য্যে পারদর্শিতা হেতুই এই নাম হইয়াছিল।

৯। চন্দ্রবৈদ্য—চন্দ্রদেবের একটী নাম সোম, আবার "সোম-বৈদ্য" বলিয়া এক রূপ বৈদ্যও আছে। তাহা হইলে চন্দ্র-বৈদ্য, সোম-বৈদ্য একই অর্থ-বোধক। বৈদ্য অর্থে চিকিৎসক, ইহা জাতিবাচক শব্দ নহে। এখন যেমন যে কোন জাতি ডাক্তার উপাধি ধরিতে পারেন, তেমনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী মাত্রই বৈদ্য নামে অভিধেয়। যাহাদিগকে আমরা আজকাল "বৈদ্য" বলিয়া বুঝি, তাহারা অম্বষ্ঠ। মনু বলেন "ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াং অম্বষ্ঠো নাম জায়তে"—ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ উৎপন্ন হইয়াছিল; আর ইহাদিগের বৃত্তি চিকিৎসা। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে সত্যযুগে একমাত্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণের সৃষ্টি হয় নাই। সত্যে ব্রাহ্মণ, ত্রেতায় ক্ষত্রিয় এবং দ্বাপরে বৈশ্য শূদ্রের উৎপত্তি; সুতরাং দ্বাপর যুগ ভিন্ন তৎপূর্ব্বে অম্বোষ্ঠোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু রোগ শোকাদি ত ছিল, কাজেই চিকিৎসা ব্যবসায়ও ছিল। অপিচ অত্রি, হারীত, চরক, সুশ্রুতাদি ঋষিই যখন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রণেতা, তখন অম্বষ্ঠোৎপত্তির পূর্ব্বে চিকিৎসা বৃত্তি ব্রাহ্মণেরই ছিল! মনুর ব্যবস্থা প্রণয়ন কালে "সকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ" অর্থাৎ স্বকর্ম্ম ত্যাগ করিলে বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে, আর "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্" অর্থাৎ অম্বষ্ঠের বৃত্তি চিকিৎসা—এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইলে, চিকিৎসাজীবী অনেক ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ-সমাজ-চ্যুত হইতে হইয়াছিল। তাঁহারাই নানা স্থানে নানা মূর্ত্তিতে বিরাজমান। এসম্বন্ধে বাবু গোবিন্দ চন্দ্র বসাক তৎপ্রণীত "জাতিমালাতে" যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই,—"এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে বৈদ্যেরা যদি অম্বষ্ঠ না হয়, তবে বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠ কে? ইহার উত্তরে আমি বলি যে, পূর্ব্ব ময়মনসিংহে ও শ্রীহট্টে যাহারা "চন্দ্র-বৈদ্য" ও "লতা-বৈদ্য" নামে বিখ্যাত এবং আমাদের বাংলাদেশে নাপিত ও বারুই বলিয়া পরিচিত তাহারা অম্বষ্ঠ। ইহাদের জল ব্রাহ্মণের আচরণীয়"।

আমি এক্ষণে বাদ প্রতিবাদ করা উচিত মনে করি না। চন্দ্রদেবের একটি নাম ওষধীশ বা দ্বিজরাজ। যাবতীয় ফলপাকান্ত বৃক্ষ এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত গাছ-গাছড়াকে জ্যোতির্লতা বা "ওষধি" বলে আর পানও লতা বিশেষ, সুতরাং ওষধিবিদ্ নাপিতকে চন্দ্রবৈদ্য আর লতাবিদ্ বারুইকে লতাবৈদ্য বলা অসঙ্গত নহে। নাপিত সমাজে 'চন্দ্র' উপাধিরও বহুল প্রচার আছে এবং দেশ-ভেদে অম্বট্ উপাধিও নাকি আছে।

১০। ক্ষুরী— পুং (ক্ষুর+ইন্) ক্ষুরের দ্বারা ক্ষৌর করে বলিয়া নাপিতের এক নাম ক্ষুরী।

১১। মুণ্ডী—পুং (মুণ্ড+ণিন্ কর্ত্তৃ) মুণ্ডন করে বলিয়া মুণ্ডী।

১২। অন্তাবশায়ী—অন্ত—অব+শোধাতু ণিন্। (শান, শূর, শায়ক, নিশান প্রভৃতি শব্দ, শো ধাতু-নিষ্পন্ন)

—অন্তে (অন্তিমে) শেযাবস্থায়াং শুদ্ধিকৃত্তেন (মুণ্ডনে ন বা) পাপম্ খর্ব্বীকরোতি যঃ সঃ (মুনিবিশেষ ইতি হেমচন্দ্র)

মৃত্যুকালে প্রায়শ্চিত্তাদি করিতে হইলে অগ্রে নাপিত দ্বারা, মুণ্ডন করিতে হয়, পাপ নাশের জন্যই হিন্দু শাস্ত্রে এই ব্যবস্থা আছে; নাপিতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরা অন্তাবশায়ী এবং "অন্তাবসায়ী" এই দুইটী শব্দের স্বাতন্ত্র্য (বানান দেখুন) রক্ষা না করিয়া, নাপিতকেও অন্ত্যজ মধ্যে গণ্য করিতে চাহেন, কিন্তু অগ্নি ছাই চাপা কতদিন থাকে। অন্ত্যজ কি যাকে তাকে বলা যায়?

মহর্ষি অঙ্গিরা কি বলিয়াছেন শুনুন—

চণ্ডালঃ শ্বপচঃ ক্ষত্তা সূতো বৈদেহকস্তথা—
মাগধায়োগবৌ চৈব সপ্তৈতেঽন্তাবসায়িনঃ।

চণ্ডাল, শ্বপচ, ক্ষত্তা, সূত, বৈদেহক, মাগধ ও আয়োগব এই সাত জাতিকে অন্তাবসায়ী বলে। (অন্ত+অব—সো+ণিন্)—অন্তম্

(গ্রামান্তং) বসতি ণিন্। যাহারা গ্রামের বাহিরে বাস করে, তাহারাই অন্তাবসায়ী।

১২। নরসুন্দর—বলিয়া কোন কথা অভিধানে পাওয়া যায় না। অবশ্য আধুনিক ছোট ছোট বাঙ্গালা শব্দ-কোষের কথা বলিতেছি না। প্রকৃতিবাদ অভিধান, বাচস্পতি, শব্দকল্পদ্রুম, অমরকোষ এবং বিশ্বকোষ প্রভৃতি কোন প্রামাণ্য অভিধানে উহা নাই। সুতরাং ঐ শব্দটী আধুনিক। বাস্তবিক এইটী নাপিতের পুরাকালের কোন জাতীয় সংজ্ঞা নহে। কিন্তু উহা প্রত্যক্ষই একটী সমাস-নিষ্পন্ন শব্দ বটে।—

(১) নরাণাম্ সৌন্দর্য্যং সম্পাদয়তি (ক্ষৌরকার্য্যেন) যঃ সঃ ইতি বহুব্রীহিঃ (২) অথবা নরেষু সুন্দরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) যঃ সঃ ইতি সপ্তমী তৎপুরুষ। আধুনিক পণ্ডিত মহাশয়েরা অবশ্য প্রথমোক্ত মতটীই সমর্থন করিবেন এবং হয়ত আমাদের কল্যাণকামী কোন কোষকার ভবিষ্যতে তাঁহার অভিধানে ঐরূপ শব্দরূপই মুদ্রিত করিয়া দিবেন। কিন্তু নাপিতকে "নরসুন্দর" বলার প্রকৃত কারণ কি, তাহা জানিলে বোধ হয় আর ঐরূপ করিবেন না। এজন্য এখানে নরসুন্দরের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া গেল। হিন্দু-শাস্ত্র-বিশারদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "জাতিতত্ত্ব-বারিধি"তে একস্থানে দেখা যায়—"সরমা নামে জনৈক নাপিত বারেন্দ্র কায়স্থ দলে প্রবেশ করে। তাহাকে আধ্ঘর বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল। কালক্রমে সরমার বংশ লোপ হইয়াছে। এবং ধর, কর, গুণ, দাম প্রভৃতি আরও দশ ঘর কায়স্থ, বারেন্দ্র-কায়স্থ দলে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা হেজ (নিকৃষ্ট) বলিয়া খ্যাত। ঢাকুরে লেখা আছে নীচ শূদ্র জাতীয় নরসুন্দর সরমা নামে একব্যক্তি ভৃগুনন্দীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। সে ভৃগুনন্দীর নিকট মর্য্যাদা প্রার্থনা করাতে তাহাকে আধ ঘর বলিয়া

স্থির করেন। বারেন্দ্র কায়স্থ কুলে নাপিত ॥০ (অর্দ্ধ) ঘর—ইহা প্রসিদ্ধ কথা।”

(জাতিতত্ত্ববারিধি প্রথম ভাগের যে পুস্তক ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ছাপান হইয়াছিল,তাহার ৩৩১ ও ২৫৪—২৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় কৃত “সম্বন্ধনির্ণয়” নামক গ্রন্থে দেখা যায়—যে, “যে সকল কায়স্থ পূর্ব্বাবধি বঙ্গদেশে বাস করিয়া আসিতেছেন, যাঁহারা পাশ্চাত্য কায়স্থদিগের সহিত সংস্রবাধিকার প্রাপ্ত হন নাই এবং বারেন্দ্র ভূমিই যাঁহাদিগের সূতিকাগৃহ তাঁহারাই বারেন্দ্র কায়স্থ বলিয়া পরিগণিত। ইঁহাদিগের সংখ্যাও সর্ব্বসমেত সাড়ে সাত ঘর। দাস, নন্দী, চাকি, শরমা, নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত। (এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, শরমা পূর্ব্বে নরসুন্দর জাতি ছিলেন। কালক্রমে কোন অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন দ্বারা, দাস নন্দী প্রভৃতিকে কোন দৈবদুর্ব্বিপাক হইতে মুক্ত করেন। কেহ বলেন তিনি সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। ইতি—টীকা।)

দাস, নন্দী, চাকি এই তিন ঘর কুলীন, শরমাও কালক্রমে কৌলিন্য মর্য্যাদাসম্পন্ন হয়েন। তদবধি শরমা আধ ঘর বলিয়া পরিগণিত হন এবং দাস, নন্দী, চাকির আধ্ ঘর নিয়ে আসন গ্রহণ করেন। নাগ, সিংহ দেব, দত্ত মৌলিক বলিয়া পরিগণিত।

নাগ সিদ্ধমৌলিক, সিংহ সাধ্যকুল, দেব ও দত্ত নিম্নকুল বলিয়া খ্যাত।

বারেন্দ্র কায়স্থগণের কুল মর্য্যাদানুযায়ী স্থানাদি যথা—

বংশ	গোত্র	সমাজের নাম—
দাস,	অত্রি,	সাধুখালী,
নন্দী,	কাশ্যপ·	নন্দীগ্রাম,
চাকি	গৌতম	১ম শ্রেণী—সরিষ, বাজুরস।
		২য় শ্রেণী—ময়ূরহট্ট।

ইহারা শরমার অনুগ্রহে কোন দুর্ব্বিপাক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি আমাদিগের যে উপকার করিয়াছেন তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ আমরা আপনার প্রসন্নতা বিধান করিতে ইচ্ছা করি। শরমা কহিলেন—আপনাদের সহিত আমার ধর্ম্মসম্বন্ধ থাকিলেই আমার যথেষ্ট প্রীতি হইবে। তাঁহার এতাদৃশ গম্ভীর উত্তরে দাস, নন্দী প্রভৃতি মহাজনগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, অদ্যাবধি আমরা আপনাকে আমাদের কায়স্থ-সমাজমধ্যে পরিগণিত করিতে ইচ্ছা করি। সেই কথা শুনিয়া শরমা কহিলেন মহোদয়গণ! যদিও আপনারা আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন বটে, কিন্তু আমি তাহাতে আপনাকে বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া জ্ঞান করিতেছি না। কারণ আমি নাপিত-জাতিমধ্যে অগ্রগণ্য আছি, অর্থাৎ "প্রামাণিক" বলিয়া খ্যাত। আপনাদিগের দলে উঠিলে আমাকে অত্যন্ত নীচকুল বলিয়া গণ্য হইতে হইবে। ইহারা উত্তর দিলেন, আমরা আপনাকে আমাদিগের সমাজ-মর্য্যাদা প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।

তখন তিনি সম্মত হইলেন। তৎপরে শরমার কয়েকটী কন্যা ও ও পৌত্রী দাস নন্দী ও চাকীদের ঘরে প্রদত্ত হইল। সমাজস্থ সকল কায়স্থ যখন ইহার মূল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন, তখন ইহাকে পূর্ণ মাত্রায় একজন কায়স্থ ও পূর্ণ মাত্রায় কুলীন বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হয়েন। পরে দলাদলি সূত্রে শরমা একপ্রকার প্রচলিত হইলেন। ক্রমে দলাদলির বন্ধন শিথিল হইলে, তাঁহার বংশপরম্পরা বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে আদধর কুলীন বলিয়াই প্রসিদ্ধ থাকিলেন, আধঘরের অর্থ—কন্যাদানকালে কুলীন, গ্রহণে মৌলিক। কেহ বিপরীতও বলেন। শরমার বংশের কন্যা গৃহীত হইত, শরমার বংশে পারতপক্ষে সহজে

কেহ কন্যাদান করিতেন না। এইরূপে শরমার বংশাবলী এক প্রকার নির্ম্মূল হইয়া আসিয়াছে বলিলেই হয়। ইহাদিগের কুলপুত্রগত। কুলের হ্রাসবৃদ্ধি নাই। সৎক্রিয়া দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি হয় অসৎ কার্য্য দ্বারা কুলের ধ্বংস হয় না, কিন্তু কিঞ্চিন্ন্যূনতা জন্মে। অধুনা রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা, মুর্শিদাবাদের পূর্ব্বভাগ ও নদিয়ার উত্তরাংশে ইহাদিগের বাসের আধিক্য দেখা যায়।

বারেন্দ্র কায়স্থকুলে বল্লালি মর্য্যাদা স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহারা কহেন, বল্লাল নীচ জাতীয় কন্যা গ্রহণ দ্বারা মহাপাতকী হইয়াছিলেন। মহাপাতকীর প্রদত্ত মর্য্যাদা গ্রহণে পাপ ব্যতীত পুণ্য সঞ্চয় হয় না। যাহাতে মন সঙ্কুচিত থাকে, উহা পাপের লক্ষণ। সে যাহা হউক বল্লাল কর্ত্তৃক নিত্যানন্দ নামক কোন কুক্রিয়াশালী এবং কতিপয় অনাচরণীয় শূদ্রকে কায়স্থ বলিয়া গৃহীত করায়, বারেন্দ্রগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া স্বস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী অন্য শূদ্রকে কায়স্থ শ্রেণীতে প্রবেশ করান হেতুই ইহাদিগের ভয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথাক্রমে নিম্নলিখিত স্থানে যাইয়া বাস করেন।

কর্কটনাগ————শৈলকুপা,
জটাধর নাগ————শরগ্রাম,
ভৃগুনন্দী————নন্দীগাঁতি,
মুরারীচাকী————চাঁকীগাঁতি

ইহাদিগেরই প্রযত্নে বারেন্দ্র কায়স্থকুলে মর্য্যাদা বান্ধা হয়। ইহারা সেই মর্য্যাদা বন্ধনকে পটী বা মেল শব্দে অভিহিত করেন। ভৃগুনন্দী বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন। তদীয় নিয়মে কন্যা বিক্রয় প্রথা ছিল না।" (বাঙ্গালা ১৩০৩ সাল মুদ্রিত "সম্বন্ধ নির্ণয়" দ্রষ্টব্য)।

নাপিতজাতির কেহ কখনও ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা কায়স্থের কোন অপকার করে নাই। চিরদিন দীনভাবে তাহারা স্ব স্ব কষ্টলব্ধ অর্থ-দ্বারা কায়ক্লেশে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তবুও কেন তাঁহারা আমাদিগকে গোলকধাঁধাঁয় ফেলাইয়া রাখিতে চান বুঝিতে পারি না। বাদপ্রতিবাদ করিবার ইচ্ছাও নাই, ক্ষমতাও নাই। তবে সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না।

"নরসুন্দর" বলিলেই আজকাল নাপিত জাতিকে বুঝায় ইহা বোধ হয়, শ্রীযুত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুত লালমোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যানিধি মহাশয়দ্বয় জ্ঞাত আছেন। * আর শরমা বা সরমা এরূপ কোন শব্দ লোকের নামের পূর্ব্বে ব্যবহার হয় না, একথাও বোধ হয় তাঁহারা জানেন। "নরসুন্দর শর্ম্মা"—বলিলেই ত সব গোল চুকিয়া যাইত। কিন্তু তাঁহারা সে পথে যান নাই। যে কায়স্থদিগের বিবরণ লিখিতে যাইয়া তাঁহারা এই নরসুন্দরের অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই মুদ্রিত বারেন্দ্র "ঢাকুরে" স্পষ্টাক্ষরে উহা মুদ্রিত আছে। সাধারণের সন্দেহ অপনোদনার্থ এইখানে উহা অবিকল উদ্ধৃত হইল।

"১৩ ঘর লয়ে মাত্র পটী বদ্ধ ছিল।
পরেতে অর্দ্ধেক ঘর শরমা হইল॥
শর্ম্মার বৃত্তান্ত শুন কষ্ট-সাধ্য মতে।
তাহাকে রাখিল নন্দী নিজের কার্য্যেতে॥
নরসুন্দর নাম তার শর্ম্মা পদ্ধতি।
হীন কর্ম্ম করে নিজে অতি ক্ষুদ্রমতি॥
নিত্য নিজে ক্ষেদ করে শর্ম্মা মহাশয়।

* এক্ষণে উভয় গ্রন্থকারই পরলোকগত। সমালোচনার জন্য এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ তাঁহাদিগকে যথাকালে দেওয়া হইয়াছিল। "সমালোচনা" দ্রষ্টব্য।

আমা তুল্য লোক যত বল্লাল সভায়॥
তা সবার মর্য্যাদা হইল বহুতর।
আমি সে রহিল মাত্র হইয়া নাচার॥
অদ্য হতে আমি আর হেথা না রহিব।
যদি মোরে দেন কুল তবে সে থাকিব॥
একথা শুনিয়া হাসি কহে নন্দী চাকী।
আজি হতে অর্দ্ধভাব আর অর্দ্ধ ফাঁকি॥
এই বাক্য শুনি পরে নাগ জটাধর।
উষ্মাতে খেদালে তারে দেশ দেশান্তর॥
সেই হতে সরমা গেলেন অন্য দেশে।
বরেন্দ্র পটীর মধ্যে কভু নাহি মিশে॥"

এক্ষণে বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, নরসুন্দর শর্ম্মা নামে নাপিতেরই এক জন পূর্ব্ব পুরুষ বঙ্গদেশের তাৎকালিক রাজা বল্লালসেনের সময়ে জীবিত ছিলেন। তৎকালে বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড়নগরে ছিল। উক্ত নরসুন্দর শর্ম্মার আত্মীয় এবং বংশধরেরাই এক্ষণে নরসুন্দর বলিয়া খ্যাত। এই উপাধিটী ভারতে এমন কি সমগ্র বঙ্গদেশের নাপিতের মধ্যেও দেখা যায় না বলিয়া, কোন কোষকার বা গ্রন্থকার উহাকে একটী জাতি-বাচক শব্দ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। বরেন্দ্রভুমের যে যে স্থানে বারেন্দ্র কায়স্থদিগের বসবাস ছিল, সেই সেই স্থানে এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের নাপিতেরাই উক্ত উপাধির অধিকারী। সমগ্র নাপিত সমাজে উহা প্রযোজ্য নহে, অর্থাৎ নরসুন্দর যে সম্প্রদায়ের "প্রামাণিক" ছিলেন, সেই সম্প্রদায়ের নাপিতদিগকেই নরসুন্দর বলে।

যাহা হউক, প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের ভাষাতেই প্রকাশ, বল্লালসেনের সমকালেও নাপিতের স্থান, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের নিম্নেই ছিল, সেই জন্যই নরসুন্দর কায়স্থ সমাজে প্রমোসনের প্রলোভন অনায়াসে সংবরণ করিয়াছিলেন। ইনি আলম্যান গোত্রীয় ছিলেন, এজন্য এক্ষণে যাঁহারা নরসুন্দর বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাও ঐ আলম্যান গোত্র উল্লেখ করিয়া বিবাহ, শ্রাদ্ধ পূজাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু নরসুন্দর শর্ম্মার এই শর্ম্মা উপাধিটী কেবল বর্ণ-গুরু ব্রাহ্মণেরই হইয়া থাকে। কারণ মনু বলিয়াছেন—

শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্॥
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্য সংযুতম॥ ২ অঃ ৩২ শ্লোক

—অর্থাৎ ব্রাহ্মণের নামের অন্তে শর্ম্মা উপপদ্, ক্ষত্রিয়ের নামে বর্ম্মাদি কোনও রক্ষা বাচক উপপদ, বৈশ্যের নামে ভূতি প্রভৃতি পুষ্টিবাচক উপপদ এবং শূদ্রের নামের শেষে দাসাদি কোনও প্রেষ্যবাচক উপপদ যুক্ত হইবে। পাঠক বোধহয় বুঝিতে পারিতেছেন যে, নরসুন্দর শর্ম্মা এক্ষনে কোন বর্ণ বা জাতি হইল। অধিকন্তু তাঁহার আবার ব্রাহ্মণোচিত গুণও ছিল, কেননা তিনি সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। হা ভগবন্, নাপিত কি তবে ব্রাহ্মণ জাতি! "কালস্য কুটিলা গতিঃ!" দেখা যাউক শাস্ত্র কি বলে।

এইখানে সংখ্যা বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া পরে শাস্ত্রালোচনা করা বিধেয় মনে করিতেছি।

চতুর্থ অধ্যায়

গভর্ণমেণ্ট সেন্সাস্ অনুসারে বঙ্গীয় নাপিতের সংখ্যা

জেলার নাম	খৃষ্টাব্দ ১৮৮১	খৃষ্টাব্দ ১৮৯১	খৃষ্টাব্দ ১৯০১
বর্দ্ধমান	১৭৮৯৭	১৫৭৫৬	১৬৭৩৬
বাঁকুড়া	১২২২২	১১৬৫৫	১২৭০০
বীরভূম	৮১৯৪	৯৭১২	৭৬২৪
মেদিনীপুর	৪৫৯৮৯	৪৩৫৫১	৪০৯৪২
হুগলী	১৩৯৮৭	১৪১৭৭	১২৭৪৬
হাওড়া	১১৪৫৪	১১৬০১	১৩২৯৮
২৪ পরগণা	২১৮০৩	২৪১৪১	২৫৯০৩
নদিয়া	১৯৪৪৯	১৬৫১৭	১৫৪৪৩
খুলনা	১৬২৮৯	১৭৪০৪	১৭৭৮৫
যশোহর	২৫০০২	২২৬৯৯	২০৯৫১
মুর্শিদাবাদ	১৩৪৫৯	১৩৭৮৯	১২৪৩৪
দিনাজপুর	১২২০৬	১১১৫৮	৯০৩২
রাজশাহি	৮৪৫৫	৬৯৭৩	৬৭৮২
রংপুর	১২৯৪০	৯০৮৩	৯৬৬৬
বগুড়া	৩৯১৭	৫২২১	৪৪৩৪
পাবনা	১১৬৮৬	১০৮৮৩	১০৬০৮
ত্রিপুরা	২২২০৬	২২৭৫৬	২৫০৩৭
নোয়াখালী	১২৬৭১	১৪৮৬৬	১৬২৫৬
চট্টগ্রাম	১৫৪০০	১৮১২৪	১৯৯৬৫

গভর্ণমেণ্ট সেন্সাস অনুসারে বঙ্গীয় নাপিতের সংখ্যা

জেলার নাম	খৃষ্টাব্দ ১৮৮১	খৃষ্টাব্দ ১৮৯১	খৃষ্টাব্দ ১৯০১
জলপাইগুড়ি	৪৮৩৪	৫৮৩৭	৩৩৬১
ঢাকা	২১৭১৫	২২৪৪৬	২৪৪৪৫
ময়মনসিংহ	৩২৭৬৮	৪৭৪০২	২৬৭৩৩
ফরিদপুর	১৮৮৯৭	২০২৬৯	২১৩৩৫
বাখরগঞ্জ	৩৩৪৮৬	৩৮৬৬৯	৩৫৫২৪
মানভূম	১৫১৭৪	১৭১৯৪	১৯২৫৯
মালদহ	৭৮৬৫	৬৯৫০	৬৮২১
শ্রীহট্ট	২১০৬৩	২৪০৩৫	২১২২৪
স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা } মোট—	৪৬১০২৭	৪৮২৮১৮	৪৫৭০৪৪

বিগত ১৮৭২ সালের লোক গণনায় উপরোক্ত ২৭ জেলার নাপিতের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪,২৭০১০।—

১৮৮১ সালে হইল ৪৬১০২৭ অর্থাৎ ৩৪০১৭ জন অধিক

১৮৯১ সালে হইল ৪৮২৮১৮ অর্থাৎ ২১৭৯১ জন অধিক

১৯০১ সালে হইল ৪৫৭০৪৪ অর্থাৎ ২৫৭৭৪ জন কম।

পূর্ব্ববর্ত্তী দুই গণনার অনুপাতে ১৯০১ সালে অন্ততঃপক্ষে (৩৪০১৭+২১৭৯১+২) ২৭৪০৪ জন অধিক হওয়া উচিত ছিল। তাহা না হইয়া ২৫৭৭৪ জন কমিয়া গেল, ইহাতে মোটের উপর ন্যূনাধিক ৫৩৪৭৮ জন সংখ্যায় কমিয়া গিয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মে লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবারই কথা। দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, মহামারী বা দুর্ভিক্ষাদি দৈব দুর্ঘটনা

সংঘটিত না হইলে এরূপ অসম্ভবরূপে মানব-সংখ্যা হ্রাসের কোন কারণ নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, নাপিত-সমাজের পক্ষে বিপরীত ফলই ফলিতেছে। কর্ণেল ইউ, এন, মুখার্জ্জী-কৃত "ধ্বংসোন্মুখ জাতি"তে হিন্দু-সংখ্যা হ্রাসের যে সকল কারণ দেখান হইয়াছে, আমার বিশ্বাস তদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী শোচনীয় কারণে নাপিত-সমাজ ধ্বংসের দিকে যাইতেছে। নাপিত-সমাজে আমদানী মোটেই নাই, তবে রপ্তানি বেশ আছে, বড় দুঃখেই একথা প্রকাশ করিতে হইল।

আমাদের সমাজে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও পদস্থ, স্ব-জাতির প্রতি সহানুভূতি ত দূরের কথা, তাঁহারা সুবিধা পাইলে জাত্যন্তর গ্রহণ করিতেও বিমুখ নহেন। অন্যান্য জাতির মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত ও পদস্থ হইতেছেন, তাঁহারা স্ব স্ব সমাজের নিম্নস্তরের লোকদিগকে যথাসাধ্য শিক্ষিত ও উন্নত করিয়া স্ব স্ব সমাজ পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু নাপিত সমাজে ঠিক তার বিপরীত ভাব চলিতেছে। আর কি কুক্ষণেই চৈতন্যদেব মধু-নাপিতের (?) সৃষ্টি করিলেন। এবার আর বেশী কিছু বলিব না। বর্ত্তমান ১৯১১ সালের আদমসুমারী রিপোর্ট বাহির হইলেই প্রকৃত ব্যাপার বুঝা যাইবে, ইত্যবসরে স্বজাতি মহাশয়দিগেরও মতামত জানিতে পারিব আশা করি। প্রত্যেক জেলার সমাজপতি মহাশয়েরা একটু চেষ্টা করিয়া উপযুক্ত গণনার সত্যাসত্য অনায়াসেই নির্ণয় করিতে পারিবেন, যদি উক্ত গণনা সত্য হয়, আর সমাজ যে ভাবে এক্ষণে চলিতেছে এই ভাবেই চলিতে থাকে—কোন প্রতীকার না করা হয়—তবে বোধ হয় পরবর্ত্তী ১০০ শত বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশের নাপিতকুল নির্ম্মূল হইবে, অথবা তাহাদিগকে আর নিজমূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ব্যাপারটী সকলেরই বিশেষ মনোযোগের সহিত ভাবিয়া দেখা উচিত।

আমাদের অনুমান যে একেবারে অসঙ্গত নহে, তাহা গভর্ণমেণ্টের রিপোর্টেই প্রমাণ করিতেছে।

নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইল, ইহাতে ১৯০১ সালের বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী নাপিতের সংখ্যা এক সঙ্গে ধরা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।—

Census Report 1901
VOL VI, Page 460, percentage of variation increase (+) or decrease (—). সংখ্যার আধিক্য + এবং হ্রাস(—)চিহ্নদ্বারা প্রকাশ।

1901	1891	1881	1872
841,826.	861,754	941,052	732,264

1891—1901	1881—91	1872—81
—2·31	—8·42	+28·51

Percentage of the net variation increase or decrease +14·96.

উপর্য্যুক্ত হিসাবে প্রমাণ করিতেছে যে ১৮৯১ সালের গণনাতে ৮·৪২ অর্থাৎ প্রায় ৮½ জন শতকরা কমিয়া গিয়াছিল। আর ১৯০১ সালেও শতকরা ২·৩১ অর্থাৎ প্রায় ২⅓জন কমিয়া গিয়াছিল।

খাস বাঙ্গালা দেশে অর্থাৎ মানভূম শ্রীহট্ট প্রভৃতি কয়েকটী জেলা বাদে নাপিতের স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে দেওয়া হইল।

(Numerical Strength of Napits 1901 in civil condition by age for Selected castes. Bengal proper)

অবিবাহিত	বিবাহিত	মৃতদার ও বিধবা
পুরুষ ৮৯৪৬৮	পুঃ ৮০৪৮০	পুঃ ১০২৮২
স্ত্রী ৪৯৯৭০	স্ত্রী ৮০৮৪২	স্ত্রী ৪৯৮৭২
১২৯৪৩৮	১৬১৩২২	৬০১৫৪

মোট স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা ৩৬০৯১৪ তন্মধ্যে পুরুষ ১৮০২৩০ আর স্ত্রী ১৮০৬৮৪।

বয়সের অনুপাতে মৃতদার পুরুষ ও বিধবা স্ত্রীলোকের তালিকা দেখুন।

বয়স	০—৫,	৫—১২,	১২—১৫,	১৫—২০,	২০—৪০	৪০—তদূর্দ্ধ
পুরুষ	১	২৯	৩৩	১৪৫	২৩৮৯	৭৬৮৫
স্ত্রী	২৫	৩৩৬	৬২৪	১৯১৪	১৬২২৬	৩০৭৩৭

উপর্য্যুক্ত বিবরণে শিখিবার ও বুঝিবার অনেক বিষয় আছে; ৫ বৎসরের ছেলেরও বিবাহ হইয়া থাকে, আবার ৫ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হইয়া যে কয়েকটী মেয়ে বিধবা হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা ১৯০১ সালে ২৫ হইয়াছিল; আর মৃতদার পুরুষাপেক্ষা বিধবার সংখ্যা প্রায় ৫ গুণ অধিক। অপিচ ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে বিধবার সংখ্যা সর্ব্বসমেত ৯৮৫ অর্থাৎ প্রায় ১০০০ হাজার। কি শোচনীয় ব্যাপার!

উল্লিখিত সংখ্যার মধ্যে শতকরা প্রায় ১০ জন লিখিতে পড়িতে জানে, তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত, পদস্থ লোকের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল, বাহুল্যবোধে ইহার বঙ্গানুবাদ বা মন্তব্য প্রকাশ করিলাম না। সরকারি রিপোর্টের কপিই অবিকল উদ্ধৃত হইল। মোটের উপর আমার বিশ্বাস, আন্দাজ পাঁচ হাজার লোক অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত, উন্নত ও অবস্থাপন্ন আছেন। তন্মধ্যে (Gazetted officer) অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদেও এক্ষণে ২০।৩০ জন আছেন। (১৯২১ সালের সেন্সাস্ দ্রষ্টব্য)

	Burdwan Division.	Calcutta.	Presidency Division.	Rajshshi Division.	Dcca, Division.	Chittagong Diision.	Patna Division	Bhagalpur Division	Orissa Division	Chota Nag-pur Division	Feudatory Stsates.	TOTAL.
Clerks, Inspectors &c	30	55	11	1	8	9		2				116
Clerical Service ...		5										5
Rent receivers ...	54	27	687	469	382	108		20		110	9	1866
Agents etc. of landed esfates ...	6			4	2							12
Officers of Postal & Telegraphic Dept.	7	3										10
Professors, Teachers etc.	40	10	32	20	80	46		12		21	1	253
Lawyears & Law agents ...	1		8	1	25			2				37
Medical Practitioners ...	190	29	102	46	1894	459		12	1	23	1	2757

পঞ্চম অধ্যায়

হিন্দুশাস্ত্র।

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

শাস্ত্র বলিলেই আমরা সাধারণতঃ অনুস্বর-বিসর্গ-বিজড়িত সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুস্তক বা শ্লোকাদি—যাহার অর্থ সহজে বোধগম্য নহে অথচ শ্রুতিমধুর—তাহাই বুঝি এবং উহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে অসমর্থ-বিধায় যিনি যেরূপ বুঝাইয়া দেন, আমরা সাগ্রহে, সরল-চিত্তে তাহাই গ্রহণ করি, কারণ সংস্কৃত ভাষাটী দেব ভাষা আর এই ভাষাতে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ। শূদ্র-নাম-ধারী যে সকল "কৃষ্ণের জীব" এই ভারতে বর্ত্তমান ছিল এবং এখনও আছে, বহুকাল হইতে তাহারা সংস্কৃত শিক্ষা বা আলোচনা করিবার সুযোগ না পাওয়ায়, সংস্কৃত সাহিত্যটী ব্রাহ্মণদিগেরই একচেটিয়া হইয়া গিয়াছিল, যেহেতু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণদ্বয়ও শূদ্রভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, ইহা পূর্ব্বেও সপ্রমাণিত হইয়াছে। পুরুষানুক্রমে এই ভাষার চর্চ্চা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকায়, কালে অনেক ব্রাহ্মণ বিনা বিদ্যায় "বিদ্যাবাগীশ" হইতে আরম্ভ করিলেন। ফলে "বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ"—(বিদ্যাস্থানেভ্যঃ এবচ) বলিলেও ব্রাহ্মণের শূন্যগর্ভ বাক্য বেদবাক্য এবং গর্হিত আদেশও শিরোধার্য্য বলিয়া গৃহীত হইতে লাগিল। এই অন্ধ বিশ্বাসই হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার অন্যতম কারণ। মহাযশঃ-তপ-সম্পন্ন-ভারত-গৌরব ঋষিগণের বংশধরগণ যদি স্বার্থপর, স্বকর্ম্মত্যাগী ও ব্যভিচার-পরায়ণ না হইতেন তাহা হইলে

হয় ত আজ ভারতের ইতিহাস ভিন্নরূপ আকার ধারণ করিত; জাতিভেদ লইয়া আজ ভারতময় যে আন্দোলন উঠিয়াছে হয়ত তাহাও উঠিত না; সুতরাং জাতি-বিদ্বেষও জাতিভেদের সহচর হইত না। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসই হউক আর স্থূল বিশ্বাসই হউক, হিন্দুশাস্ত্র মতে "বিশ্বাসই" মুক্তির প্রধান উপায়। কথায় আছে "বিশ্বাসে পাইবে বস্তু, তর্কে বহুদূর"। ব্রাহ্মণের সে গুণ সে ব্রহ্মতেজ না থাকিলেও পাপী-তাপীর-বিচারক, পরম ন্যায়বান, সর্ব্বান্তর্যামিন্ ভগবান্ যথাকালে ন্যায়দণ্ড পরিচালিত করিয়া অলক্ষিত ভাবে আবার সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। তাই নাকি ভারতের লুপ্তপ্রায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আবার পুনর্জীবন লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে। তাই আজ বৈদ্য, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, গন্ধবণিক, সুবর্ণ-বণিকাদি হিন্দু-সম্প্রদায় বহুকালের অজ্ঞতা, অবসাদ ও কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন আপন সমাজ বন্ধনে ও তাহার উন্নতি সাধনে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। "জগৎ পরিবর্ত্তনশীল"—তাই যুগ যুগান্তরের ভ্রমান্ধকার আপনা হইতেই অপসারিত হইতেছে। পূর্ব্বে আমরা যাহা-দিগকে বলিতে শুনিয়াছি "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ," "উহাকে বিদ্যা শিক্ষা দিও না", "উহার বেদে অধিকার নাই"—ইত্যাদি, তাঁহারাই এক্ষণে দেখাইয়া দিতেছেন "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ", "জ্ঞানাৎ পরতর নাস্তি", সর্ব্বংব্রহ্মময়ং জগৎ"—ইত্যাদি। বিশেষতঃ "বিদ্যয়া সমং ধনং নাস্তি"—এই মহৎ বাক্যের মূল্য আজকাল সকলেই প্রায় বুঝিয়াছেন। তাই সর্ব্বত্র শিক্ষার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। যে বিদ্যাবলে মানবের জ্ঞান মার্জ্জিত ও মনের অন্ধকার দূরীভূত হয়, যে বিদ্যাবলে মানুষ কি স্বদেশে কি বিদেশে সমাদৃত হয়, যে বিদ্যাবলে মানব প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য হয়, সেই-বিদ্যাধনে যাহারা বঞ্চিত তাহারা কি আর মানুষ! নরাকারে পশু বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বিধিনির্দ্দিষ্ট মানবের সর্ব্বপ্রকার

উপাদানে সৃষ্ট ও পুষ্ট হইলেও তাহারা চক্ষু থাকিতে অন্ধের ন্যায় জীবন্মৃত ভাবে কাল কাটাইয়া থাকে। অন্ধকে যে পথ দেখাইয়া দেওয়া যায়, সে সেই পথ ধরিয়াই চলিতে থাকে। খানা, ডোবা, কূপাদিযুক্ত রাস্তা দেখাইয়া দিলেও সে সেই রাস্তারই অনুসরণ করে। ফলতঃ পথ-প্রদর্শকের উদ্দেশ্য ভাল হইলেই মঙ্গল, নচেৎ "পারে বাঁচুক, না হয় খোঁড়া হয়ে থাকুক"—এই শ্লেষ বাক্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের অনেকগুলি জাতিরই অধঃপতন এইরূপে সংঘটিত হইয়াছিল। পাঠক, আসল কথা ছাড়িয়া আমরা অনেকদূর আসিয়া পাড়িয়াছি। হিন্দুশাস্ত্র বলিলেই আর্য্য-ধর্ম্মানুশাসন গ্রন্থাদিকেই বুঝায়।—শাস্ত্রম-নিদেশঃ-গ্রন্থঃ—ইত্যমরঃ।

বেদ, সংহিতা, পুরাণ উপপুরাণাদিই হিন্দুর শাস্ত্র। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ—বেদ। ঋক্, যজু, সাম, ও অথর্ব্ব ভেদে বেদ চারিপ্রকার। বেদাঙ্গ, কল্পসূত্র ও সংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র এই বেদ অবলম্বনেই লিখিত। বর্ত্তমান কালে মনু প্রভৃতি মহর্ষি-প্রণীত সংহিতাগুলির বিধানানুসারেই হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইতেছে। মূলতঃ এই সংহিতাগুলির সংখ্যা বিংশতি খানি মাত্র, যথা—

মন্বত্রি বিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্ব সংবর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতি ॥
পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা-দক্ষ-গোতমো।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজকাঃ।

অর্থ—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ এবং বশিষ্ঠ ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল মহর্ষির নামানুসারেই তাঁহাদের প্রণীত স্মৃতি বা সংহিতাগুলি

বিখ্যাত হইয়াছে। যথা—মনু-সংহিতা, অত্রি-সংহিতা, বশিষ্ঠ-সংহিতা প্রভৃতি। এতন্মধ্যে মহর্ষি মনু, আদি বিধানকর্ত্তা ও দ্বিতীয় স্রষ্টা বলিয়া বিখ্যাত। কোন স্থলে বিরোধ উপস্থিত হইলে, মনুর মতই সর্ব্বতোগ্রাহ্য ও সর্ব্বজনমান্য হইয়া থাকে। স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতি বলিয়াছেন—

বেদার্থো উপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনুঃস্মৃতৌ।
মন্বর্থ বিপরীতা যা স্মৃতি সা ন প্রশস্যতে।

অস্যার্থ—মনুর স্মৃতিই প্রধান, কারণ ইহাতেই বেদের অর্থ উপনিবদ্ধ হইয়াছে, মনুর সহিত যাহার অর্থ বিরোধ হয়, সে স্মৃতি প্রশস্ত নহে।

প্রকৃত প্রস্তাবে মনুর বিধান-বলেই আর্য্যগণ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, এবং অদ্যাবধিও মনুর বিধান-বলেই নাকি বিদেশীয় ও বিজাতীয় বিবিধরূপ অত্যাচার সত্ত্বেও হিন্দু-ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হইয়া আসিতেছে। হিন্দুত্বের দাবী করিতে হইলে এই সায়ম্ভুব মনুর বিধান মানিয়া চলিতেই হইবে। এই মনু-সংহিতাই হিন্দু-সমাজের Penal Code, Criminal Procedure Act এবং Evidence Act স্বরূপ। সুতরাং এই পুস্তকে বর্ণভেদ বা বর্ণাশ্রম এবং বর্ণসঙ্কর বিষয়ে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে প্রধান প্রধান কতকগুলি উদ্ধৃত করিয়া এইখানে পাঠকদিগকে উপহার দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি বর্ণের জন্য তিনি যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা এই,—

অধ্যাপন মধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥ ৮৮।
প্রজানাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়ন মেবচ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥ ৮৯।

পশুনাং রক্ষনং দান মিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বনিকৃপথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ॥ ৯০।
এক মেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষা মেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনুস্যয়া॥ ৯১।

(মনুসংহিতা—প্রথম অধ্যায়)

অর্থ—অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম তিনি ব্রাহ্মণদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং ভোগাসক্তির পরিবর্জ্জন এই কয়েকটী কর্ম্ম তিনি ক্ষত্রিয় গণের জন্য সংক্ষেপতঃ নিরূপিত করিলেন। পশুরক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, ধন-বৃদ্ধির জন্য অর্থ-প্রয়োগ এবং কৃষিকর্ম্ম তিনি বৈশ্যদিগের জন্য ব্যবস্থা করিলেন, এবং উপর্য্যুক্ত তিন বর্ণের অসূয়াশূন্য হইয়া সেবা করা শূদ্রগণের একমাত্র কর্ত্তব্য—ইহা প্রভু নির্দ্দেশ করিলেন।

তৎপরে বিবিধ জাতির উৎপত্তি বিষয়ে বলিতেছেন।—

অধীয়ীরংস্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রূয়াদ্ ব্রাহ্মণস্ত্বেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়॥১
সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণো বিদ্যাদ্বৃত্ত্যুপায়ান্ যথাবিধি।
প্রব্রূয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ঞ্চৈব তথা ভবেৎ॥২
বৈশেষ্যাৎ প্রকৃতিশ্রৈষ্ঠ্যান্নিয়মস্য চ ধারণাৎ।
সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥৩
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥৪
সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥৫

স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানহুর্মাতৃ-দোষবিগর্হিতান্ ॥৬
অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমংবিধিম্ ৭
ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥ ৮
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপূর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে॥ ৯
বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিনষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥ ১০
ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সুতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ॥ ১১
শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ ১২
একান্তরে ত্বানুলোম্যাদম্বষ্ঠোগ্রৌ যথা স্মৃতৌ।
ক্ষর্ত্তৃবৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যেঽপি জন্মনি॥ ১৩
পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মানাম্।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে॥ ১৪
ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতো নাম জায়তে।
আভীরোঽম্বষ্ঠ কন্যায়াময়োগব্যাস্তু ধিগ্বণঃ॥ ১৫
অয়োগবশ্চ ক্ষত্তা চ চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ॥ ১৬
বৈশ্যান্মাগধ বৈদেহৌ ক্ষত্রিয়াৎ সূত এব তু।
প্রতীপমেতে জায়ন্তেঽপরেঽপ্যপসদাস্ত্রয়ঃ॥ ১৭

জাতো নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জ্যাত্যা ভবতি পুক্কসং।
শূদ্রাজ্জাতো নিষাদ্যান্তু স বৈ কুক্কুটকঃ স্মৃতঃ॥ ১৮
ক্ষত্তুর্জাতস্তথোগ্রায়াং শ্বপাক ইতি কীর্ত্ত্যতে।
বৈদেহকেন ত্বম্বষ্ঠ্যামুৎপন্নো বেণ উচ্যতে॥ ১৯
দ্বিজাতয়ঃ সবার্ণসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্‌সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যাইতিবিনির্দিশেৎ॥ ২০
ব্রাত্যাৎ তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ॥ ২১
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্‌ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥ ২২
বৈশ্যাৎ তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্র সাত্বত এব চ॥ ২৩
ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ!
স্বকর্ম্মাণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ ২৪
সঙ্কীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥ ২৫
সূতো বৈদেহকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ।
মাগধঃ ক্ষর্ত্তৃজাতিশ্চ তথায়োগব এব চ॥ ২৬
এতে ষট্ সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
মাতৃজাত্যাং প্রসূয়ন্তে প্রবরাসু চ যোনিষু॥ ২৭
যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
আনন্তর্য্যাৎ স্বযোনাস্তু তথা বাহ্যেষ্বপি ক্রমাৎ॥ ২৮
তে চাপি বাহ্যান্ সুবহুংস্ততোঽপ্যধিকদূষিতান্।
পরস্পরস্য দারেষু জনয়ন্তি বিগর্হিতান্॥ ২৯

যথৈব শূদ্রো ব্রাহ্মণ্যাং বাহ্যং জন্তুং প্রসূয়তে।
তথা বাহ্যতরং বাহ্যশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যে প্রসূয়তে ॥ ৩০
প্রতিকূলং বর্ত্তমানা বাহ্যা বাহ্যতরান্ পুনঃ।
হীনাহীনান্ প্রসূয়ন্তে বর্ণান্ পঞ্চদশৈব তু ॥ ৩১
প্রসাধনোপচারজ্ঞমদাসং দাসজীবনম্ ।
সৈরিন্ধ্রং বাগুরাবৃত্তিং সূতে দস্যুরয়োগবে ॥ ৩২
মৈত্রেয়কন্তু বৈদেহো মাধূকং সম্প্রসূয়তে।
নৄন্প্রশংসত্যজস্রং যো ঘণ্টাতাড়োঽরুণোদয়ে ॥ ৩৩
নিষাদো মার্গবং সূতে দাসং নৌকর্ম্মজীবিনম্ ।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ ॥ ৩৪
মৃতবস্ত্রভৃৎসু নারীষু গর্হিতান্নাশনাসু চ।
ভবন্ত্যায়োগবীষ্বেতে জাতিহীনাঃ পৃথক্ ত্রয়ঃ ॥ ৩৫
কারাবরো নিষাদাৎ তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে।
বৈদেহিকাদন্ধ্রমেদৌ বহির্গ্রামপ্রতিশ্রয়ৌ ॥ ৩৬
চাণ্ডালাৎ পাণ্ডুসোপাকস্তক্সারব্যবহারবান্ ।
অহিণ্ডিকো নিষাদেন বৈদেহ্যামেব জায়তে ॥ ৩৭
চণ্ডালেন তু সোপাকো মূলব্যসনবৃত্তিমান।
পুক্কস্যাং জায়তে পাপঃ সদা সজ্জনগর্হিতঃ ॥ ৩৮
নিষাদস্ত্রী তু চাণ্ডালাৎ পুত্রমন্ত্যাবসায়িনম্ ।
শ্মশানগোচরং সূতে বাহ্যানামপি গর্হিতম্ ॥ ৩৯
সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৪০
সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪১

তপোবীজ প্রভাবৈস্তু যে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেম্বিহ জন্মতঃ॥ ৪২
শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ ৪৩ ৪৩
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥ ৪৪
মুখবাহূরূপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥ ৪৫
যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈবর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥ ৪৬
সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানং বণিকপথঃ॥ ৪৭
মৎস্যঘাতো নিষাদানাং ত্বষ্টিস্ত্বায়োগবস্য চ।
মেদান্ধ্রচুঞ্চুমদ্গূনামারণ্যপশুহিংসনম্॥ ৪৮
ক্ষত্তৃগ্রপুক্কসানান্তু বিলৌকবধবন্ধম্।
ধিগ্বণানাং চর্ম্মকার্য্যং বেণানাং ভাণ্ডবাদনম্॥ ৪৯
চৈত্যদ্রুমশ্মশানেষু শৈলেষু পবনেষু চ।
বসেয়ূরেতে বিজ্ঞানা বর্ত্তয়ন্তঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥ ৫০

মনু-সংহিতা ১০ম অধ্যায়

পার্শ্বস্থ সংখ্যানুসারে উল্লিখিত শ্লোকগুলির অর্থ, যথা—

১। দ্বিজন্মা বর্ণত্রয় সতত স্বধর্ম্মে-নিরত থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন; কিন্তু বেদাধ্যাপন কেবল ব্রাহ্মণেরই কর্ম্ম;—কদাপি বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ের নহে।

২। ব্রাহ্মণ যথাশাস্ত্র সর্ব্ববর্ণকে ঐ উপায় সকল উপদেশ দিবেন এবং স্বয়ং তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন।

৩। বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, ব্যাখ্যানবিৎ, উপনয়ন-সংস্কারে বিশিষ্ট ব্রহ্মচর্য্যরত, ও ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গজ বলিয়া, ব্রাহ্মণ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৪। উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত বলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য দ্বিজোপাধি পাইয়াছেন। উপনয়ন সংস্কারবিহীন চতুর্থ-বর্ণ শূদ্র দ্বিজ নহে। এই ৪ বর্ণ ভিন্ন আর পঞ্চম বর্ণ নাই।

৫। বর্ণচতুষ্টয়ের পরিণীত সবর্ণগর্ভসম্ভূত—সন্তানই তত্তৎনামে অভিহিত হয়। এতদ্ভিন্ন অসবর্ণপত্নীতে সমুৎপন্ন সন্তান জাত্যন্তর হইয়া থাকে।

৬। দ্বিজবর্ণত্রয় কর্ত্তৃক অনুলোমে অনন্তর বর্ণজা পত্নীর গর্ভসম্ভূত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে, ক্ষত্রিয়দ্বারা বৈশ্যাতে এবং বৈশ্য দ্বারা শূদ্রাতে জাত সন্তানেরা হীনগর্ভ হেতু ঠিক পিতার সদৃশ হইবে না।

৭। ভর্ত্তা হইতে অনুলোমক্রমে অনন্তর-বর্ণজা পত্নীর গর্ভসম্ভূত তনয়ের নিয়ম সকল বর্ণিত হইল। অতঃপর ভর্ত্তা হইতে এক বা দুই বর্ণান্তরজা পত্নী-তনয়ের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি।

৮। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিণাতা বৈশ্যার গর্ভসমুৎপাদিত 'অম্বষ্ঠ' এবং শূদ্রার গর্ভসম্ভূত সন্তানেরা 'নিষাদ বা পারশব আখ্যা পায়।

৯। ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক শূদ্রাগর্ভসম্ভূত সন্তান "উগ্র" এবং পিতা মাতার স্বভাবানুসারে নিজে ক্রূরচেষ্টা ও ক্রূরকর্ম্মা হইয়া থাকে।

১০। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াদি বনত্রয়গর্ভজাত; ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাদি-বর্ণদ্বয় গর্ভজাত এবং বৈশ্যের শূদ্রা গর্ভজাত তনয়েরা অপকৃষ্ট।

১১। ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণী গর্ভসম্ভূত তনয় 'সূত, বৈশ্য কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়া-গর্ভসম্ভূত সন্তান 'মাগধ' এবং ব্রাহ্মণীগর্ভসম্ভূত সন্তান 'বৈদেহ'।

১২। শূদ্র কর্ত্তৃক বৈশ্যাগর্ভজ সন্তান 'আয়োগব'—ক্ষত্রিয়া-সম্ভূত

সন্তান 'ক্ষত্তা' এবং ব্রাহ্মণীগর্ভসম্ভূত পুত্রই 'চণ্ডাল' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল সন্তান বর্ণ-সঙ্কর বলিয়া পরিগণিত।

১৩। অনুলোমক্রমে একান্তরবর্ণজ 'অম্বষ্ঠ' এবং "উগ্র" জাতি এবং প্রতিলোমে 'ক্ষত্তা' ও 'বৈদেহ' স্পর্শযোগ্য।

১৪। দ্বিজন্মাদিগের অনুলোমক্রমে অনন্তরবর্ণজ, ও একান্তরবর্ণজ তনয়েরা মাতৃদোষ দুষ্ট বলিয়া মাতৃ জাতির সংস্কার যোগ্য হইবে।

১৫। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উগ্রকন্যা গর্ভসম্ভূত তনয় 'আবৃত', অম্বষ্ঠ কন্যা গর্ভজ তনয় 'আভীর' এবং আয়োগব-কন্যাগর্ভজ সন্তান 'ধিগ্বণ'।

১৬। শূদ্র হইতে প্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন আয়োগব, ক্ষত্তা এবং চণ্ডালের পিতৃকার্য্যে অধিকার নাই, ইহারা নরাধম।

১৭। বৈশ্য হইতে প্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন মাগধ ও বৈদেহ এবং ক্ষত্রিয় হইতে প্রতিলোমক্রমে সঞ্জাত সূতেরও পিতৃকার্য্যে অধিকার নাই।

১৮। নিষাদ হইতে শূদ্রকন্যাতে সম্ভূত 'পুক্কশ' এবং শূদ্রের নিষাদ-কন্যাগর্ভজ তনয় 'কুক্কুটক'।

১৯। ক্ষত্তা হইতে উগ্রকন্যা সম্ভূত সন্তান 'শ্বপাক' এবং বৈদেহকর্ত্তৃক অম্বষ্ঠকন্যা সম্ভূত তনয় 'বেণ'সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

২০। দ্বিজাতি কর্ত্তৃক পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীগর্ভ সম্ভূত-তনয়ের উপনয়ন সংস্কার না হইলে 'ব্রাত্য' বলে, ইহাদের পিতৃকার্য্যে অধিকার নাই।

২১। 'ব্রাত্য' ব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রীগর্ভজ তনয় 'ভূর্জ্জকণ্টক'। দেশ বিশেষে ইহাদিগকে 'আবন্ত্য', 'বাটধান' 'পুষ্পধ' এবং শৈখ' বলে।

২২। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সবর্ণাগর্ভজ তনয়কে দেশবিশেষে 'ঝল্ল', নিচ্ছিবি, 'মল্ল', 'নট' 'করণ' 'খস' এবং 'দ্রবিড়' বলে;

২৩। ব্রাত্য বৈশ্যের সবর্ণা-সম্ভূত তনয় 'সুধন্বা' 'আচার্য্য' 'কারূষ' বিজন্মা, মৈত্র এবং 'স্বাত্বত।

২৪। অন্যের স্ত্রী গমন, স্বগোত্র-বিবাহ-সংঘটন অগম্যা-গমন এবং স্বকর্ম্ম-ত্যাগ এই তিন কারণে বর্ণসঙ্কর জন্মে।

২৫। অন্যান্য ব্যাসক্তিবশতঃ অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে যে সমস্ত জাতি জন্মগ্রহণ করে, তাহা সমগ্রভাবে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

২৬। নরাধম চণ্ডাল, সূত, বৈদেহ, আয়োগব, মাগধ এবং ক্ষত্তা প্রতিলোমজ সঙ্করবর্ণ।

২৭। এই ৬ সন্তান মাতৃজাতীয়া এবং উৎকৃষ্ট জাতীয়া কন্যাতেও সদৃশবৎ তনয় উৎপন্ন করে।

২৮। ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যা পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণ কর্তৃক সমুৎপাদিত সন্তান এবং ব্রাহ্মণের সবর্ণাসম্ভূত সন্তান দ্বিজ বলিয়া যেমন শূদ্র অপেক্ষা মান্য, তদ্রূপ বৈশ্যের ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান ও ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণী গর্ভজাত সন্তান,—শূদ্রের প্রতিলোমজ সন্তান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

২৯। আয়োগবাদি ষড়্‌বিধ সঙ্করজাতিরা পরস্পর অনুলোম বা প্রতিলোমক্রমে বা পরস্পর স্বজাতীয়া পত্নীগর্ভে যে সন্তান জন্মায়, তাহারা তৎ-পিতা-মাতা অপেক্ষা হীন, নিন্দার্হ ও সৎক্রিয়া-বহির্ভূত।

৩০। শূদ্রের ব্রাহ্মণী-গর্ভজাত চাণ্ডালাদি সন্তানেরা যেরূপ অপকৃষ্ট, চণ্ডালাদি ষড়্‌বিধ সঙ্করবর্ণের ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণে সমুৎপাদিত সন্তানেরা তাহাদের অপেক্ষা সহস্রগুণে হীন ও নিন্দার্হ।

৩১। আয়োগবাদি ত্রিবিধ হীন জাতীয়েরা পরস্পর মিশ্রভাবে ৪ বর্ণের স্ত্রীতে এবং স্ববর্ণা পত্নীর গর্ভে যে সন্তান উৎপাদন করে, তাহাদের সংখ্যা পঞ্চদশ ; তাহারা জনকাপেক্ষা হীন!

৩২। দস্যুজাতি কর্তৃক আয়োগবস্ত্রীগর্ভে জাতসন্তান 'সৈরিন্ধ্রী'। কেশরচনা, দাসবৎ-কার্য্য এবং মৃগাদিবধ ইহাদের জীবিকা।

৩৩। বৈদেহজাতি কর্তৃক প্রকৃত আয়োগব স্ত্রীগর্ভে উৎপন্ন সন্তান

"মৈত্রেয়" ইহারা মধুরভাষী এবং প্রাতঃকালে ঘণ্টা বাজাইয়া নৃপতি প্রভৃতির স্তুতিপাঠই ইহাদের কার্য্য।

৩৪। নিষাদ কর্তৃক আয়োগবস্ত্রীগর্ভে সমুৎপাদিত সন্তানের নাম 'মার্গব' বা 'দাস'; ইহারা নৌকর্ম্মোপজীবী; আর্য্যাবর্তনিবাসীরা ইহাদিগকে কৈবর্ত্ত বলিয়া থাকে।

৩৫। উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণশীলা এবং মৃতবস্ত্রপরিধানা আয়োগবী-স্ত্রীগর্ভে সৈরিন্ধ্র, মৈত্রেয়, মার্গব জনকভেদে বিভিন্ন জাতি জন্মগ্রহণ করে।

৩৬। নিষাদের বৈদেহীগর্ভসম্ভূত সন্তানের নাম "কারাবর"। ইহারা চর্ম্মচ্ছেদকারী; এবং বৈদেহজাতির কারাবর স্ত্রী হইতে "অন্ধ্র" ও নিষাদ-স্ত্রী হইতে "মেদ" জাতি জন্মগ্রহণ করে; ইহারা গ্রামের বহির্দ্দেশে বাস করে।

৩৭। চাণ্ডাল হইতে বৈদেহী-স্ত্রীতে বেণুব্যবহারজীবী "পাণ্ডুপাক" জাতির জন্ম, এবং নিষাদ হইতে বৈদেহীতে 'আহিণ্ডিকের' জন্ম,। চাণ্ডালের পুকসী স্ত্রীগর্ভে যে পাপিষ্ঠ জাতি জন্মে, তাহার নাম "সোপাক" নিতান্ত পাপজনক জল্লাদের কার্য্য ইহাদের জীবিকা।

৩৮। চাণ্ডালের নিষাদীগর্ভসম্ভুত যে সন্তান, তাহার নাম "অন্ত্যাবসায়ী", শ্মশানকার্য্য ইহাদের উপজীবিকা, ইহারা অতি ঘৃণার্হ। ৩৯।

সুবিদিত যাবতীয় সঙ্করজাতির জনক জননীর নাম নির্দ্দেশ করিলাম; ইহারা প্রচ্ছন্ন প্রকাশমান যে কোন অবস্থায়, কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞেয়। ৪০।

ব্রাহ্মণাদি দ্বিজত্রয়ের সজাতিপত্নীসম্ভুত সন্তানত্রয় এবং অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণ ঔরসজাত তনয়দ্বয় ও ক্ষত্রিয়-ঔরসজাত বৈশ্যার সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী এবং দ্বিজসংস্কারযোগ্য; কিন্তু ইহাদের প্রতিলোমজ তনয়ের কোন সংস্কারই নাই। ৪১।

উক্ত ষড়্‌বিধ জাতি যুগে যুগে তপস্যা-প্রভাবে ও বীজোৎকর্ষে মনুষ্য

মধ্যে যেমন জাত্যুৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তদ্বৈপরীত্যে তাহাদের জাত্যাপকর্ষও ঘটিয়া থাকে। ৪২।

বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি-সংস্কারাভাবে ক্রমশঃ শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে। ৪৩।

'পৌণ্ড্রক' 'ঔড্র,' 'দ্রাবিড়', কাম্বোজ,' 'শক,' 'পারদ,' 'পহ্লব,' 'চীন', 'কিরাত', 'দরদ,' এবং 'খশ' দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা কর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। ৪৪।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাদি করিলে যাহারা বাহ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়—সাধুভাষীই হউক, আর ম্লেচ্ছাভাষীই হউক উহারা দস্যু। ৪৫।

দ্বিজাতি হইতে অনুলোমক্রমে সমুৎপন্ন সন্তানদিগের নাম 'অপসদ,' এবং প্রতিলোমসন্তানদিগের নাম 'অপধ্বংসজ'; দ্বিজবিগর্হিত কর্ম্মই ইহাদের জীবিকা। ৪৬।

সূতজাতির বৃত্তি—অশ্বসারথ্য; অম্বষ্ঠের বৃত্তি—চিকিৎসা; বৈদেহিক-জাতির বৃত্তি—অন্তঃপুর-রক্ষা এবং মাগধ-জাতির বৃত্তি—বাণিজ্য। ৪৭।

নিষাদজাতির বৃত্তি,—মৎস্যমারণ; আয়োগবের কাষ্ঠভঞ্জন এবং মেদ, চঞ্চু, অন্ধ্র এবং মদ্গু জাতিচতুষ্টয় পশুহিংসাজীবি। ৪৮।

ক্ষত্র, উগ্র এবং পুক্কস জাতিত্রয়ের বৃত্তি,—বিলবাসী গোধাদির বধ বা বন্ধন; ধিগ্বণ-জাতির চর্ম্মকার্য্য এবং বেণজাতির মৃদঙ্গবাদন। ৪৯।

ঐ সকল জাতি স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বনে জীবন-ধারণ করত চৈত্যে, বৃক্ষ-মূলে, পর্ব্বতসমীপে, শ্মশানে বা উপবনে বাস করিয়া থাকে। ৫০।

শূদ্রের প্রতি ব্যবহার।

যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্ট কর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥ মনু ১০-৯৬।

যদি কোন অধম জাতীয় ব্যক্তি লোভ-বশতঃ উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, তাহার স্বর্ব্বস্ব গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে শীঘ্রই স্বদেশ হইতে বহিস্কৃত করা রাজার কর্ত্তব্য।

ন শূদ্রায় মতি দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিস্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥

শূদ্রকে বিষয় কর্ম্মের কোন উপদেশ দিবে না, (ভৃত্য ভিন্ন) শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দিবে না, যে হব্যের কিয়দংশ হোম করা হইয়াছে. সেই হবি শূদ্রকে দিবে না, শূদ্রকে কোন ধর্ম্মোপদেশ বা কোন ব্রতের উপদেশ দিবে না।

শক্তে নাপি হি শূদ্রেন ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রহি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে॥১০-১২৯।

অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইলেও শূদ্রের ধন সঞ্চয় করা উচিত নহে। কারণ ধনবান হইলে সে ব্রাহ্মণের অবমাননা করিতে পারে।

সহাসনমভিপ্রেপ্সু রুৎকৃষ্ট স্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃত্যঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥৮ম—২৮১

শূদ্র যদি স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে উহার কটিদেশে লৌহময় তপ্তশলাকা দ্বারা অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবে অথবা না মরে এইরূপ করিয়া পাছা কাটিয়া দিবে।"

এতাদৃশ অনেক রকমের ধারা আছে যাহা বর্ত্তমান ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আমলে শুনিলেও আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমরা যদি একই রকমের অপরাধের জন্য রাজার জাতি সাহেবদিগকে তাহাদের বিজিত ভারতবাসী অপেক্ষা কম দণ্ড পাইতে দেখি, তাহা হইলে কতই না বাদানুবাদ করি! কিন্তু পুরাকালে যখন ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠিত আইনের দ্বারা হিন্দুরা রাজত্ব করিতেন, তখন এদেশবাসী শূদ্রদিগের জন্য বিনাকারণেও কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, কারণ সে নিজের চেষ্টায় কায়িক পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন

করিতে পারিবে না, বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবে না, আবার ধর্ম্মাচরণও করিতে পারিবে না। চিরদিন নিরীহ, নির্ব্বিরোধ পশুর ন্যায়, ব্রাহ্মণের সেবার জন্যই যেন ভগবান তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ টুকুও সুদুর্ল্লভ, কারণ শাস্ত্র বলিতেছেন—

অপ্রণামে তু শূদ্রে হপি স্বস্তি যো বদতি দ্বিজঃ।
শূদ্রহপি নরকং যাতি ব্রাহ্মণোপি তথৈবচ॥

যদি ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রণাম না পাইয়া আশীর্ব্বাদ করেন তবে সেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েই নরকে গমন করে। (অঙ্গিরা সং—৫০)

বোধ হয় পুরাকালে নরাকার শূদ্রজন্ম অপেক্ষা পশু হওয়াও ভাল ছিল, কারণ মনু বলিতেছেন—

এক জাতি দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্য প্রভবো হি সঃ॥

(মনুঃ—৮ম—২৭০)

জঘন্যপ্রভব এক জাতি অর্থাৎ শূদ্র যদি দ্বিজদিগের প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে, ঐ শূদ্র জিহ্বা-চ্ছেদরূপ-দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

ভগবান যখন ব্রাহ্মণ. ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে একই উপাদানে, একই আকারে, একই দেশে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন শূদ্রেরও কথা বলিবার অধিকার আছে, অধিকন্তু শূদ্রের পক্ষে সভ্য এবং শিক্ষিত হইবার কোন উপায় যখন ছিল না, তখন সহজেই সে ঈশ্বরদত্ত জিহ্বার ব্যবহার করিতে গেলে, অশ্লীল বা পরুষ ভাষায় প্রয়োগ করিত। পরিণামে জিহ্বা-যন্ত্রটী হারাইয়া বেচারা শূদ্র (জিহ্বাহীন!) পশুতেই পরিণত হইত! কারণ বাকশক্তিহীন যাবতীয় চেতন পদার্থের নামই জন্তু বা পশু। কিন্তু পশুও জিহ্বাযন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে জীবনাতিবাহিত করিয়া থাকে; তাই বলিতেছিলাম পুরাকালে শূদ্র-জীবনাপেক্ষা পশুজীবনও যেন ভাল ছিল।

এইবার দেখা যাউক ব্রাহ্মণেরা অপরাধ করিলে কিরূপ শাস্তি পাইতেন।

কৌটসাক্ষ্যন্তু কুর্ব্বাণাং স্ত্রীন্ বর্ণান ধার্ম্মিকো নৃপঃ।
প্রবাসয়েদ্দণ্ডয়িত্বা ব্রাহ্মণন্তু বিবাসয়েৎ॥

৮ম—১২৩।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বার বার মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলে তাহাদিগকে অর্থদণ্ড করিয়া দেশ-বহিষ্কৃত করিবে, ব্রাহ্মণের অর্থদণ্ড না করিয়া বাসস্থান হইতে তাড়াইয়া দিবে।

পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পিবেৎ।
উভো তৌ তুল্যদোষৌ চবসতো নরকে চিরম্॥

(অত্রিসংহিতা ২৯৪ শ্লোক।)

পঞ্চগব্য পায়ী (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, গো-মূত্র একত্র মিশ্রণে পঞ্চগব্য তৈয়ারি হয়) শূদ্র এবং মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ উভয়েই তুল্য পাপী! ইহারা উভয়েই চিরদিন নরকে বাস করে।

এই গব্য দ্বারা মানবের মহাপাপ নাশ হয়—ইহাও প্রভুদের ব্যবস্থা! কিন্তু শূদ্রের পক্ষে পঞ্চগব্য পুণ্য না হইয়া পাপ ও নরক হইল!

আর অধিক লিখিতে গেলে এইরূপ অত্যাচার ও অবিচার কাহিনীতে একখানা পুস্তক হইয়া পড়ে। সুতরাং এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম। পাঠকেরা জানিয়া রাখিবেন, যে রাজা এইরূপ বিধিবদ্ধ আইনদ্বারা প্রজাশাসন ও পালন করিতেন, তিনি হিন্দু শাস্ত্রমতে আপনার সমুদয় পাপ দুরীভূত করিয়া শেষে পরমাগতি প্রাপ্ত হইতেন! যেহেতু মনু বলিতেছেন—

এবং সর্ব্বানিমান্ রাজা ব্যবহারান সমাপয়ন্।
ব্যপোহ্য কিল্বিষং সর্ব্বং প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥

৮ম অধ্যায় ৪২০।

তোষামদ ও তৈলবট কি তখনও ছিল ?

ছিল বৈ কি, নৈলে মনু ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাত সন্তানকে, অম্বষ্ট পারশবাদির ন্যায় স্বতন্ত্র কোন সংজ্ঞা প্রদান করিলেন না কেন ? ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যে জন্মিবে তাহার নাম "অম্বষ্ঠ", আর ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত সন্তানটী কি হইবে ?—

এবার প্রভু বড় শক্তের পাল্লায় পড়িয়াছেন, রাজার জাতি ক্ষত্রিয়কে "বেইমান" করেন কি করিয়া ? অন্ন মারা যাইবে যে! বড় কঠিন সমস্যা !! পাঠক, এই সমস্যার পূরণ অতি সুকৌশলে মনুর পরবর্ত্তী যাজ্ঞবল্ক্যাদি মহর্ষিরা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে, তাহার নাম "মূর্দ্ধাভিষিক্ত।" কি না (মূর্দ্ধিং অভিষিক্ত অর্থাৎ অভিষিক্ত-মস্তক) অর্থাৎ রাজ্যাভিষেক প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় ! (শব্দ কল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য)। একেই বলে "ধরি মাছ, না ছুই পানি।" ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতি ভিন্ন একটী স্বতন্ত্র জাতিও হইল অথচ "বীর সিংহের মান রক্ষাও" হইল। আমরা কিন্তু "মূর্দ্ধাবসিক্ত" বা "মূর্দ্ধাভিষিক্ত" বলিয়া কোন একটী স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব দেখিতে পাই না।

"গোঁজামিল" আর কাকে বলে। আবাল্য ব্রহ্মচারী পরম ব্রাহ্মণ মহর্ষি ব্যাসদেবের ঔরসজাত ধৃত-রাষ্ট্র ও পাণ্ডু এবং তাঁহাদের বংশাবলিকে সকলে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানেন, "মুর্দ্ধাবষিক্ত" বলিয়া কেহ জানেন কি ! মানবের কল্পিত ক্ষত্রিয় বংশে জন্মিলেই রাজা বা রাজার জাতি হইবে—ইহা স্বীকার করিলে, কর্ম্মফলদাতা, বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব রৈল কোথায় ? কে বলিবে ভারতবাসী হিন্দুগণের এই মহাভ্রম ঘুচাইবার জন্যই ভগবান বর্ণাশ্রম-পীড়িত ভারতের বহিস্থ সুদূর বিদেশ হইতে ভিন্নধর্ম্মী মুসলমান ও ইংরাজ জাতিকে আমদানি করিয়া ভারতের রাজ-সিংহাসনে বসান নাই ! বংশগত জাতিভেদের শোচনীয় পরিণাম

প্রদর্শন করাই কি তাহার উদ্দেশ্য নয়? সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার বাহু হইতে জন্মিয়া মন্বাদি ঋষিনির্দ্দিষ্ট সনাতন শৌর্য্যবীর্য্য থাকিতেও মহাবীর ক্ষত্রিয়গণ যবন হস্তে পরাস্ত ও রাজ্যচ্যুত হইলেন কেন? অধিকন্তু প্রায় ৭০০ বৎসর রাজত্ব করার পরে, সেই সুবিশাল রত্নগর্ভা ভারত-সাম্রাজ্য, ৭ সমুদ্র ১৩ নদীর পারস্থ ক্ষুদ্র বৃটেন দ্বীপের ইংরাজ-জাতির করতলগতই বা কেন হইল? ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুইই ত বীরের জাতি! ফলতঃ যাঁহার প্রসাদে পঙ্গুতে গিরি-লঙ্ঘনে সমর্থ হয়, তিনিই বৃটেন দ্বীপের খৃষ্টান জাতিকে সুবিশাল মহাসাগরাদি পার করিয়া ভারতের শাসনভার তাঁহাদেরই হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। পাঠক, ব্রাহ্মণের গরু হারাইলে যেকালে ক্ষত্রিয়ের দ্বারস্থ হইয়া রাজ্য শাসনের দোষারোপ পূর্ব্বক তাঁহারা ক্ষত্রিয়কেই দায়ী করিতেন, সেই ত্রেতাযুগের একটী ঘটনা এক্ষণে একবার স্মরণ করুন।

অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথ মৃগভ্রমে অন্ধক মুনির (করণ জাতীয়?) পুত্র সিন্ধুকে বধ করিলেন! অন্ধের যষ্ঠি একমাত্র প্রিয় পুত্রকে হারাইয়া বৃদ্ধ, অন্ধ মাতাপিতাও মহারাজের সম্মুখেই পুত্রশোকে, পিপাসায় ও অনাহারে মারা গেলেন! প্রবীণ পরম ধার্ম্মিক মহারাজের বিবেক যখন বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিল—এই ভীষণ মহাপাপের পরিণাম ভাবিয়া ব্যাকুল ও হতাশ হইয়া পড়িলেন, তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে কি ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, জানেন কি? গরু মারিলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে—"গোবধ-কিস্তী" করিতে হয়, কিন্তু এই অসহায়, ফল-মূলাহারী, দীন দরিদ্র, অরণ্যবাসী, ধর্ম্ম-প্রাণ পবিত্র পরিবারটীর বধ-সাধন করিয়া, মহারাজের "শাপে বর" হইয়াছিল! আর আজ বিদেশী, বিভিন্নধর্ম্মী, ইংরাজ জাতির সদাশয়তায়, কোথায় কোন্ ভারতীয় কর্ম্মচারী, তাহারই স্বদেশী আততায়ীর হস্তে নিহত বা আহত ও অকর্ম্মণ্য হইলে—কোন পোষ্ট মাষ্টার, দারোগা, কনেষ্টবলাদি মারা গেলে, তাহার অসহায়, বিপন্ন পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য যথাযোগ্য বৃত্তি বা

ভাতার বন্দোবস্ত হইয়া থাকে! এমন কি পিতা বাঁচিয়া থাকিলে যে কন্যার বিবাহ হওয়াই দুষ্কর হইত, সদাশয় ইংরাজ গবর্মেণ্ট যথাযোগ্য যৌতুক (পণ) দিয়া উপযুক্ত পাত্রে ঐরূপ অভিভাবক-হীন কন্যার বিবাহ পর্য্যন্ত দিয়া দিতেছেন; এবিষয়ে দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

শূদ্রক মুনি বেদোচ্চারণ করিলে, ব্রাহ্মণগণের আদেশে রাজা রামচন্দ্র তাহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। আর আজ সেই বেদ কলিকাতার রাস্তায়, মুসলমান ফেরিওয়ালার দোকানে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে! কোন্‌টা "রাম রাজত্ব"!

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নাপিতের উৎপত্তি রহস্য

মনু-সংহিতাতে নাপিতকে নিজ মূর্ত্তিতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই জন্যই আমি মনু-সংহিতার জাতি-সংক্রান্ত বচনাবলি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। পাঠক, একবার উক্ত শ্লোকগুলি পুনরালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে মনু নাপিতের জন্ম বা বৃত্তি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছুই বলেন নাই। অথচ নানা স্থানে সংস্কার ও অশৌচাদি কার্য্যের ব্যবস্থা দিয়া নাপিতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সহসা ৪র্থ অধ্যায়ের ২৫৩ শ্লোকে বলিতেছেন :—

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালোদাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

আর্দ্ধিক অর্থাৎ যে যাহার কৃষিকর্ম্ম করিয়া অর্দ্ধেক ভাগ লয়, যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র, যে যাহার গো পালন করে, যে যাহার ভৃত্যকর্ম্ম করে, এবং নাপিত ; শূদ্রের মধ্যে ইহাদের সিদ্ধান্ন ভোজন করা যায়। এতদ্ব্যতীত যে যাহার নিকট আত্ম-সমর্পণ বা নিবেদন করিয়াছে, তাহার অন্নও ভোজন করা যায়।—দ্বিজদিগেরই কর্ত্তব্য বিষয়ের মধ্যে এই শ্লোকটীর উল্লেখ আছে, সুতরাং নাপিতের অন্ন ব্রাহ্মণেও ভোজন করিতে পারিতেন, এবং ইচ্ছা করিলে এখনও পারেন, উক্ত শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই ইহা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু "এতে শূদ্রেষু" অর্থাৎ "এই সকল শূদ্রের"—এই বাক্য দ্বারা নাপিতকে শূদ্রমধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। মনু যে অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঝল্ল, মল্ল,

নট, করণ, ডোম, চণ্ডাল, মেদ, মেথর প্রভৃতির জন্ম-বৃত্তান্ত এবং জীবিকা নির্ব্বাহের বিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেখানে নাপিতের কোন উল্লেখ নাই। হঠাৎ এখানে দাস গোপালের দলে গোঁজামিল দিয়া নাপিতকে শূদ্র নামে অভিহিত করিবার কারণে সন্দেহ আসে না কি? আদ্ধিক, কুলমিত্র, দাস ও গোপালের কার্য্য যে কোন জাতীয় লোক দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু নাপিত ভিন্ন অন্য কোন জাতীয় লোক দ্বারা নাপিতের কার্য্য চলিতে পারে না। অর্থাৎ আর্দ্ধিক, কুল-মিত্র, দাস ও গোপাল ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন জাতি নহে। কেন না আদ্ধিক বা অর্দ্ধসীরী অর্থে—যাহারা শস্যের অর্দ্ধভাগ লইয়া জমীতে আবাদ করে। এইরূপ—

কুলমিত্র--যাহারা পুরুষানুক্রমে কোন কুলের অর্থাৎ বংশের মিত্র, হিতকারী অথবা বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ।

দাস—সাধারণ ভৃত্য। মনু সাত প্রকার দাসের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ।
পৈতৃক দণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাস যোনয়ঃ॥

যুদ্ধে জীত, ভক্তদাস, ভাতের লোভে দাস বা দাসীপুত্র, ক্রীত, প্রতিগ্রহ-লব্ধ, পিত্রাদি-ক্রমে দাস আর রাজদণ্ড শোধিবার জন্য দাস। এই ৭ প্রকার লোকই প্রকৃত প্রস্তাবে দাস-পদ-বাচ্য।

গোপাল—গো রক্ষক, যাহারা গরু পালন করে অর্থাৎ পরের গরু পোষে। গরুর মালিক হয়ত দুধ টুকু ভোগ করেন, আর যে পালন করে সে দুধ ছাড়িলে বাছুরটী পায়; অন্যরূপ বন্দোবস্তও হইতে পারে। মুসলমান রাখালকেও গোপাল বলা যায়। সুতরাং উক্ত ৪টী শ্রেণী জাতিবাচক নহে। যে কোন জাতীয় লোক ঐ সকল বৃত্তি অবলম্বন

করিতে পারে। অতএব দাস, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী বা আর্দ্ধিক এই ৪টী শব্দ বৃত্তি-সাপেক্ষ।* একমাত্র নাপিত শব্দটী জাতিবাচক। সুতরাং মনু-সংহিতার উক্ত শ্লোকটীতে নাপিত শব্দের প্রয়োগে নাপিত জাতির শ্রেষ্ঠত্বই সূচিত হইয়াছে ; কেবল দোষ হইতেছে "এতে শূদ্রেষু" লইয়া। দেখা যাউক প্রতিষেধক কিছু আছে কিনা।

পাঠক, হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইলেন মহর্ষি মনু, আর কলিযুগের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহামুনি পরাশর। এই উভয় মহাত্মার প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থাগুলিকে স্বেচ্ছামত দূষিত করিতে না পারিলে, বক-ধার্ম্মিকদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অনেক সময় ব্যাঘাত পড়ে। এই জন্য উক্ত উভয় শাস্ত্রকারের বিধি-ব্যবস্থাগুলির কোন কোন অংশ ভাবান্তরিত, প্রক্ষিপ্ত বা স্বেচ্ছাকৃত দোষে দূষিত হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রমাণ যথাস্থানে প্রদর্শন করিব। এক্ষণে দেখুন উপর্য্যুক্ত শ্লোকে নাপিতকে শূদ্র বলা হইল ; অথচ মনু তাহার জন্ম-বৃত্তান্ত বা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিলেন না। কিন্তু মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

শূদ্রেষ—দাস গোপাল কুল মিত্রার্দ্ধসীরিনঃ।
ভোজ্যান্না নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥১৬৮।

অস্যার্থ—দাস, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী শূদ্রের মধ্যে এই কয়জনের এবং নাপিত আর যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে তাহার অন্নও দ্বিজগণের ভোজ্য।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য দুইটী "চ"কার দ্বারা নাপিতকে আর আত্মোৎসর্গ-কারীকে দাস, গোপাল, কুলমিত্র ও অর্দ্ধসীরী (আর্দ্ধিক) হইতে পৃথক করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন। সুতরাং নাপিতকে যাজ্ঞবল্ক্য শূদ্রের অন্তর্নিবিষ্ট

---

* উল্লিখিত ৪টী নামানুসারে ৪টী নূতন জাতি গড়িবার যোগাড় চলিতেছে। 'সাহিত্য-দূষন' অধ্যায় দেখুন।

করেন নাই, ইহা বিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ বিচারককে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বোধ হয় এক্ষণে কাহারও অমত নাই। এই সংহিতাখানি নিজ মূর্ত্তিতেই আছে, এইরূপই অনেকের বিশ্বাস। সুতরাং মনুসংহিতার উক্ত শ্লোকটী ঠিক নাই। আবার উহাতে ব্যাকরণ দোষও দেখা যায়, কারণ "নাপিতৌ শব্দ দ্বারা প্রথমার দ্বিবচন-প্রকাশ হইতেছে ; কিন্তু "এতে শূদ্রেষু" দ্বারা বহু বচন বুঝাইতেছে। যাহা হউক নাপিতের অন্ন ব্রাহ্মণ খাইতে পারেন একথা বুঝা গেল। রুটী, মিঠাই, সন্দেশের ত কথাই নাই! অপিচ— স্মার্ত্ত-প্রবর ব্রাহ্মণ কুলতিলক রঘুনন্দন তৎকৃত 'উদ্বাহতত্ত্বে' বলিতেছেন—

> সংসর্গ দোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্বধঃ
> দত্তৌ রসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহ।
> শূদ্রেষু দাস গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরীণাম্
> ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থ সেবাতি দূরতঃ
> ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্বতাদি ক্রিয়াপিচ
> ভৃগ্বগ্নি পতনঞ্চৈব বৃদ্ধাদি মরণং তথা॥
> ইত্যাদিন্যভিধায়।
> এতানি লোক গুপ্তার্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ
> নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মানি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

"হেমাদ্রি" নামক প্রবন্ধে এবং পরাশর ভাষ্যে "আদি-পুরাণ" হইতে উপরিস্থিত বচনাবলি উদ্ধৃত করিয়া রঘুনন্দন বলিতেছেন যে, "পাপ বিষয়ে সংসর্গদোষ স্বীকার, মধুপর্কে পশুহিংসা, শাস্ত্রোক্ত দশবিধ পুত্রের মধ্যে "দত্তক" এবং "ঔরস" ভিন্ন অবশিষ্ট আট প্রকারকে পুত্ররূপে গ্রহণ, শূদ্র জাতির মধ্যে দাস, গোপালক, বংশানুক্রমে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ এবং অর্দ্ধসীরী (যাহাদিগকে শস্যের অর্দ্ধভাগ দিয়া জমি বিলি করা হয়) এই

সকল শূদ্র জাতির অন্ন ভোজন, গৃহস্থের পক্ষে অতি দূরস্থিত তীর্থ সেবন, ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের খাদ্য শূদ্রদ্বারা পাক করান, উৎকট মনের দুঃখে নিজের ইচ্ছায় পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে পড়িয়া বা জলে অথবা অনলে প্রবেশ করিয়া মরণ—ইত্যাদি প্রকার আরও কতকগুলি কথার উল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিতেছেন—মহাত্মা পণ্ডিতগণ কলির প্রথমে লোক রক্ষার্থ ব্যবস্থা-পূর্ব্বক উক্ত কর্ম্ম সকলের আচরণ নিষেধ করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখুন কলিকালেও নাপিতের অন্ন ব্রাহ্মণের ভোজ্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে দাস, গোপাল, কুলমিত্র ও অর্দ্ধসারী ও নাপিত এই পাঁচ জনের অন্ন সর্ব্ব জাতির ভোজ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু রঘুনন্দন বলিলেন যে দাস, গোপাল, কুলমিত্র এবং অর্দ্ধসীরি এই কয়টী শূদ্র জাতির অন্ন ভোজন কলিতে নিষেধ। নাপিত সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। আদি পুরাণেও নাপিতের অন্ন ভোজন নিষেধ নাই যথা—

> শূদ্রেষু দাস গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধ সীরিনাম্
> ভোজ্যান্নতা গৃহস্থ্যস্থ এতানি লোক গুপ্ত্যর্থং
> কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি
> ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ ॥

তাহা হইলে নাপিতের অন্ন কলিতেও নিষিদ্ধ নহে। কারণ "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্"—নাপিত সম্বন্ধে রঘুনন্দন যখন কিছু বলিলেন না, তখন উহাই বুঝিতে হইবে। যুক্তিপ্রিয় কোন পাঠক বলিতে পারেন—হয়ত এখনকার কালের খানসামার মত নাপিত পূর্ব্বে খানসামার পর্য্যায়ভুক্ত ছিল, তাই নাপিতের অন্ন সকলে খাইত। তাহা হইলে উক্ত শ্লোকে "দাস" শব্দটী থাকিত না। কারণ, যাহাদিগকে আমরা এখন গোলাম বা খানসামা বলি, তখনকার কালে তাহাদিগকেই "দাস" বলিত। "কৈবর্ত্তঃ দাস ধীবরে" বলিয়া একটা প্রবাদ থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে

'দাস' বলিয়া কোন জাতি নাই। শাস্ত্রমতে শূদ্রেরই প্রতি শব্দ দাস। যথা—সর্ব্বেষাং কিঙ্করাঃ শূদ্রাঃ ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।

(ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে গণেশখণ্ডে)॥

তবে যে আজ কাল প্রায় সকল জাতির মধ্যেই "দাস" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহার কারণ স্বতন্ত্র। দেবতা ও ব্রাহ্মণাদি গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনার্থই কেহ কেহ নামের শেষে দাস শব্দ ব্যবহার করিতেন। যথা—কালীদাস, ব্রহ্মদাস, বৈষ্ণবদাস প্রভৃতি। এই প্রথাই কালে বংশানুক্রমিক উপাধিতে পরিণত হইয়াছে, পক্ষান্তরে দাস ভিন্ন অনেক রকম উপাধি কৈবর্ত্ত ও ধীবরদিগের মধ্যেও দেখা যায়।

পরন্তু মনু নাপিত সম্বন্ধে আর কিছু বলেন নাই বলিয়াই, মনুর পরবর্ত্তী সংহিতা ও পুরাণ কর্ত্তারা নাপিতকে নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। এই শুনুন—

১। শূদ্রকন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসোঽসংস্কারে তু নাপিতঃ॥

পরাশর-সংহিতা।

ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত সন্তান সংস্কৃত হইলে "দাস" আর অসংস্কৃত অবস্থায় থাকিলে "নাপিত" হয়। (বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত পরাশর-সংহিতা দ্রষ্টব্য)।

২। ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্র কন্যায়াং জাতৌ নাপিত-মোদকৌ।

(ইতি বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ এবং বিবদার্ণবসেতু)

শূদ্রকন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে নাপিত এবং মোদক অর্থাৎ ময়রা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

৩। বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ জাতাঃ পুত্রাস্ত্রয়ঃ ক্রমাৎ।
তেষাং গো প্রথমপুত্রঃ কুম্ভকারঃ স উচ্যতে॥

কুলাল বৃত্তা জীবেত্তু নাপিতঽস্তভবত্যতঃ।
সূতকে প্রেতকে বাপি দীক্ষা কালেচ বাপনঃ॥
নাভেরূদ্ধস্ত বপনং তস্মান্নাভিশ্চ স উচ্যতে।
কায়স্থঽস্ত স জীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ।
কাকাৎ লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথ কৃন্তনঃ
আদ্যক্ষরানি সংগৃহ্য কায়স্থঃ হি স কীর্ত্তিতঃ।

(ইতি অস্যার্থ ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রম)

বিপ্র ও বৈশ্যের অবৈধ প্রণয়ে (চৌর্য্যাৎ—চুরি করিয়া) ক্রমান্বয়ে ৩টী পুত্র জন্মাইয়াছিল। উহার প্রথমটীই হইল কুম্ভকার, তাহার বৃত্তি হইল কুলালের অর্থাৎ কুমারের। ২য় পুত্রটীই নাপিত, তাহার বৃত্তি অর্থাৎ ব্যবসায় হইল জনন-মরণাশৌচে এবং দীক্ষাকালে ক্ষৌর করা। আর নাভির উর্দ্ধে ক্ষৌর করে বলিয়া 'নাভি' বা নাই বলিয়াও সে অভিহিত হইল। আর তৃতীয় পুত্রটী ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার স্বভাব কাক অপেক্ষা লোভী, যম অপেক্ষা ক্রূর, এবং শত্রুর শিরশ্ছেদনে স্থপতি অপেক্ষা নিপুণ, এই কারণে কাক, যম ও স্থপতি এই তিন শব্দের আদ্যক্ষর লইয়া "কায়স্থ" বলিয়া তিনি কীর্ত্তিত হইলেন!

৪। কুবেরিণ পট্টিকার্য্যং নাপিতঃ সমযায়তঃ।

(পরশুরাম-সংহিতা ও পরাশর পদ্ধতি)

কুবেরি পিতা আর পট্টিকারী মাতা হইতে নাপিত জন্মিয়াছিল।

৫। বিবাহকালে নাপিতেরা যে "কর্ণ-কথা" বা গোর্বচন" বলে, তাহাতে আছে "(শিবের) নাভিতে জন্মিল নাপিত কুলের অধিকারী; নাম রাখিল তার পরশ-চিকিৎসা-মুনি"। (গোর্বচন দেখুন)। এটী নাপিতের নিজস্ব হইলেও, ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য নহে, তবে পুরুষ-পরম্পরা ক্রমে ঐ বচন চলিয়া আসিতেছে বলিয়া এবং উহা নিরীহ, নিরক্ষর,

সরল-প্রকৃতির লোক-দ্বারা রচিত এবং বর্ণিত হয় বলিয়া উহার মূলে নিশ্চয়ই একটু সত্য নিহিত আছে, কারণ—"নহ্য মূলা জনশ্রুতিঃ," জনশ্রুতি কখনও মূলহীন নহে। এই গোর্বচনের রচনা এক রকম নহে। আজকাল ঐ বচন নাপিতে আগাগোড়া বলিবার সুযোগ পায় না এবং সকল নাপিতেও সম্পূর্ণ জানে না। তবে উহার মূল এক। অর্থাৎ নাভিতে জন্মিল নাপিত কুলের অধিকারী—ইহা প্রায় সকলেই জানেন। হর গৌরীর বিবাহকালে গাভী মোচনার্থে নাপিতের দরকার হয় এবং সেইজন্য মহাদেব নাভি হইতে নাপিত সৃষ্টি করেন, এই কিম্বদন্তী নাপিত সমাজে প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে।

আপাততঃ এই ৫টী মত উদ্ধৃত করা গেল। খুঁজিলে বোধ হয় আরও ২৷৩টী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত বাহির হইবে। কিন্তু ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য যে নাপিতের ন্যায় তুচ্ছ এক জাতির সৃষ্টির জন্য অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান ভগবান আর কোন উপায় করিতে পারিলেন না! একবার ব্রাহ্মণ-শূদ্রে, একবার ক্ষত্রিয়-শূদ্রে, একবার ব্রাহ্মণ-বৈশ্যে, অবশেষে হিন্দু সমাজের অবজ্ঞাত বর্ণ-সঙ্কর কুবেরী আর পট্টিকারী জাতির শরণাপন্ন হইলেন! হা, হতভাগ্য স্বজাতিবর্গ! আর কতকাল অন্ধকারে ঘুমঘোরে কাল কাটাইবে! তোমাদের জড়ভাবাপন্ন অসার-জীবনে কি জ্ঞানের সঞ্চার একবারও হইবে না! তোমরা কি বুঝ নাই যে সরলতা ও পরহিতৈষিতার পুরস্কার একালে আশা করা অন্যায়। দেখিতেছ না, প্রভুরা তোমাদিগকে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া শূদ্রাধম অন্ত্যজ নামে অভিহিত করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। দেখিতেছ না এক সময়ে, একই দেশে, একই বিধাতার সৃষ্ট মনুষ্য, সেই বিধাতার বিধান লঙ্ঘন করিয়া আর এক রকমের মনুষ্য সৃষ্টি করিতেছে! তোমরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছ যে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার মুখ, বাহু, উরু ও পদ

হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগকেই বর্ণ-সঙ্কর উৎপাদনের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন! তাহা হইলে আর ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব রৈল কোথায়? ঈশ্বর আছেন একথা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে জীব-সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহার মহিমাও স্বীকার করিতে হইবে। পাঠক, একটু ধীরভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, অনাদি কাল হইতে সেই বিশ্ব বিধাতা জরায়ুজ, অণ্ডজ এবং স্বেদজ এই তিন প্রকার প্রাণীকে তাহাদের স্ব স্ব প্রভেদ-জ্ঞাপক লক্ষণানুসারে সৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন। আরও বুঝিবেন যে ঈশ্বর-দত্ত গুণ ও গঠন কেহ বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুকরণ করিতে পারে না। জগৎ-স্রষ্টার এই অলঙ্ঘ্য নিয়মের ব্যতিক্রম কস্মিনকালেও ঘটিবার নহে—অর্থাৎ জরায়ুজ কখনও অণ্ডজ বা স্বেদজের এবং স্বেদজ বা অণ্ডজ কখনও জরায়ুজের লক্ষণ গ্রহণে সমর্থ হইবে না। জরায়ুজ (মনুষ্য) অণ্ডজ (পক্ষী) এবং স্বেদজ (পোকা)—ইহারা কেহ অপরের রূপ বা আকৃতি ধরিতে পারে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে পরস্পরের প্রভেদ জ্ঞাপক কোন লক্ষণ দেখা যায় না, অর্থাৎ শূদ্রতেও যে গুণ, যেরূপ আকৃতি, যে রং ও যেরূপ আচার ব্যবহার দেখা যায়, ব্রাহ্মণেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে জাতিবিচার মনুষ্যকৃত, ঈশ্বরের নহে। ঈশ্বরদত্ত গুণ ও লক্ষণ এতই অভ্রান্ত যে যদি একটী কাকাতুয়া ও একটী টিয়া পাখীকে কাহারও সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, ইহারা এক জাতীয় কি না, তাহা হইলে সে ব্যক্তি—যদি দুইটী পাখীর পরিচয় নাও অবগত থাকে, তবু সে বিনা উপদেশে বলিবে যে উহারা ভিন্ন ভিন্ন পক্ষী,—এক জাতীয় নহে। বৃক্ষাদিতেও দেখুন আম গাছের যেরূপ আকার, কাঁটাল গাছের সেরূপ নহে। কাঁটাল গাছের যেরূপ আকার নারিকেল গাছের সেরূপ নহে।

পক্ষীতেও দেখুন কাক পক্ষীর যেরূপ আকার ও কণ্ঠস্বর, শালিকের আকার ও স্বর তদ্রূপ নহে। টিয়াপাখী বকের মত মৎস্য ধরিয়া খাইতে পারে না, সৃষ্টি বিষয়ে এই অলঙ্ঘ্য নিয়ম সর্ব্বত্র জাজ্বল্যমান। কিন্তু দেখুন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে কাহারও কি বিশেষ-রূপ ও গুণ অছে যে অন্য বর্ণে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না বা অন্যে তাহা গ্রহণ বা অনুকরণ করিতে পারে না। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র ইচ্ছা করিলেই ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ ও তাহার গুণ গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের দোষ-গুণ ধারণে, অনুকরণে ও গ্রহণে সমর্থ। যদি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রাহ্মণাদি ৪ বর্ণকে পৃথক পৃথক রূপে উৎপন্ন করিতেন তাহা হইলে প্রত্যেক বর্ণের এক একটি বিশেষ গুণ ও রূপ প্রদান করিতেন, কেন না ইহাই তাঁহার সৃষ্টিবৈচিত্র। এই জন্যই ভগবান শ্রীমুখে গীতাতে বলিয়াছেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তার মপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥

৪র্থ অধ্যায়—১৩।

টীকা—ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ (গুণানাং কর্ম্মনাঞ্চ বিভাগৈঃ) চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টম (ইতি সত্যম তথাপি) তস্য কর্ত্তারমপি (ফলতঃ) অব্যয়ং (আসক্তি রাহিত্যেন) মাম্ অকর্ত্তার মেব বিদ্ধি।

অর্থাৎ "আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগদ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করি সত্য বটে, কিন্তু তাহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে অব্যয় এবং আসক্তিশূন্যতা হেতু অকর্ত্তা জানিও!" বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা, যিনি নিমেষ মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতে পারেন, যিনি যক্ষ, রক্ষ, নর, কিন্নর, বানর, দেব-দৈত্যাদি অসংখ্য রকমের প্রাণী—সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ত্তা তিনিই বটেন, আবার

অকর্ত্তাও” বটেন!! আমরা কিন্তু দেখিতে পাই নাপিত আর বামুন মনে করিলেই “জাতি” মারিতেও পারেন, সৃষ্টি করিতেও পারেন!!!

পাঠক, বর্ণাশ্রম পদার্থটা কি কঠিন ও কত জটিল রহস্যময় বুঝুন, এই খানেই বর্ণবিচার-রহস্য নিহিত রহিয়াছে।

আমরা বেদ জানি না, স্মৃতি জানি না, মনু জানি না, ব্যাস পরাশরাদিরও কিছুই জানি না, কিন্তু শ্রীভগবান শ্রীমুখে যাহা বলিতেছেন তাহাই গ্রাহ্য ও শিরোধার্য্য, সুতরাং দেখা যাউক ভগবানের মুখ-নিঃসৃত ঐ “অব্যয়” এবং “অকর্ত্তা” শব্দের অর্থ এবং উদ্দেশ্য কি? আসক্তি বলিলেই বিষয়-ভোগ-বাসনা ও নশ্বর জীবনের ইন্দ্রিয়-সুখাদিকে বুঝায়; কিন্তু ভগবান অবিনশ্বর, ত্রিগুণাতীত, সুতরাং ভোগবাসনারও অতীত। তাই তিনি অব্যয় অর্থাৎ অক্ষয়, অবিনশ্বর। (ন—ব্যয়=ব্যয় রহিতে ইতি মেদিনী)। উক্ত শ্লোকে “অব্যয়” শব্দের প্রয়োগে বুঝা গেল যে—চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টিতে ভগবানের আসক্তি ছিল না, তবে তাঁহার সৃষ্ট সত্ত্ব, রজ, তমঃ গুণ-প্রভাবে, মানুষ স্বভাবতঃই ৪ ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে। সেই গুণের উৎকর্ষে, অপকর্ষে বা মিশ্রণে ও তদনুযায়ী কর্ম্মের অনুষ্ঠানে—সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, সত্ত্ব ও রজঃগুণে ক্ষত্রিয়, রজস্তমগুণে বৈশ্য, আর একমাত্র তমঃগুণে শূদ্রবর্ণের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। লোক সৃষ্টির কর্ত্তাও যিনি আর উক্ত গুণত্রয়ের শ্রষ্ঠাও তিনি, তাহা হইলে—ঐ কয়টী গুণ-সম্ভূত এবং তদনুযায়ী কর্ম্মানুরক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানবের কর্ত্তাও সেই ভগবান। সেই জন্য তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, বর্ণ চতুষ্টয়ের কর্ত্তা না হইলেও বাস্তবিক তিনিই চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা। স্ত্রী পুরুষের সহবাসে মানুষ আপনা হইতেই জন্মিতেছে—ইহাই আমাদের স্থূল বিশ্বাস, এই মানুষ আবার ইচ্ছামত বৃক্ষাদি সৃজন ও পালন করিতেছে, তবে ঈশ্বর কি করিতেছেন? একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাউক। বট বা অশ্বত্থ ফল অপেক্ষা নারিকেল

ফল অনেক বৃহৎ ও ভার-বিশিষ্ট। কিন্তু বৃক্ষ-সৃজন-মানসে আমরা যদি একই ক্ষেত্রে, একই সময়ে উক্ত দুইটী বৃক্ষের ফল মাটিতে পুতিয়া রাখি, তাহা হইলে ১০।১২ বৎসর পরে দেখা যাইবে যে ২টী পৃথক রকমের বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে বট বা অশ্বত্থ ফলে যে বৃক্ষ জন্মিয়াছে, তাহা নারিকেল গাছ অপেক্ষা অনেক বড় এবং অনেক শাখাপ্রশাখা যুক্ত। অশ্বত্থের বীজ কিন্তু নারিকেল অপেক্ষা অনেক ছোট। বড় ফলে দেখুন ছোট গাছ জন্মিল, আকারও বিভিন্নরূপ হইল। ইহাই গুণপ্রভাব এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি বৈচিত্র। মানুষ সহস্র চেষ্টা করিলেও ইহার ব্যতিক্রম হয় না। ফলতঃ গুণকর্ম্মানুসারেই মানবের শ্রেণী বিভাগ হওয়া উচিত। ইউরোপ ও আমেরিকাতে সেইরূপ প্রথাই আছে। গুণ ও কর্ম্মের অপকর্ষতা ঘটিলে কি পরিণাম হয় দেখুন। সকলেরই বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের ইচ্ছা পুত্র হউক, কিন্তু ক্রমাগতই কন্যারত্ন জন্মিতেছে, আর ব্রাহ্মণ অনুক্ষণ ঈশ্বরের দোষ দিতেছেন, কারণ কন্যাদায় ব্রাহ্মণের পক্ষে বড় দায়। যে সকল মুনিঋষির বংশধর বলিয়া তাঁহারা আজিও গর্ব্ব করেন, তাঁহারা কিন্তু যাহা বলিয়া বীর্য্যাধান করিতেন ঠিক তাহাই ফলিত। ব্যাস, বসিষ্ঠ, পরাশর, ঋষ্যশৃঙ্গ, শুকদেব, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরাদির জন্ম-বৃত্তান্ত পড়িলে ইহা সহজেই অনুমিত হয়। ফলতঃ গুণী, জ্ঞানী ও বলবান সন্তান লাভ করিতে হইলে পিতাকেও তদনুরূপ তেজোবীর্য্য সম্পন্ন হইতে হয়। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে তবে অনেক পণ্ডিতের সন্তান মূর্খ হয় কেন?—উত্তর, গর্ভাধান সময়ে পিতা অথবা পিতামাতা উভয়েই তমঃময় হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই জন্য বীজাপকর্ষ ঘটিয়াছিল (রতিশাস্ত্র দেখুন) অথবা তাঁহারা স্বভাবতঃই হীনবীর্য্য; এরূপ হওয়া অসম্ভবও নহে। পুত্র-পৌত্রাদি রাখিয়া ব্রাহ্মণী স্বর্গারোহণ করিলেন, তাহার বৃদ্ধ স্বামী হয়ত দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষে বিবাহ

করিতেছেন, এরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও বিরল নহে। অপরকে ব্যবস্থা দিবার সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবশ্য বলিবেন "আরে বাপু, তোমার আর এ বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করাটা ভাল দেখায় না, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—তা যখন তোমার বর্ত্তমান তখন ছেলেটীর বিবাহ দিয়া নিজে ধর্ম্মালোচনা করাই ভাল।" আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—মহাশয় বর্ণভেদ কেমন করিয়া হইল? অমনি গম্ভীর আওয়াজে উত্তর পাইবেন—

শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাদিমা ক্ষত্রিয়-জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনে নচ!
কামভোগ প্রিয়াস্তীক্ষ্ণা ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্ত স্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাংগতাঃ॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ কি না যে সকল ব্রাহ্মণ রজোগুণ প্রভাবে কাম ভোগে প্রিয়, ক্রোধ পরতন্ত্র রক্তবর্ণ, সাহসী ও হটকারী হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় হইয়া গিয়াছেন! এবং এইরূপে বৈশ্য ও শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতেই জন্মিয়াছে ইত্যাদি। পাঠক, কি ভীষণ ভ্রান্তি, প্রবৃত্তি ও কালের গতি! বুঝিতে চেষ্টা করুন। পুরাকালে সত্ত্ব ও রজঃগুণ অথবা দুইটী গুণ এক সঙ্গে মানুষে বর্ত্তমান ছিল: কিন্তু বর্ত্তমানযুগে একমাত্র তমঃগুণে লোককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাই উক্ত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও নিজের ভুল দেখিতে পাইতেছেন না; সন্তানাদি বর্ত্তমান থাকিতে ব্রাহ্মণের কুল উজ্জ্বল করিয়া—দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষে, বার্দ্ধক্যে ৮।১০ বৎসরের বালিকার পাণিগ্রহণ করা কি সাত্ত্বিকতার লক্ষণ? তাহা কখনই বলা যায় না। শিখা ও সূত্রগুচ্ছ ও বাকপটুতায় ব্রাহ্মণত্ব নাই। সত্ত্বগুণ থাকা চাই। পরের বেলা মহাপাপ আর নিজের বেলা "মাকড় মারিলে ধোকড় হয়" এতাদৃশ সদ্‌যুক্তি আর এখন খাটে কি? বিধানকর্ত্তা ব্রাহ্মণেরা যদি

দেশকাল বুঝিয়া সাবেক আইন কানুন গুলা সংশোধন বা পরিষ্কার করতঃ একটা ব্যবস্থা স্থাপনপূর্ব্বক বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের মঙ্গল ও উন্নতির চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এ বিষয়ের অবতারণাও প্রয়োজন হইত না। বড় দুঃখেই এই সকল কথা বলিতে হইতেছে। প্রারব্ধ অধ্যায়টী লিখিবার পূর্ব্বেই সংবাদ পাইলাম—এক মালগুদামের হেড বাবু শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পুলিসের দ্বারা হাজতে প্রেরিত হইল! অপরাধ, তিনি সরকারের বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইয়া ২।৩ গাড়ী চিনির মধ্যে বালি মিশাইয়া তাহারই তত্ত্বাবধানস্থ গুদামে রাখিয়াছিলেন এবং সেই বালির পরিমাণ চিনি গোপনে বিক্রয় করিয়া টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়াছেন ইত্যাদি—(১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই তারিখের ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ পত্রিকা দেখুন)—বাবুটী জাতিতে ব্রাহ্মণ, বেতন নাকি ৩০ টাকা!

সচরাচর আমরা দেখিতে পাই,—মানুষের অর্থ বা শিক্ষার অভাব হইলে স্বভাব নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই বাবুটীর কিসের অভাব একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি।

১। ইনি চাতুর্ব্বর্ণ্যের গুরু পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছেন।

২। লেখাপড়াও শিখিয়াছেন, নৈলে একটা আফিসের ইন্‌চার্য্য অর্থাৎ হেডবাবু কিরূপে হইলেন।

৩। বেতন ৩০৲ হইলেও "প্রতিগ্রহের" নামান্তর অনেক উপরি উপায়ও আছে।

৪। ছেলে মানুষও নহেন, বয়স নাকি ৩০।৩৫ বৎসর। ইনি করিলেন কি, না বিশ্বাসঘাতকতা ও চুরি! সে চুরিও যেমন তেমন নহে "পুকুর চুরি"!! ইহা অবশ্যই ব্রাহ্মণোচিত কাজ নহে বলিতে হইবে। ইহাই শূদ্রত্বের পরিচায়ক! পথ-প্রদর্শক ব্রাহ্মণেরাই যদি যজ্ঞসূত্র ধারণের প্রতিজ্ঞা

লঙ্ঘনপূর্ব্বক ঘোর অত্যাচার ও ব্যভিচার আরম্ভ করেন, তাহা হইলে অপর সাধারণ তাঁহাদের আদর্শ কোথায় পাইবেন। বলা বাহুল্য আধুনিক সংবাদপত্রাদিতে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে যত পাপ ও গুরুতর অভিযোগ দেখা যায়, দীন, দরিদ্র ও অশিক্ষিত হইলেও অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষতঃ নাপিত সমাজে তত দৃষ্ট হয় না। যে কোন সপ্তাহের সংবাদ পত্রাদি মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলেই এ কথার সারবত্তা উপলব্ধি হইবে। চৌর্য্যাদি অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত দাগীর সংখ্যায় মুসলমানের নিম্নেই প্রায় ব্রাহ্মণের স্থান দাঁড়াইয়াছে (সরকারী মানুষ গণনার রিপোর্ট দেখুন)। যাহা হউক, ঐরূপ গুণবীর্য্য-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের ঔরসে কি সাত্ত্বিক ভাবের জলন্তমূর্ত্তি, ব্রহ্ম-ধারণা-ক্ষম ব্রাহ্মণ জন্মিতে পারে? না, কখনই না। তাহা হইলে যে ঈশ্বরের মহিমা ও বাক্যের কোন মূল্যই থাকে না। সত্বগুণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণেই ব্রাহ্মণোৎপাদন করিবে। ব্রহ্মতেজ সমন্বিত হইলে ক্ষেত্র যেরূপই হউক না কেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ জন্মিবেই। অন্যথা ধীবর কন্যার গর্ভে বেদবিভাগকর্ত্তা ব্যাসদেবের উৎপত্তি অসম্ভব হইয়া পড়িত! ক্ষেত্রাপেক্ষা বীর্য্যের প্রাধান্য এতই অধিক যে মহর্ষি মনু বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন সন্তানকে পিতার সদৃশ বলিয়াছেন, কিন্তু শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তানকে একেবারে অস্পৃশ্য, নরাধম চণ্ডালের দলভুক্ত করিয়াছেন! অতএব সত্বগুণ-প্রধান পুরুষই ব্রাহ্মণ-পদ-বাচ্য এবং ব্রাহ্মণোৎপাদনে সমর্থ। সত্বগুণবর্জ্জিত, বৃথা সূত্রগুচ্ছগর্ব্বিত ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হইলে শাস্ত্রকারগণ নিম্নোদ্ধৃত-রূপ অযাচিত ভূরি ভূরি কৈফিয়ৎ কেন দিয়া গিয়াছেন?

মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন—

শূদ্রোঽপিশীলসম্পন্ন গুণবান ব্রাহ্মণোভবেৎ।
ব্রাহ্মণোপি ক্রীয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যবরো ভবেৎ॥

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

নবৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্র ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণঃ নচ।
যত্রৈতৎ লক্ষতে সর্প! বৃত্তং স ব্রাহ্মণ স্মৃতঃ।
যত্র তন্ন ভবেৎ সর্প তম্ শূদ্রমিতি নির্দ্দেশেৎ॥

অর্থ—শূদ্র হইলেই শূদ্র হয় না, আর ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হয় না, বৃত্ত অর্থাৎ সদাচার ও সৎবৃত্তি যাহাতে দেখিবে তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ জানিও, যাহাতে তাহা নাই তাহাকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিবে।

আবার পতিত পাবনাবতার মহাপ্রভু চৈতন্য-দেবও বলিয়া গিয়াছেন—
"মুচিও হয় শুচি যদি কৃষ্ণ ভজে।" অপিচ————

"চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ॥

হরিভক্তি পরায়ণ চণ্ডালও দ্বিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া হরিভক্তি হীন হইলে তিনিও চণ্ডালাপেক্ষা অধম বলিয়া গণ্য।

হরি-পরায়ণ ব্রাহ্মণ আজকাল কজন আছেন? আর মহাপ্রভুর প্রধান অবলম্বন যে হরি-সংকীর্ত্তন, যে হরিসংকীর্ত্তন দ্বারা তিনি হিন্দু সমাজে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সাম্য, মৈত্রী ও ভগবদ্ভক্তি রক্ষার জন্য আজীবন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজিও যে কীর্ত্তনের তরঙ্গাঘাতে সমগ্র বাঙ্গলাদেশ মুখরিত ও আন্দোলিত রহিয়াছে, সেই হরিসংকীর্ত্তনে নিম্ন শ্রেণীর কৃষ্ণের জীব ব্যতীত কজন ব্রাহ্মণ যোগদান করিয়া থাকেন, কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? পরন্তু ভগবানের উদ্দেশ্য পাছে সাধারণে বুঝিতে ভুল করে, তাই তিনি রামরূপে গুহক চণ্ডালের সহিত মিত্রতাপাশে বদ্ধ হইয়া মনুষ্য সমাজে সাম্যনীতির একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া দিয়াছেন। জাতি-বিদ্বেষ-দমন-কল্পেই ভগবান ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও গোপ-কুলে কৃষ্ণরূপে প্রতিপালিত ও গো-রাখালগণের সঙ্গে সখ্যতাপাশে বদ্ধ

হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয় পাত্রেরা তাহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না, সকলই স্বায়ম্ভুব মনু সাজিয়া বসিলেন, আর স্বকপোল-কল্পিত 'বর্ণ সঙ্কর' সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি-কর্ত্তার সৃষ্টিছাড়া জাতিভেদের সৃষ্টি করিলেন। ফলে সত্যের অপলাপ করিলে যাহা হয় তাহাই ঘটিতে লাগিল অর্থাৎ এক দোষ ঢাকিবার জন্য আর দোষ করিয়া হিন্দু সমাজকে শতধা বিভক্ত করতঃ জাতি অর্থাৎ Nation টী উড়াইয়া দিয়া কেবল caste লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। পরিণামে অপবিত্র জলও আদর্শ খাদ্য দুগ্ধ বলিয়া অবাধে চলিয়া যাইতে লাগিল। পাঠক, ভাবিয়া দেখুন, দুধে জল মিশান জাতি-ভেদেরই একটী প্রতিফল কি না। যখন গোয়ালা বুঝিল যে দুধে জল মিশাইতে তাহার অধিকার আছে, যেহেতু সে গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আর অন্য জাতিতেও দুগ্ধ বিক্রয় করিতে পারিবে না, কারণ তাহারা বুঝিল "পরধর্ম্ম ভয়াবহ"! তখন গোয়ালা মনে করিয়া লইল, যত জলই মিশাইনা কেন, উহাতে তাহার কোন পাপ নাই। সুতরাং যে কৃষ্ণের বৈভোগ প্রভুরা, "বিনিমূলে" পাইতেন, এখন মূল্য দিয়াও একসের দুধে তিনসের জল পাওয়া তাঁহাদের পক্ষে দুষ্কর। কিন্তু "গরজ বড় বালাই", সেই জন্য অদ্যাবধিও স্বেচ্ছাচার, অত্যাচার ও অবিচার, ধর্ম্মের নামে বিকাইতেছে। জাতিভেদের এই সকল বিষময় ফল এক্ষণে অনেকেই বুঝিয়াছেন, তাই আমরা দেশের অবস্থা ভাবিয়া অনেক সাত্ত্বিক এবং নিরপেক্ষ ব্রাহ্মণকেও অধুনা অনুতাপ করিতে দেখি। ফলতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যভিচার ঘটাইয়া ঈর্ষামূলক বৃত্তি ও বংশগত জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত করার প্রতিফল হাতে হাতেই ফলিয়াছে। কোন বর্ণের স্বকর্ম্মেরও ঠিক নাই, আর "ছুঁওনা ছুঁওনা" রবও নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইতেছে। অধিকন্তু অপরাপর জাতির কার্য্যাকার্য্যের একটী সীমা আছে কিন্তু ব্রাহ্মণের অসাধ্য কোন কাযই নাই এবং তাঁহারা করিতেছেন না

এমন কার্য্যও দেখা যায় না। তবুও তাঁহাদের জাতি যায় না, জাতি যায় তাহাদের—যাহারা ব্রাহ্মণের আশ্রিত, অনুগত ও আজ্ঞাবহ।

পাঠককে বলিয়া রাখি, ব্রাহ্মণের অধঃপতনই নাপিত জাতির শোচনীয় অবস্থার অন্যতম কারণ। জাতীয় জাগরণের এই তুমুল কোলাহলের মধ্যেও নাপিত সমাজ যে কেন জাগিয়া উঠিতেছে না তাহার উত্তর—ব্রাহ্মণের ঐ কঠিন সমস্যা! নাপিত জাতি শূদ্র বা বর্ণ-সঙ্কর নহে। "নয়" কে "হয়" করিতে যাইয়া স্বার্থপর ভণ্ড তপস্বীগণ যে সকল বাক্যজাল বিস্তৃত করিয়াছেন এইবার তাহার কতকাংশ এই খানে প্রদর্শন করিব।

বর্ণ-সঙ্কর কাহাকে বলে ?

বিদ্যাহীন হইয়া বহুদিন অজ্ঞানান্ধকারে থাকিলে মানুষ জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। কলের পুতুলের মত যে যেদিকে লইবে দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই দিকেই যাইবে—এইরূপ অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকিলে, ক্রমশঃ তাহার মনুষ্যত্ব লোপ পায়; সে একরূপ পশুতেই পরিণত হয়। এইরূপে জড়তা, অজ্ঞতা ও অসারতা যখন তাহার অস্থিমজ্জাগত হইয়া যায়, তখন তাহাকে ভাল পরামর্শ বা সহায়তা দিতে গেলেও সে সহজে তাহা গ্রহণ করে না। আমেরিকা হইতে যখন ক্রীতদাসেরব্যবসায় উঠাইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তখন তথাকার ক্রীতদাস সকল প্রথমে কত আপত্তি করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল "কে আমাদের মাষ্টার হইবে"! "কাল্ আমরা কি খাইব" ইত্যাদি। আমাদের দেশে যেরূপ গরু বাছুর কেনা বেচা হয় এবং তাহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয়, ঐ সকল ক্রীতদাসের উপরও সেই রূপ পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হইত। কোন্ বুদ্ধিমান এই অবস্থায় থাকিতে চায়? কিন্তু বহু দিন দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকায় ঐ সকল দাসের এরূপ শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছিল যে যখন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার অর্থাৎ

স্বাধীন করিয়া দিবার জন্য ইংরাজেরা প্রস্তাব করিলেন, তাহারা ভয় পাইয়া নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করিল—আমাদের নাপিত সমাজেও এখন এই অবস্থা। প্রভূদের প্রসাদে আমরা এমনই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি যে আমাদের পূর্ব্বাবস্থা যে ইহাপেক্ষা ভাল ছিল, আর চেষ্টা করিলে যে আবার বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও হইতে পারে, ইহা চিন্তা করিতেও সাহসী নহি, যদি কেহ যুক্তিপূর্ণ উপদেশাদি প্রদান করেন তাহাও উদাসীনতার সহিত উপেক্ষা করি, আর চিরন্তন সিদ্ধান্ত যাহা আছে অর্থাৎ "যেমন আছি তেমনই থাকি, "আমাদের জল ত চল্ আছে, "ঈশ্বর আমাদিগকে নাপিত ক'রে সৃষ্টি করেছেন্ কি করিব"—ইত্যাদি মহৎবাক্য দ্বারা মনকে প্রবোধ দিয়া উপদেষ্টাকে বিদায় দেই। কিন্তু আমাদিগকে যে "আটপ'রে" কাপড়ের মত ব্রাহ্মণাদির মন যোগাইতে হইতেছে, শিক্ষা বা আত্মোন্নতির জন্য আমরা যে কোন সুযোগ বা সহানুভূতি পাই না, তাহা কেহই বুঝি না বা বুঝিবার চেষ্টাও করি না। কোন জাতির উন্নতির পথ বন্ধ করিতে হইলে, অগ্রে তাহাদের শিক্ষার পথ অবরোধ করিতে হয়। ভারতের জাতিভেদ প্রথা তাই অনেকগুলি জাতির শিক্ষার পথ অবরোধ করিয়াছিল। প্রকাশ্যভাবে কেহ বিদ্যা শিক্ষায় বাধা না দিলেও ঐ জাতিভেদের অন্তরালে এমন একটী যন্ত্র আছে, যদ্বারা স্বতঃই লোক নিশ্চেষ্ট ও জড়-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে: আর জাতিভেদের পুষ্টি সাধনার্থেই এই বর্ণ-সাঙ্কর্য্যের সৃষ্টি। এই জন্যই প্রভুরা বর্ণ-সঙ্কর অর্থাৎ "খচ্চর" জাতি তৈয়ারী করিবার জন্য এত ব্যগ্র। সদাশয় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কল্যাণে আজকাল বিদ্যা-শিক্ষার দ্বার সকলের পক্ষেই উন্মুক্ত; তাই এক্ষণে শূদ্র মহাশয়েরা বড় টের পাইতেছেন না কিন্তু—

"হিন্দু রাজা থাকিলে,
ধরিয়া দিত শূলে"

মনুর আইন কানুনগুলা আর একবার ভাবুন, আর বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির ক্রমটাও একবার দেখুন—

ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ

(বিবিধ জাতির উৎপত্তি।)

ক্ষত্র হতে বৈশ্যাগর্ভে কৈবর্ত্ত উৎপত্তি।
জাতি মালা শুনহ সৌনক মহামতি ॥
কৈবর্ত্তদিগের মধ্যে কেহ কলিযুগে।
পতিত হইয়া পড়ে তীবর সংসর্গে ॥
ধীবর নামেতে তাদের হইল খেয়াতি !
ধীবরের ঔরসেতে রজক উৎপত্তি ॥
তীবর কন্যার গর্ভে আছয়ে প্রচার।
অতঃপর অন্য জাতির শুন সমাচার ॥
তীবর হইতে রজকিনীর উদরে।
জন্মিলে যে জাতি সে কোয়ালি নাম ধরে ॥
নাপিতের ঔরসেতে গোপিনী তখন।
সর্ব্বস্বী নামেতে জাতি প্রসবিত হন ॥
সর্ব্বস্বী ভার্য্যাতে আর ক্ষত্রের বীর্য্যেতে।
ব্যাধ জন্মিল কহি পুরাণের মতে ॥
ঋতুর পূর্ব্বদিনে জনৈক কামিনী।
ক্ষত্রবীর্য্যে গর্ভবতী হইল শূদ্রানী ;
কতকগুলি ম্লেচ্ছ জাতি জন্মে সে উদরে।
ম্লেচ্ছ হতে কুবিন্দ কামিনী গর্ভ ধরে ॥
কুবিন্দ অর্থাৎ তাঁতি রমণী তখন।
জোলা নামে জাতি এক প্রসবিতা হন ॥

গুরুপুত্র হন সহোদরের সমান।
ভগিনী সমান গুরু কন্যা মতিমান॥
মাতার সমান গুরু কন্যা পূজনীয়া।
রঘু কহে শ্রোতাদের পদধূলি নিয়া॥
পুত্র ও কন্যার গুরু অথবা শ্বশুর।
ভ্রাতার সমান হন শুনহ ভূসুর॥
ভ্রাতৃগুরু ও ভ্রাতার শ্বশুরের প্রতি।
নিজ গুরু শ্বশুরের মত কর প্রীতি॥
মিত্রের জননী আর মিত্রের ভার্য্যারে।
মাতৃতুল্য জ্ঞান কর শাস্ত্র অনুসারে॥
বন্ধুর জনক আর বন্ধুর ভ্রাতাকে।
নিজ পিতা নিজ ভ্রাতা মত দেখে লোকে॥
ন মাতা ন পিতা ভ্রাতা আমি যে অধম।
অনাথ বালকে কৃপা কর সাধুজন॥
শ্রোতা পাঠকের পদ করিয়া বন্দন।
শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি মাগে শ্রীরঘুনন্দন॥

পাঠক, "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" কখনও শুনেছেন? এই শুনুন।—উপাখ্যানের গোড়ায় হইল ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি আর শেষে হইল তাহাদিগের স্তুতি ও মিনতি! যাহাহউক এই সকল পুঁথি বা শাস্ত্র পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায় যে গ্রন্থকর্ত্তার মনে যখন যে জাতিটীর নাম উদয় হইয়াছে, অমনি তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের শ্রাদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে! আবার তাহা দ্বারা অন্য একটী নূতন জাতির সৃষ্টি করা আবশ্যক বোধ হইয়াছে। ফলে "জোলাও বাদ পড়ে নাই, জোলা ত মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী! যে ব্যাসদেব এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার

সময়ে বাঙ্গলাভাষাও প্রচলিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। 'জোলা' শব্দটী সংস্কৃত ভাষায় দেখা যায় না, উহা নিরঙ্কুশ আধুনিক যাবনিকভাষা, সুতরাং জোলা জাতির উৎপত্তি সংস্কৃত ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে ব্যাসদেব কর্ত্তৃক বর্ণিত হওয়া কি কখনও সম্ভব? এইরূপ কত দোষ যে ঘটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আরও ২।১টী যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিব। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণের ঐ অংশটুকু উদ্ধৃত করার আরও একটু উদ্দেশ্য আছে। পাঠক বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে, যে জাতিটীর বিষয় বর্ণনা করা শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য হইয়াছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সেই উৎপন্ন জাতি হইতে আবার আর একটী জাতির সৃষ্টি করিয়া ক্রমান্বয়ে অপরাপর জাতির পিতামাতার নামোল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু নাপিত কিরূপে কাহাদ্বারা জন্মিল তাহা মূল পুস্তকেও নাই, রঘুনন্দনের উল্লিখিত উক্তিতেও নাই। অথচ নাপিতের দ্বারা গোপিনীর গর্ভে সর্ব্বস্বী জাতির উৎপত্তি—ইহা প্রকাশ আছে। এক্ষণে কথা হইতেছে যে পুরাণাদিতে যে সকল জাতির উল্লেখ আছে, তাহা ছাড়াও ত অনেক সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইতে পারে; স্ত্রী পুরুষের সহবাসে সন্তান হওয়া যখন অসম্ভব নহে, তখন এখনও ত বর্ণ-সঙ্কর জন্মিতেছে অর্থাৎ একজাতীয় পুরুষ অপর জাতীয় স্ত্রীর সহিত বৈধ বা অবৈধ প্রণয়দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিতেছে। নাপিতের ঔরসে গোপিনীর গর্ভে সর্ব্বস্বী নামক জাতির উৎপত্তি হইয়াছে বুঝা গিয়াছে, কিন্তু নাপিতের ঔরসে গোপিনী ছাড়া অপরাপর জাতির স্ত্রীতেও ত বর্ণসঙ্কর উৎপত্তি হইতে পারে? তাহাদের নাম করণ করিতেছে কে? অবশ্য নামকরণ আর হইতেছে না। কারণ হিন্দুরাজত্ব বা ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব আর সেকালের মত নাই! মনে ভাবিয়াছিলাম শাস্ত্রকারেরা বোধ হয় এইটুকু ফাঁক রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মনুর কি অব্যর্থ সন্ধান! তিনি বলিয়া রাখিয়াছেন বর্ণসংকর হইবেই! কারণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ছাড়া আর জাতি নাই—"নাস্তি তু পঞ্চমো"! আর

বর্ণসঙ্কর বা শূদ্র হইলেই তিনি যেন 'চোরাচার্য্যের' আসামী বা মার্কামারা দাগী হইলেন সুতরাং দেশের রাজা বা ব্রাহ্মণেরা যখন ইচ্ছা শূদ্রদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে পারিবেন, কেননা মনুর পিনাল কোডের (Penal Code) ১ আইনের ১০০ এবং ১০১ ধারায় বলিতেছে—

সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতং।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি ॥ ১০০ ॥
স্বমেব ব্রাহ্মণ ভুংক্তেস্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যা দ্ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরেজনা ॥ ১০১ ॥

যেহেতু

ত্রিজগতের সমুদায় ধনই ব্রাহ্মণের নিজস্ব। সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট স্থান জাত বলিয়া ব্রাহ্মণই সমুদয় সম্পত্তি পাইবার যোগ্য পাত্র। ব্রাহ্মণ যাহা ভোজন করেন, যাহা দান করেন, তাহা পরের হইলেও নিজস্ব। কেননা ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ বলে অপরাপর লোকে ভোজন-পানাদি দ্বারা জীবিত আছে!

মিথ্যা শূদ্র জীবনের এই সকল অযথা বিড়ম্বনা পরিহার মানসেই আজ ভারতময় আন্দোলন ও বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে।

আবার Evidence Atc এর ৮ আইনের ৪১৭ ধারাতে বলিয়াছেন—

বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ।
নহি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্যঃ ধনোহি সঃ ॥

শূদ্র যদি কোন ধন উপার্জ্জন করেন ব্রাহ্মণে অসঙ্কোচে তাহা আত্মসাৎ করিতে পারেন, যেহেতু দাসের নিজস্ব কিছুই নহে। উহা তাহার প্রভুর।

শূদ্র বলিয়া অব্যাহতি দিলেও হয়ত অনেকে বাদানুবাদ করিত না, কিন্তু আবার বর্ণসঙ্কর, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য প্রভৃতি পরুষ ভাষার অযথা প্রয়োগ ও তদনুসারে অনেক নির্য্যাতনও আমরা সদা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। শূদ্র

নামধারী জীবগুলাকে যতদূর হেয় করিতে পারা যায় তাহাই করিয়া কর্ত্তারা যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। কাহারও বিশ্বাস না হয় কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে (অবশ্য যিনি আমার এই অসার পুস্তক পড়েন নাই) নাপিতের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া দেখিবেন। তিনি যদি কিছু জানেন ত বলিবেন—

"কুবেরিণ পট্টিকার্য্যং নাপিতঃ সমজায়তঃ অর্থাৎ কুবেরী পিতা আর পট্টিকারী মাতা হইতে নাপিতের উৎপত্তি। আর যে ৩।৪টী প্রমাণ আছে, সেগুলিও তাঁহাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষের কৃত হইলেও পারতপক্ষে আপনাকে তাহা বলিবেন না। ইহাতে বুঝা যায় যে ক্রমশঃই নাপিত জাতিকে অধঃপাতে দিবার বেশ চেষ্টা চলিতেছে, তাই অভিধানে, আদম সুমারীর রিপোর্টে ও জাতিবিষয়ক পুস্তকাদিতেও ঐ মতটাই সাদরে গৃহীত হইয়াছে।

পাঠক, এইবার বর্ণসঙ্কর শব্দের অর্থ ও উৎপত্তির কারণ কি তদসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক—সাধারণতঃ সকলেই বোধ করেন যে ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের কোন এক পুরুষের সহিত অপর বর্ণের স্ত্রীর সংযোগে কোন সন্তান জন্মিলেই সে বর্ণ-সঙ্কর হইবে, কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণাটী ঠিক নহে। প্রথমে দেখা যাউক বর্ণসঙ্কর শব্দের অর্থ কি।

সঙ্কর শব্দের অর্থ (সম—কৃ+অল্, ঘে) পুং,=সর্ম্মার্জ্জনী উৎক্ষিপ্ত ধূলাদি। তৎপর্য্যায়—অবকর=ইত্যমর। অগ্নি চটৎকারঃ ইতি মেদিনী। সমার্জ্জনী অর্থাৎ খেঙরা বা ঝাঁটাদ্বারা ঝাঁট দিলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া যে ধুলি পুঞ্জীকৃত হয় অথবা আগুন জ্বালিলে যে চট চট শব্দ হয় উহার নাম সঙ্কর। (শব্দ কল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে "বর্ণ-সঙ্কর" শব্দের অর্থ হইল "বর্ণেষু সঙ্কর ইব" অর্থাৎ বর্ণের (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের) মধ্যে যাহারা সঙ্কর অর্থাৎ সমার্জ্জনীদ্বারা পুঞ্জীকৃত তৃণাদির ন্যায়। যেমন খেঙরা দ্বারা

ঝাট দিলে কতকগুলি অকেজো খড়কুটা ধুলামাটী এক জায়গায় জড় হয়, সেইরূপ হিন্দুসমাজে যাহারা উপেক্ষিত এবং নিকৃষ্ট তাহাদিগকেই বর্ণসঙ্কর বলে। এই জন্যই মহর্ষি মনু বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির তিনটী কারণ দেখাইয়াছেন যথা—

ব্যভিচারেণ বর্ণানা মবেদ্য বেদনেন চ।
স্বকর্ম্মনাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণ-সঙ্করাঃ॥

(১০—১৪ শ্লোক)

অর্থাৎ ব্যভিচার, অবেদ্যাবেদন এবং স্বকর্ম্মত্যাগে বর্ণসঙ্কর জন্মে। আর একটু খোলসা করিয়া না বলিলে উক্ত শ্লোকটীর উদ্দেশ্য সহজে সকলে বুঝিতে পারিবেন না।

১। ব্যভিচারে অর্থাৎ একের স্ত্রীতে অন্যের অবৈধ গমনে যে সন্তান জন্মিবে সে বর্ণসঙ্কর হইবে! এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীতে অবৈধভাবে যদি অন্য ব্রাহ্মণেও সন্তান উৎপাদন করেন, সেও বর্ণ-সঙ্কর। এইখানে একবর্ণেই বর্ণসঙ্কর উৎপত্তি হইল। ঐরূপে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রেও একবর্ণেই বর্ণসঙ্কর হইতে পারে; বলাৎকার বা অবৈধ প্রণয়-সম্ভূত সন্তানই বর্ণসঙ্কর—সবর্ণে হউক আর অসবর্ণেই হউক।

২। অবেদ্য বেদন দ্বারাও বর্ণ সঙ্কর হয়। বেদ্যা শব্দের অর্থ বেদনীয়া বা বিবাহ্যা, অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে যাহাকে বিবাহ করা যায়। আর অবেদ্যা অর্থে যে বিবাহের অযোগ্যা অর্থাৎ যাহাকে বিবাহ করা নিষেধ আছে; যেমন স্বীয় ভগ্নী, পিসতুত, মাসতুত, বা মামাত ভগ্নী; আবার অপরের বিধবা স্ত্রীকেও বুঝাইতে পারে। এই অবিবাহ্য স্ত্রীতে যদি কেহ সন্তান উৎপাদন করেন, সেই সন্তানও বর্ণসঙ্কর হইবে। এই জন্যই সগোত্রে এবং সপিণ্ডে বিবাহ নিষেধ।

এইখানে দেখুন পূর্ব্বকালে যখন অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল

অর্থাৎ যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যে পরস্পর বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন যদি ক নামক কোন ব্রাহ্মণ খ নাম্নী কোন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করিত এবং তাহাদের সংযোগে গ নামক সন্তান জন্মিত তবে গ বর্ণ-সঙ্কর হইত না, কারণ ক শাস্ত্র-বিধান মতে খকে বিবাহ করিয়াছিল, এবং সে (গ) ব্যভিচার-জাত নহে। এই খানে দেখা গেল পৃথক পৃথক দুই বর্ণের মিশ্রণেও বর্ণ-সঙ্কর হয় না। পক্ষান্তরে খুড়াত, জেঠাত, মামাত, পিসাত বা মাসতাত ভগ্নীকে বা অপরের বিবাহিত স্ত্রীকে ঢাক, ঢোল বাজাইয়া বিবাহ করিলেও সেই স্ত্রীতে জাত সন্তান বর্ণ-সঙ্কর হইবে। এই জন্য অনুলোমজ সন্তান নিকৃষ্ট অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় নহে। ইহারা অপসদ অর্থাৎ সবর্ণজ সন্তান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন বা হেয়। আর প্রতিলোমজ সন্তান অপধ্বংশজ বা বর্ণ-সঙ্কর পদবাচ্য। উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্ন বর্ণের স্ত্রীকে বিবাহ করিলে তাহাতে যে সন্তান জন্মে, তাহাকে অনুলোমজ বলে আর নিম্ন বর্ণ অর্থাৎ শূদ্রাদি যদি উচ্চ বর্ণের (ব্রাহ্মণাদির) কন্যাকে বিবাহ করিয়াও কোন সন্তান উৎপাদন করে তবে সে প্রতিলোমজ সন্তান হইবে। পুরাকালে যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই—মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

> শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
> তেচ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তশ্চ স্বা চা গ্রজন্মনঃ॥ ৩অ—১৩॥

শূদ্রাই কেবল শূদ্রের ভার্য্যা হইবে। বৈশ্য—বৈশ্য ও শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারিবে। ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়া৷ বৈশ্যা, ও শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারে; এবং ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চারি বর্ণের স্ত্রীলোককেই বিবাহ করিতে পারিবেন।

মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—

আনুলোম্যেন বর্ণাণাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণ-সঙ্করঃ ॥

অনুলোম বিবাহে উৎপন্ন সন্তান বিধি মতে শ্রেষ্ঠ। আর প্রতিলোম বিবাহে উৎপন্ন সন্তাকেই বর্ণ-সঙ্কর বলে। অতএব দুই স্বতন্ত্র বর্ণের সংযোগই বর্ণ-সাঙ্কর্য্যের নিদান নহে।

৩। "স্বকর্ম্ম-ত্যাগে" বর্ণ-সঙ্কর হইয়া থাকে, ইহার অর্থ কি? মনু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যে সকল কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন তাহা ত্যাগপূর্ব্বক অন্য বর্ণের কর্ম্ম অবলম্বন করিলে উক্ত চারি বর্ণের যে কোন ব্যক্তিকে বর্ণ-সঙ্কর বলে। ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ছয়টী—যাজন, যজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহণ। এই ছয়টী ত্যাগ করিয়া অন্য উপায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে ব্রাহ্মণও বর্ণ-সঙ্কর-পদবাচ্য। ঐরূপে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রও স্বকর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া অন্য বর্ণের কর্ম্ম (বৃত্তি) অবলম্বন করিলে তাহারাও বর্ণ-সঙ্কর হইবেন। পাঠক, এইবার বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে স্বায়ম্ভুব মনু কে! "নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ" করে কখন? না জিদের বালাই লইয়া মরণ আসে যখন! এই জন্যই জাতিভেদপ্রিয় কলির বামুনেরা উপরি-স্থিত শ্লোকের "স্বকর্ম্ম" শব্দের অর্থ লাগাইয়াছেন "জাতকর্ম্ম উপনয়নাদি সংস্কার!"—যে সকল কর্ম্ম প্রায়শঃ মানবকের (নাবালকের) পিতা মাতা এবং নাপিতের দ্বারাই প্রকৃত প্রস্তাবে সংসাধিত হইয়া থাকে। পাঠক বোধহয় অবগত আছেন যে জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহাদি হিন্দুর দশবিধ বৈদিক অনুষ্ঠানকেই সংস্কার বলে। এই সকল সংস্কারের কোন একটী ত্যাগ করিলে যদি বর্ণ-সঙ্কর হয়, তাহা হইলে পুরাকালে যে সকল মুনি-ঋষি বিবাহ সংস্কার না করিয়া আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া পৃথিবীতে আর্য্যগৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও বর্ণ-সঙ্কর! আর কত বলিব। (মনু ১০ অধ্যায় ৭৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

নাপিতের সাঙ্কর্য্য-খণ্ডন।

দেব-গুরু বৃহস্পতি বলিয়াছেন—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্য-বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া কোন কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করা-উচিত নহে, যেহেতু যুক্তিহীন বিচার দ্বারা ধর্ম্মহানি হইতে পারে। অতএব আমাদিগকেও যুক্তির আশ্রয় লইতে হইবে, এবং নাপিতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা যে কয়টী প্রমাণ পাইয়াছি উহার কোন্‌টী যুক্তি-সঙ্গত ও প্রমাণ-সহ দেখিতে হইবে।—

১। আধুনিক পরাশর-সংহিতা বলিতেছেন,—

শূদ্রকন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেনতু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃততস্তু ভবেদ্দাসো হ্যসংস্কারেতু নাপিতঃ॥

অর্থ—ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত সন্তান সংস্কৃত অর্থাৎ জাতকর্ম্ম চূড়াকরণাদি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বৈদিক সংস্কার প্রাপ্ত হইলে সে "দাস" হয়, আর উক্ত সংস্কারাদি না হইলে সে "নাপিত" হয়! আচ্ছা বেশ, দাস বলিলে কোন জাতিকে বুঝায়? পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে "দাস" বলিয়া কোন জাতি নাই, অন্যের দাসত্ব করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহারাই দাস। মীমাংসা স্থলে "কৈবর্ত্তো দাসো ধীবরে" স্বীকার করিলেও সংস্কার-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ-পুত্র দাসমহাশয় নাপিত অপেক্ষাও হেয় হইলেন নাকি? সুতরাং এ সংস্কার না প্রাপ্ত হইলেই ভাল ছিল। কারণ নাপিতের অবস্থা হীন হইলেও অদ্যাবধি নাপিতের জল হিন্দু সমাজে সর্ব্বত্র সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে কিন্তু কৈবর্ত্ত বা ধীবরের জল সর্ব্বত্র চলে না। তাহাদের পুরোহিতও স্বতন্ত্র। তাঁহারাও এই প্রমাণ স্বীকার করেন না।

পক্ষান্তরে মনুর মতে এইরূপ সন্তানকে নিষাদ বা পারশব কহে। নিষাদকে অনেকে চণ্ডাল মনে করেন, কিন্তু মনু শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তানকে চণ্ডালাখ্যা দিয়াছেন। পারশবজাতির উৎপত্তি ঠিক ইহার বিপরীত, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে পারশব বা নিষাদের উৎপত্তি। (১০ম অধ্যায় ৮ম শ্লোক দ্রষ্টব্য)। পারশব অনুলোমজ আর চণ্ডাল প্রতিলোমজ সন্তান। যাহা হউক মনু এই নিষাদের বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—মৎস্য-মারণ যথা "মৎস্য ঘাতো নিষাদানাং"—১০অ—৪৮। কিন্তু নাপিতের বৃত্তি মৎস্য-মারণও নহে। কাজেই পরাশর সংহিতার মতটী মনুর স্মৃতির সহিত মিলিতেছে না—সুতরাং ইহা যুক্তি-সিদ্ধ নহে। কারণ বৃহস্পতি বলিয়াছেন "মন্বর্থা বিপরীতা যা সা স্মৃতি ন প্রশস্যতে।" অর্থাৎ যে স্মৃতিতে মনু-সংহিতার বিপরীত মত আছে, তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য নহে। অতএব পরাশর সংহিতার উক্ত মত টিকিল না।

২। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ বলিতেছেন—"ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্র কন্যায়াং জাতৌ নাপিত-মোদকৌ।"—ক্ষত্রিয় দ্বারা শূদ্র কন্যার গর্ভে নাপিত এবং মোদক জন্মিয়াছে। মন্দ নয়—একই পিতা মাতার সন্তান ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় (বৃত্তি) প্রাপ্ত হইয়াছে! আচ্ছা—মোদকটা কে দেখা যাউক ; মোদকের প্রতি শব্দ মধুনাপিত (ময়রা ইতি ভাষা) "গুড় কর্ম্মনি" গুড়-দ্রব্য-নির্ম্মাণ ইহাদের কার্য্য। (ব্যবস্থা-দর্পণ দ্রষ্টব্য)।

"সম্বন্ধ নির্ণয়ে" "স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিয়াছে "প্রকৃত পক্ষে মোদক কুরি নহে, ইহাদিগের উপাধি মধুনাপিত। মধু-নাপিতের বৃত্তান্ত চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবতে আছে, সুতরাং এই জাতি চারিশত বৎসর মাত্র নাপিত হইতে পৃথক জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে নাপিত ও মধু-নাপিত পৃথক পৃথক জাতি বলিয়া গণ্য।"

বাবু গোবিন্দ চন্দ্র বসাক (B. A B L) মূন্সেফ তৎপ্রণীত "জাতিমালা"

গ্রন্থে বলিয়াছেন—মধু-নাপিত (ময়রা) তিন শত বৎসর মাত্র নাপিত হইতে পৃথক জাতি বলিয়া পরিগণিত।

মধু-নাপিত উৎপত্তির কাল নির্ণয় বিষয়ে উপর্যুক্ত গ্রন্থ-কর্ত্তাদের মধ্যে একটু মতদ্বৈধ দেখা যাইতেছে। আমরা চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি,। আটচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারি। চোদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ! চৌদ্দশত ছাপ্পান্নে প্রভুর অন্তর্ধান॥" যখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তখন যদি বয়স ২৪ বৎসর হয়, তাহা হইলে মধু-নাপিতের উৎপত্তির কাল (বর্ত্তমান ১৯১১ খৃঃ অঃ) যে ৪০৩ বৎসর মাত্র তাহা অনায়াসে নির্ণয় করা যায়, কারণ এক্ষণে শকাব্দ ১৮৩৪ আর প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ১৪০৭ শকে, সুতরাং (১৪০৭ + ২৪) বৎসর অর্থাৎ ১৪৩১ শকেই মধু নাপিতের উৎপত্তির কাল। তাহা হইলে ১৮৩৪—১৪৩১ অর্থাৎ ৪০৩ বৎসর মধ্যেই মধু-নাপিতের উৎপত্তি এবং বিস্তৃতি! চৈতন্য দেবের সন্ন্যাস-গ্রহণ কালে যে নাপিত তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিল তাঁহারই বংশ নাপিত হইতে প্রমোসন পাইয়া মোদক নামে আর একটী জাতির সৃষ্টি করিয়াছে, যে হস্ত ভগবানের মস্তক এবং পদস্পর্শ করিয়াছে সেই হস্ত আবার পাপ-তাপ-জড়িত-কলি-কলুষিত অপর লোকের পদ স্পর্শ করিলে প্রভুর মহিমা ও উদ্দেশ্য কলঙ্কিত হইবে বলিয়াই নাকি তিনি নাপিতকে ব্যবসান্তর গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন, তাই মধু নাপিতের অর্থাৎ ময়রার সৃষ্টি। যাহা হউক নাপিত ও মধু-নাপিত তাহা হইলে মূলে একই পিতা মাতা হইতে সমদ্ভূত এবং ৪০৩ বৎসর পুর্ব্বে মধু নাপিতের অস্তিত্ব বাঙ্গালা দেশে ছিল না—ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল। তাহা হইলে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ খানা কি এই ৪০৩ বৎসরের মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে নিশ্চয়ই ব্যাসদেবকে স্বর্গ হইতে, নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরেও তাঁহার ঐ পুরাণ খানা ছাপাইবার জন্য অনেকবার

যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কৈ তাঁহার গমনাগমনের ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে "ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং জাতৌ নাপিত-মোদকৌ" কি করিয়া ছাপান হইল? পক্ষান্তরে মনু বলিতেছেন।—

ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্র কন্যায়াং ক্রূরাচার-বিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তু রুগ্রো নামো প্রজায়তে॥

ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রাতে উৎপন্ন সন্তান উগ্র অর্থাৎ আগুরী নামে খ্যাত, পিতা (ক্ষত্রিয়) মাতার (শূদ্রার) স্বভাবানুসারে ইহারা অতি ক্রূরচেষ্ট ও ক্রূরকর্ম্মা হইয়া থাকে।

পাঠক দেখুন কোথায় আগুরী আর কোথায় নাপিত! এইখানে স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ উপস্থিত হইল। এরূপ স্থলে স্মৃতির মতই শাস্ত্রানুসারে বলবান্ সুতরাং গ্রহণীয়। যেহেতু।—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রুতিঃ প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতি বরা॥

অর্থাৎ বেদ, সংহিতা ও পুরাণে বিরোধ ঘটিলে শ্রুতির (বেদের) প্রমাণই শ্রেষ্ঠ, আর স্মৃতি (সংহিতা) ও পুরাণে মতদ্বৈধ হইলে সংহিতার মতই বলবান এবং গ্রহণীয়। অতএব "মন্বর্থ বিপরীত" বলিয়া বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের এই মতও গ্রাহ্য নহে। বিশেষতঃ এই বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ একই মহাত্মার (ব্যাসদেবের) কৃত। যদি ব্যাসদেব বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে নাপিতের পিতামাতার উল্লেখ করিয়া থাকেন তবে ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণেও ঐ মত উল্লেখ করিতেন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ অপেক্ষা ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ প্রাচীন এবং তাহার গৌরবও অধিক। কিন্তু ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত ও ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের দ্বারা প্রকাশিত ৪।৫ খানা ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণ দেখিয়াছি, কোন পুস্তকেও নাপিতের উৎপত্তির বিষয় দেখিতে পাই নাই। পরন্তু নাপিত হইতে গোপিনীর গর্ভে সর্ব্বস্বী জাতির

উৎপত্তি এইমাত্র পাওয়া যায়। ব্যাসদেবের ৫ম বেদ মহাভারতেও (মনু-সংহিতার ন্যায়) নাপিতের স্বতন্ত্র উৎপত্তির কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ক্ষত্রিয় দ্বারা শূদ্র কন্যাতে নাপিতের উৎপত্তি—ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা অথবা কপট-কল্পনা।

৩। অতঃপর ঔশনস্ ধর্ম্মশাস্ত্রের মত—

বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চোর্য্যাৎ—ইত্যাদি

(এই পুস্তকের ৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বিপ্র ও বৈশ্যার অবৈধ প্রণয়ে কুম্ভকার, নাপিত ও কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া ঔশনস্ ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। একই ক্ষেত্রে তিনটী জল আচরণীয় জাতি জন্মিল, অথচ অবৈধ-প্রণয়ে! (ক) কেন, অবৈধ প্রণয়ে পিতা বা মাতার জাতি নষ্ট হইল না? তিনটী সন্তান ত একদিন ভুমিষ্ঠ হয় নাই, জাতির যখন সৃষ্টি হইল, তখন জাতি মারিবারও পদ্ধতি হইয়াছিল। সুতরাং কুলটার গর্ভসম্ভূত সন্তান কয়টী হিন্দুসমাজে অচল হওয়া উচিত ছিল! তাহা হয় নাই কেন?

(খ) পুরাকালে যখন গন্ধর্ব্ব-বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং একবর্ণ অপর এক বর্ণের কন্যাকে অবাধে বিবাহ করিতে পারিত, তখন ঐ ব্রাহ্মণ-সন্তান চুরি করিয়া কেন এরূপ পাপাভিনয় করিল কেহ বলিতে পারেন?

(গ) ঊশনা অতি প্রাচীন শাস্ত্র বলিয়াই আমরা মনে জানি। উক্ত শ্লোকটীর গোড়াতেই "বৈশ্যায়াং" রহিয়াছে, সুতরাং বৈশ্যের স্ত্রীকেই বুঝাইতেছে, কোন কোন পুস্তকে আবার "শূদ্রায়াংও" দৃষ্ট হয়। যাহা হউক উভয়তই বৈশ্য বা শূদ্রের পরিণীতা স্ত্রীকে বুঝাইতেছে,— অবিবাহিতা কন্যাকে বা বিধবাকে বুঝাইতেছে না। এখনকার কালের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সত্যাদি যুগের ব্রাহ্মণ চরিত্র অনেকাংশে ভালই ছিল,

ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না, তখন ধর্ম্মভাব অক্ষুন্ন ছিল, এবং গুণকর্ম্মের অপকর্ষ ঘটিলে ব্রাহ্মণকেও ব্রহ্মণত্ব হইতে খারিজ করিবার নিয়ম ছিল, সুতরাং সেই ধর্ম্মযুগে একজন ব্রাহ্মণ একজন বৈশ্যের স্ত্রীকে চুরি করিয়া ক্রমাগত তাহার গর্ভে তিনটী সন্তান উৎপাদন করিল এবং তাহাদিগকে আবার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত করিল ইহা কি কখনও সম্ভব! ইহা আলোচনা করিতেও ঘৃণা বোধ হয়।

(ঘ) মনুর মতে—"ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াং অম্বষ্ঠঃ নাম জায়তে" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্য-কন্যাতে অম্বষ্ঠ জাতির জন্ম, তবে সেটা বৈধ বিবাহ-সিদ্ধ। আবার ঐ ক্ষেত্রের তৃতীয় পুত্রটীকে কায়স্থ বলা হইয়াছে। কায়স্থেরা আবার এক্ষণে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছেন, সুতরাং নাপিত, কুমারও ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতে পারে! তাহা হইলে কিন্তু বাহুজঃ-প্রকোপে জগৎ উল্টাইয়া যাইবে। ফলতঃ ইহা সর্ব্বৈব অবিশ্বাস্য সুতরাং অগ্রাহ্য।

বৈদ্য (অম্বষ্ঠ) ও কায়স্থে প্রায় শত বর্ষ ধরিয়া বাদানুবাদ চলিতেছে, আমার বোধ হয় বৈদ্য ও কায়স্থের ঐ সংঘর্ষ ফলেই কুমার; নাপিত আর কায়স্থকে লইয়া এই ত্র্যহস্পর্শ সংঘটিত হইয়াছে। মনুর মতে—অম্বষ্ঠের বৃত্তি চিকিৎসা। আবার নাপিতের বৃত্তি মধ্যেও চিকিৎসা নিহিত। এক্ষণে যে surgery বা অস্ত্র চিকিৎসা সর্ব্ব-বর্ণে অবলম্বন করিয়াছেন ও করিতেছেন উহা পূর্ব্বে নাপিতের একচেটিয়া ছিল। কবিরাজি চিকিৎসাতেও নাপিত পুরাকাল হইতে অম্বষ্ঠের ন্যায় কৃতবিদ্য ছিল। এজন্য নাপিতের আর একটী নাম "বৈদ্য" বা "চন্দ্রবৈদ্য"। এখনও অনেক নাপিত আয়ূর্ব্বেদ মতে শিক্ষিত ও উপাধি প্রাপ্ত হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া থাকেন। আধুনিক কোন লেখক হয়ত নাপিতের সহিত অম্বষ্ঠের এই বৃত্তিগত সাদৃশ্য দেখিয়া চিকিৎসা-বৃত্তিক অম্বষ্ঠের পিতামাতার

স্থলে নাপিতের পিতামাতাকে দাঁড় করিয়া থাকিবেন। যাহাহউক কায়স্থ মহাশয়েরা ইতঃপূর্ব্বেই এই জঘন্য অশ্রাব্য শ্লোকটীর অসারত্ব প্রমাণ করিয়াছেন; সুতরাং এসম্বন্ধে আর অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

৪। পরশুরাম-সংহিতার মত—"কুবেরিণঃ পট্টিকার্য্যং নাপিতো সমজায়তঃ "অর্থাৎ কুবেরী পিতা আর পট্টিকারী মাতা হইতে নাপিতের উৎপত্তি। পাঠক, উপরের যে তিনটী মত দেখিয়াছেন তাহাতে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, কোন শাস্ত্রকারই নাপিতকে একক যেন উৎপন্ন হইতে দেখেন নাই। দাস-নাপিত, মোদক-নাপিত এবং কুমার-নাপিত-কায়স্থ এই তিন রকমের দৃষ্টান্তে বুঝা গিয়াছে যেন নাপিত একলাটী কোন এক পিতা-মাতার সন্তান নহে। অর্থাৎ দাস, মোদক, কুমার অথবা কায়স্থের সঙ্গে উল্লিখিত মতানুসারে একই গর্ভে একই পিতার ঔরসে নাপিতও জন্মিয়াছিল। ঐ সকল জাতিও আবার বিভিন্ন মুনির মতে বিভিন্ন পিতা মাতা হইতে জন্মাইয়াছে, শাস্ত্রে ইহাও দেখা যায়। কাজেই সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক কোন মহাত্মা পরশুরাম-সংহিতা এবং পরাশর-পদ্ধতিতে নাপিতের একটা খাস পিতামাতা সাব্যস্ত করিয়া দিলেন! নাপিতের দুর্ভাগ্যক্রমে সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় আর ভাল জাতি তখন মিলে নাই, অথচ এমন ২টী জাতি চাহি যাহারা অন্য কোন জাতির পিতামাতারূপে কোন শাস্ত্রকার দ্বারা নির্ণীত না হইয়াছেন, তাই তিনি বহু চেষ্টায় অজানা, অচেনা কুবেরী এবং পট্টিকারীকে নাপিতের পিতামাতা সাব্যস্ত করিলেন! কিন্তু মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করা কখনও কি সম্ভব? আজকাল সকলেই বলিতেছেন পরাশর-পদ্ধতির মত মানিতেই হইবে, তাহাতে যখন "কুবেরিণ পট্টিকার্য্যং নাপিতঃ সমজায়ত" —রহিয়াছে এবং অন্যান্য জাতি বিষয়ক গ্রন্থ-লেখকেরাও ঐ মত সমর্থন করিতেছেন তখন ঐটাই ঠিক! কিন্তু পরাশর-সংহিতা বলিয়া যে আর

একখানি স্মৃতি আছে যাহা পরাশর পদ্ধতি অপেক্ষা প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, তাহাতে বলিতেছে "শূদ্র-কন্যা-সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণেন" ইত্যাদি। ৯ম মন্তব্য দেখুন। পাঠক, আপনারা "নানা মুনির নানামত" দেখিয়াছেন, একই মুনির দুই মত কখনও দেখিয়াছেন কি? এই দেখুন—পরাশর-পদ্ধতিও যাঁর, পরাশর-সংহিতাও তাঁর! তবে মত বিভিন্ন!! বলি তপঃসিদ্ধ মহামুনি পরাশর কি এতই কাণ্ডজ্ঞান-বিহীন ছিলেন যে, একই জাতির উৎপত্তি-বিষয় লিখিতে দুই কেতাবে দুই রকম লিখিয়াছেন। ফলতঃ এই শ্লোকটী বিদ্বেষপ্রসূত, কারণ যে পরাশর নবশাখার প্রবর্ত্তক বলিয়া বিদিত এবং যিনি বলিয়াছেন—

"উত্তমাধবে চৈব সুতশ্চোৎপাদিতো যতঃ।
অধমত্বমবাপ্নোতি অধোধোহীনতাং ব্রজেৎ॥—

তিনি কি ঐরূপ যুক্তিহীন অসার পক্ষপাতিত্ব করিতে পারেন? উপরিস্থিত শ্লোকটীর অর্থ—উত্তমে আর অধমে যে জাতি হইবে সে অধমই হইবে আর অধমে অধমে যে জন্মিবে সে হীন বা নীচ জাতি বলিয়া জানিবে। কেহ কেহ বলেন যে পরশুরাম বঙ্গদেশে নবশায়ক (বা নবশাখা) প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন, নবশায়কটা কি, না—

গোপোমালী তথা তৈলী তন্ত্রী বারুজি মোদকো।
কুললাং কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবাশায়কঃ।

অর্থাৎ গোপ, মালী, তিলি, তন্তুবায় (তাঁতি) বারুই, মোদক, কুম্ভকার কর্ম্মকার আর নাপিত এই নয়টী জাতি নবশাখার অন্তর্গত। ইহাদের জল ব্রাহ্মণের আচরনীয় এবং শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ইহাদিগের পৌরহিত্য করিতে পারেন। সম্বন্ধ নির্ণয়ে নবশাখা বিষয়ে এইরূপ বচন দৃষ্ট হয়।—

তিলি, মালী, তামুলী, গোপ, নাপিত, গোছালী।
কামার, কুমার, পুঁটলি,—এই নবশাখাবলি॥

আচ্ছা, নাপিতের পিতামাতাকে অর্থাৎ কুবেরী আর পট্টীকারীকে বাদ দিয়া তাহাদের জারজ সন্তান নাপিতকে নবশাখায় লওয়া হইল কেন? কুবেরীও বর্ণসঙ্কর, আর পট্টিকারীও বর্ণসঙ্কর! তাহারা জল আচরণীয় বলিয়াও কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না। সুতরাং "অধমে অধমে জাত" নাপিতকে জল আচরণীয় সর্ব্বজনমান্য নবশাখার মধ্যে কেন স্থান দেওয়া হইল! বোধ হয় এখনকার কালের মত সূক্ষ্মদর্শী তপঃপরায়ণ শাস্ত্রবেত্তার যোগ্যতা, পরাশর বা পরশুরাম সেই ত্রেতা বা দ্বাপর যুগেও প্রাপ্ত হন নাই! আবার দেখুন পরশুরাম ভগবানের এক অবতার বিশেষ। ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিবার জন্যই তিনি রাম অবতারের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রানুসারে বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির কাল চাতুর্ব্বণ্য প্রতিষ্ঠার বহুকালপরে হইয়াছে। সত্য যুগে ব্রাহ্মণ, ত্রেতায় ক্ষত্রিয়, দ্বাপরে বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"পুরাকৃত যুগে রাজন্ ব্রাহ্মণা বৈ তপস্বিনঃ।
অব্রাহ্মণ স্তদা রাজন্ ন তপস্বী কদাচন॥
তস্মিন যুগে প্রজ্বলিত ব্রহ্মভূতে স্বনাবৃতে।
অমৃতবস্তদা সর্ব্বে জজ্ঞিরে দীর্ঘদর্শিনঃ॥
ততস্ত্রেতা যুগং নাম মানবানম্ স্মৃতাং।
ক্ষত্রিয়া যত্র জায়ন্তে পূর্ব্বেন তপসাঞ্চিত॥"

(রামায়ণ ৭। ৭৪। ১০—১২।

জায়ন্তে ক্ষত্রিয়া বীরা স্ত্রেতায়াং বশবর্ত্তিনঃ।
সর্ব্বে বর্ণাঃ মহারাজ জায়ন্তে দ্বাপরে সতি॥
মহোৎসাহা বীর্যবন্তঃ—পরস্পর জয়ৈষিণঃ।

(মহাভারতঃ ভীষ্মপর্ব্ব ১০ অধ্যায়)

—ইহার পরে বর্ণ-সাঙ্কর্য্য। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ এবং মহাভারতের মতে বেণ

রাজার স্বেচ্ছাচারিতা, না হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলে অসংখ্য নারীর বৈধব্যতা বর্ণ-সঙ্কর উৎপত্তির কারণ হইয়াছিল। এই সকল ব্যাপার পরশুরামের আবির্ভাব এবং অন্তর্ধানের বহুকাল পরে সংঘটিত হইয়াছিল অথচ আমরা ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের চূড়াকরণ, উপনয়নাদি সংস্কার এবং চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসান্তে নাপিত দ্বারা তাঁহার জটামুণ্ডন প্রভৃতি অনেক কার্য্যে নাপিতের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইতেছি। ভগবানের রাম অবতারের পর কৃষ্ণাবতার, তারপর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। তারপরে ত বর্ণ-সঙ্কর সৃষ্টি? পরশুরাম যদি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া থাকেন, তবে তিনি তাঁহার অন্তর্ধানের পূর্ব্বেই তাহা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার অবতার কালে অর্থাৎ দ্বাপর যুগে অথবা রামাবতারের পূর্ব্বে তিনি বর্ণসঙ্কর কুবেরী আর পট্টিকারীকে পাইলেন কিরূপে! আর নাপিতই বা তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন হইল কিরূপে! পক্ষান্তরে চারিবেদ ও বিংশতি সংহিতার অস্তিত্ব মাত্র সকলে স্বীকার করেন। পরশুরাম-সংহিতার অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করিলে সংহিতা-সংখ্যা এক-বিংশতি হইয়া পড়ে। সুতরাং এই পরশুরাম সংহিতাকে আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না (৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন)। অধিকন্তু যে বেণ রাজা দ্বারা বর্ণ-সঙ্করের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার সময়ে কুবেরী ও পট্টিকারী বলিয়া কোন জাতি সৃষ্ট হইতে দেখা যায় না। মূল চারিবর্ণে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রে যে সকল সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল তাহারাই সৎশূদ্র নামে অভিহিত, ইহাদের সংখ্যা বিংশতি মাত্র। যথা—করণ, অম্বষ্ঠ, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, কাংশবণিক, উগ্র ক্ষত্রিয়, রাজপুত, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, দাস, মাগধ, গোপ, নাপিত, মোদক, বারজিবী, সুত, মালাকার, তাম্বুলী, তিলী।

তক্ষা, রজক, স্বর্ণকার, সুবর্ণ-বণিক, আভির, তৈলকার, ধীবর, নট, শাবক, শেখর, জালিক এই ১২ জাতি মধ্যম সঙ্কর বর্ণ।

চণ্ডাল, চর্ম্মকার, হাড়ি, দোলাবাহী ইত্যাদি অধম বা অন্ত্যজ সঙ্কর বর্ণ বলিয়া **বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে** এই ৩৬ জাতির বর্ণনা আছে। ইহার মধ্যে কুবেরী, পট্টিকারী বলিয়া কোন জাতি দেখা যায় না। সুতরাং পরশুরামের ঐ মতটী কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? পাঠক বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে এই কীর্ত্তিটী কলিযুগের কোন শর্ম্মারাম ভিন্ন পরশুরামের কীর্ত্তি হইতেই পারে না। (বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ উত্তরখণ্ড ১৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

আবার দেখুন—"মালাকারং কর্ম্মকার্য্যং পট্টিকারোপ্যভুৎস্মৃতঃ॥"

অস্যার্থ—মালাকার নর কর্ম্মকারের যুবতী
উভয়ের যোগে জন্মে পট্টিকারীজাতি } পট্টিকারী

পটিকারাচ্চ তৈলিকাং কুম্ভকার বভুবতু
পট্টিভার্য্যাং কুম্ভকারাৎ কুবেরী জাতিকস্মৃতঃ॥

অস্যার্থ—তিলি কন্যা পট্টিকারে কুম্ভকার হয়।
পট্টিনারী কুম্ভকারে কুবেরী নির্ণয়॥ } কুবেরী

"কারান্ত" অর্থাৎ কৃধাতু নিষ্পন্ন কতকগুলি জাতি আছে তাহারা কিন্তু বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ যথা—মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, বস্ত্রকার (তন্তুবায় কুবিন্দক) কুম্ভকার, কাষ্টদ্রব্যকার (সুত্রধর) স্বর্ণকার ও চিত্রকার। (ক্ষৌরকার নাই কিন্তু)। আমরা উপরে দেখিলাম "তিলি কন্যা পট্টিকারে কুম্ভকার হয়" তাহা হইলে কুম্ভকার আর বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নয়! পক্ষান্তরে ঘৃতাচী নামক স্বর্গীয়া বেশ্যার গর্ভে বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা উক্ত ৮টি জাতির উৎপত্তি বিষয়ে পুরাণে যেরূপ প্রমাণ দেখান হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতেও লজ্জা এবং ঘৃণার উদ্রেক হয়।* যাহা হউক

* ঘৃতাচী কিছুতেই যখন রাজি হইলেন না, তখন বিশ্বকর্ম্মা কি করিলেন?
ঘৃতাচী বচনং শ্রুত্বা বিশ্বকর্ম্মা নরাকৃতিঃ।
জগাম ত্বাং গৃহীত্বা চ মলয়ং চন্দনাচলং॥

মীমাংসার অনুরোধে মালাকার ও কর্ম্মকারকে বিশ্বকর্ম্মারপুত্র বলিয়াই ধরিলাম। এক্ষণে বর্ণসঙ্করের সিঁড়ি ধরিয়া দেখা যাউক, নাপিত কোথায় দাঁড়ায়—
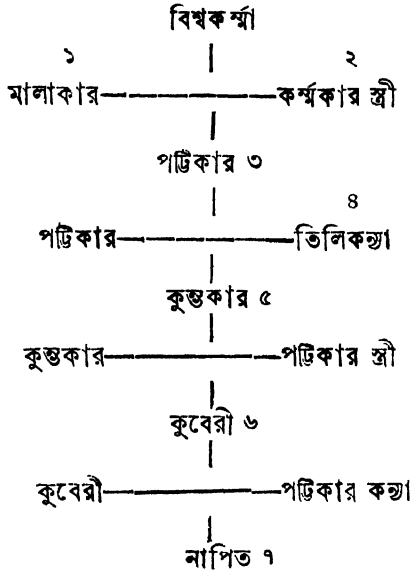
বনে চ মলয়দ্রুমাং পুষ্পতলে মনোহরে।
পুষ্পচন্দন বাতেন সন্ততং সুরভিকৃতে॥
চকার সুখ সম্ভোগং তয়া সহ সুনির্জ্জনে।
পূর্ণং দ্বাদশবর্ষঞ্চ রময়েদ রজনীদিবা॥
বভূবগর্ভঃ কামিন্যাঃ পরিপূর্ণঃ সুদুর্ব্বহঃ।
প্রসুবে সা চ তত্রৈব পুত্রানষ্টৌ মনোহরান॥
কৃত-শিক্ষিত-শিল্পাং জ্ঞানযুক্তাংশ্চ শৌনক।
পূর্ব্বপ্রাক্তনতো যোগ্যান্ বলযুক্তান্ বিচক্ষণান্।
মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দকান্।
কুম্ভকারং সুত্রধর, স্বর্ণচিত্রকরাং স্তথা॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে

উদ্ধৃত ক্রমদ্বারা বুঝা গেল যে মালাকার, কর্ম্মকার, পট্টিকার, তিলি, কুম্ভকার ও কুবেরী এই ছয়টী জাতি না জন্মিলে আর নাপিত হয় নাই! পাঠক বলুন দেখি এই নাপিত অর্থাৎ নাপিতদের আদি বা বীজপুরুষ, নাপিতের বংশ বিস্তার করিতে স্বজাতীয় নাপিত কন্যা পাইলেন কোথায়? যদি বলেন ঐ কুবেরী আর পট্টিকারীতে হয়ত কোন কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহার সহিত প্রথমোদ্ভূত নাপিতের বিবাহ হইয়াছিল এবং সেই কন্যার গর্ভে নাপিত বংশের বিস্তার-সাধক সন্তানাদি জন্মিয়াছিল; তাহা হইলে কি ভাই ভগ্নীতে বিবাহ হইয়াছিল! আবার ঐ ছয়টী জাতি জন্মিতেও বহুকাল লাগিয়াছিল; কারণ স্বজাতীয়া কন্যা থাকিতে অপর জাতীয় কন্যাতে সন্তান উৎপাদন করা দুর্দ্দৈব বলিয়াই ধর্ত্তব্য! সুতরাং যতকাল মালাকর, কর্ম্মকার, পট্টিকার, তিলি, কুম্ভকার, কুবেরী ও নাপিত না জন্মিয়াছিল, ততকাল ইহাদের বৃত্তি অর্থাৎ ব্যবসায়ও ভারতে সৃষ্টি হয় নাই। তাহা হইলে কি এই কয়টী জাতির জন্ম অপেক্ষায়, ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের জাতি সকল জল-বায়ুভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন! নাপিত না হইলে হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন হয় না, কুম্ভকার না হইলে জীবনান্ন তৈয়ারী করিবার পাত্র হাঁড়ী তৈয়ারি হয় না, কর্ম্মকার না হইলে কাষ্ঠাদি কর্ত্তন করিবার বা কৃষি কার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি ও যজ্ঞীয় পশু হনন করিবার অস্ত্রাদি তৈয়ারি হয় না। আর্য্যেরা নাকি অনার্য্যদিগের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন সুতরাং কর্ম্মাকারাভাবে সেই যুদ্ধের প্রধান উপকরণ তরবারিও তৈয়ারি হয় নাই॥ ফলতঃ এইরূপে পৃথক পৃথক জাতি সৃষ্টির অপেক্ষায় আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠা কখনই বন্ধ থাকে নাই, সুতরাং এই সকল তথা কথিত শাস্ত্রানুসারে নাপিতের জন্মও উপরিলিখিত ভাবে হয় নাই। যদি কেহ বলেন যে নাপিতের ঐ বীজ-পুরুষের বিবাহ অপর আর এক চালানের কুবেরী আর পট্টিকারীতে জাত

কন্যার সহিত হইয়াছিল এবং তাহাদের সহবাসে নাপিতের উত্তর পুরুষেরা জন্মিয়াছে; তাহা হইলে নাপিতের আদি পুরুষেরই বা দরকার কি? যাবৎকাল কূবেরী আর পট্টিকারী আছে এবং যখনই তাহাদের অবৈধ সংযোগ হইতেছে, তখনই নাপিত জন্মিতেছে সুতরাং এখনও নাপিত ঐরূপে জন্মিয়া দ্বিজগণের জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ, উপনয়নাদি এবং অশৌচনাশাদি করিয়া হিন্দুত্বের প্রধান উপকরণ সংস্কার এবং শুদ্ধাচারের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতেছে! বলা বাহুল্য এই উদাহরণ বর্ণসঙ্করাখ্যা-প্রাপ্ত সৎশূদ্র মাত্রেরই পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই সকল কারণেই জাতিভেদ প্রথাটী অযুক্তি এবং অধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুমিত হয়।

আবার দেখুন উপরি উক্ত ছয়টী জাতি সকলেই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, তাহা হইলে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে উহাদের জননাশৌচ, মরণাশৌচ ও বিবাহাদি-সংস্কার সমস্তই করিতে হইয়াছিল, সাধারণ ক্ষৌরকর্ম্মটা না হয় বাদ দিয়াই ধরিলাম, বলি, তাহা হইলে ঐ কয়টী জাতির অশৌচাদি নাশ ও বিবাহ-সংস্কার কোন্ মহাশয় সমাধা করিয়াছিলেন? কর্ত্তারা জাতি সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু জাতি মারিবার সময় নাপিতকে আগে তলব হয়। নাপিতের যদি জন্মই না হইল, তবে নাপিতের পূর্ব্বজ ঐ কয়টী জাতির জাতি মারিতে হইলে অথবা তাহাদের অশৌচ নাশ করিতে হইলে নাপিত পাইতেন কোথায়! যদি কেহ বলেন নাপিতের তখন দরকার ছিলনা, আমরা বলিব তাহা হইলে সনাতন হিন্দুসমাজ বা শাস্ত্রও ছিলনা। কারণ জন্মমাত্রে একমাসের মধ্যে হিন্দুসন্তানের জাতাশৌচ নাপিত দ্বারা দুরীকৃত না হইলে, চিরদিন সেই সন্তান এবং সন্তানের মাতা অশুচি ও অস্পৃশ্য থাকে; আর শ্রাদ্ধাদির কথা বলাই বাহুল্য। বিবাহে নাপিতের "গৌর্বচন" না হইলে সে বিবাহ শুদ্ধ ও সমাধা হয় না। তাহা হইলে কি ঐ ছয়টী জাতিই অস্পৃশ্য এবং উহাদের জল অনাচারণীয়। এবং তদ্ধেতু উহারা হিন্দুর

কোন ধর্ম্মাচারেও যোগদানের অযোগ্য। পক্ষান্তরে পুরোহিত মহাশয় ত নাপিতের ক্রিয়াকর্ম্ম পূর্ব্বাহ্ণে সম্পন্ন না হইলে যজ্‌মানের হাতে "কুশাই দেন না! এই সকল কি ভারত-গৌরব ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিগণের ব্যবস্থাপিত শাস্ত্র! না ভণ্ড তপস্বীদিগের কপট-কল্পনা। সূক্ষ্মদর্শী তপঃসিদ্ধ ঋষিগণের মীমাংসা অবশ্য একরূপই হইবে, যোগ বা তপস্যালব্ধ মীমাংসা নানারূপ হইবে কেন? প্রদেশভেদে* নাপিতের বিভিন্ন রূপ সংজ্ঞা আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের উৎপত্তির মূল এক নিশ্চয়ই। ফলতঃ স্বার্থপর, বেদবিদ্যা-হীন তথাকথিত শাস্ত্রকারদিগের দ্বারা আর্য্য-গৌরব কালে নষ্ট হইবে জানিয়াই যেন ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বলিতেছেন—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্য বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

অতএব আমরা যদি এই সব শাস্ত্র মানি, তবে শুধু জাতি যাইবে না, ধর্ম্মহানি হইবে! এখন দেখা যাউক "গৌর-বচনটা" কি!

কর্ণকথা বা গৌর্বচন

হিন্দুর বিবাহ সময়ে সপ্তপদী গমনের পূর্ব্বে নাপিত একটা ছড়া বলিয়া থাকে, ইহা বোধ হয় সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। উহাকেই কর্ণ কথা বা গৌর্বচন (গৌর বচন নহে) বলে। এই বচনে নাপিতের উৎপত্তির যে আভাস পাওয়া যায়, তাহা সর্ব্ববাদী-সম্মত না হইলেও একেবারে অবিশ্বাস্য নহে। বৃহৎ সংহিতার ১৫ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে দেখা যায় "নাপিত কৃত্তিকা নক্ষত্রের অধীন" ইহার গূঢ় অর্থ কি বুঝা যায় না, তবে কৃত্তিকা নক্ষত্রে মহাদেবের বীর্য্যে দেব সেনানী কার্ত্তিকের জন্ম

* পাঞ্জাবে নাপিত নাও ঠাকুর, হিন্দুস্থানে নাই, মারহাট্টা অঞ্চলে নাভি, মাদ্রাজে মঙ্গলী, পূর্ব্ববঙ্গে শীল এবং পশ্চিম বঙ্গে প্রমাণিক বলিয়া সাধারণতঃ সুবিদিত।

হইয়াছিল, সেই জন্যই তাঁহার নাম কার্ত্তিক বা কার্ত্তিকেয়। আবার নাপিতের মধ্যেও শিব-গোত্র দেখা যায়—অধিকন্তু "চন্দ্রিল" বলিলে নাপিত এবং মহাদেবকে বুঝায়। আরও একটী প্রবাদ এই যে ভগবতীর অশৌচনাশার্থ স্বয়ং মহাদেবই এই জাতির সৃষ্টি করেন; মাননীয় রিজলী সাহেবও এ কথা লিখিয়া গিয়াছেন।* এই সকল কারণে বোধ হয় যেন নাপিতের সঙ্গে মহাদেবের একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যাহা হউক আমরা এই বচন ও তাহার আবশ্যকতা পর্য্যালোচনা করিলে নাপিত সংক্রান্ত অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব আশা করি।

*Napit, the barber caste of Bengal, descended, according to one opinion, from a Kshatriya father and Sudra mother and according to Parasara from a Kuveri father and Pattikari mother. Some again, ascribe the origin of the caste, to an act of special creation on the part of Siva, undertaken to provide for the cutting of his wife's nails. Several different versions of this myth are current, all of which are too childish to be worth quoting here. The caste is clearly a functional group, fromed in all probability, from the members of respectable castes who in different parts of tne country adopted the profession of Barbers.

Vide Castes and Tribes by Hobl. H. H. Resley I. C. S.

মাননীয় রিজলী সাহেব নাপিত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভাবার্থ এই—কাহারও মতে বঙ্গীয় নাপিতগণ ক্ষত্রিয় পিতা এবং শূদ্র মাতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। পরাশর মুনির মতে কুবেরি পিতা এবং পট্টিকারী মাতা দ্বারা ইহাদিগের উৎপত্তি। আবার কেহ বলেন ভগবতীর নখ কর্ত্তনার্থ স্বয়ং মহাদেবই এই জাতির সৃষ্টি করেন। এইরূপ আরও অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রায় সকল গুলিই এইরূপ "ছেলেমীতে" পরিপূর্ণ যে এই রিপোর্টের অযোগ্য অর্থাৎ বিশ্বাস যোগ্য নহে। যাহা হউক স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে নাপিত জাতি এক কালে হিন্দু সমাজের

সাধারণতঃ লোকের ধারণা যে নাপিত বর-কন্যাকে কেবল ক্ষৌর করিবার জন্য বিবাহে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহা নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে নাপিতকেও পুরোহিতের কার্য্যাংশ সমাধা করিতে হয়। নাপিত উপস্থিত না থাকিলে পুরোহিত যদি একাই বিবাহ সংস্কার সমাধা করেন তবে বৈদিক বিধি অনুসারে ঐ বিবাহ সংস্কার অসম্পূর্ণ সুতরাং অসিদ্ধ হয়। সাধারণের অবগতির জন্য এই স্থলে ব্রাহ্মণের লিখিত "পুরোহিত দর্পণ" নামক পুস্তক হইতে যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ পদ্ধতির শেষাংশ হইতে নিম্নলিখিত কথাগুলি অবিকল উদ্ধৃত হইল।—"অতঃপর নাপিত তিন বার "গৌঃ গেঃ" এই শব্দ উচ্চারণ করিবে, জামাতা তাহা শ্রবণ করিয়া পাঠ করিবে—ওঁং মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসুনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ।

প্রণুবোচং চিকিতুষে জনায় মাপামনাগামদিতিং বধিষ্ট!

মম চামুষ্য চ পাপ্মানং হনোমীতি যদ্যালভেত। অথ যদ্যুৎসিসৃক্ষেন্ মম চামুষ্য চ পাপ্মাহতা ওমুৎসৃজতু তৃণান্যাত্ত্বিতি।"

"গৌঃ গেঃ" শুনিয়া জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, পড়াইবেন কে? উল্লেখ নাই! বেদ হিন্দুর পরমারাধ্য ও মহামান্য গ্রন্থ। এমন কি বেদ জগতের আদি গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই বেদের বিধানে যখন হিন্দুর বিবাহে নাপিতের দ্বারা "গৌঃ গৌঃ" বলিবার ব্যবস্থা আছে, তখন নিশ্চয়ই হিন্দু জাতির সহিত পুরোহিতের ন্যায় নাপিতেরও একটী সম্বন্ধ আছে, কারণ বিবাহকালে আরও ত অনেক জাতীয় লোকের সমাগম হয়; কৈ তাহাদের দ্বারা ত ঐ কার্য্য হয় না! পাঠক দেখিয়াছেন যে

উচ্চ শ্রেণীস্থ (সর্ম্মাই) জাতির অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। কালে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তাহারা ক্ষৌরকারের ব্যবসা অবলম্বন করায়, এক্ষণে ব্যবসাগত-জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

বাস্তবিকই মহামান্য রিজলী সাহেব নিরপেক্ষভাবে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা একরূপ অখণ্ডনীয়।

উল্লিখিত মন্ত্রটী উচ্চারণের পূর্ব্বে নাপিত তিনবার মাত্র "গোঃ" বলিবে, নাপিত কিন্তু তাহার জন্ম ও বৃত্তি বিষয়ক সুদীর্ঘ এক ছড়া আরম্ভ করিয়া দেয়। যথা—

সভা বন্দন, সভা বন্দন, আর বন্দন ধর্ম্ম।
মন দিয়ে শুন সবে নাপিত কুলের জন্ম॥
যাবৎ গঙ্গা মহীতলে, তাবৎ জন্ম নাপিতের কুলে ;
নাপিতস্য গৌর, গৌর, গৌর॥

চন্দ্র সূর্য্য দেবগণ, চিন্তে যুক্ত হলেন মন
না হলে নাপিতের জন্ম।
শুদ্ধ নাইকো দশকর্ম্ম॥
বেদে আছে নিয়মে নাই।
শুধাও যেয়ে ব্রহ্মার ঠাঁই॥
ব্রহ্মার আদেশ শুনি, তপ যপ করেন মুনি,
হয়ে জটাধারী !
নাভিতে জন্মিল নাপিত কুলের অধিকারী॥
পূর্ব্ব পুরুষের কায়া,
দেখিয়ে দর্পণে ছায়া,
নাম রাখেন পরশ-চিকিৎসা-মুনি।
বিবাহ সহিত যাবে,
আসন, বসন পাবে,
সভামাঝে পাবে জয়ধ্বনি॥
স্ত্রী পুরুষ না রবে ভেদ,
অশৌচ চূড়া কর্ণ-বেধ,
বেদবিধি নাপিতের কর্ম্ম।

ব্রাহ্মণ যা বলে দিবে,
নাপিত তাই আচরিবে,
শুদ্ধভাবে রাখিবে স্বধর্ম্ম।
ডানি শঙ্কর বাঁয়ে গৌরী,
সর্ব্বজন বল হরি,
বর ক'নের মাথায় সুবর্ণের ময়ূর।
নাপিতস্য গৌর, গৌর, গৌর!

পাঠক কিছু বুঝিলেন কি? বোধ হয় সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই, কারণ উক্ত ছড়ার ছন্দ ও ভাব কিছুই ঠিক নাই।

আমি এইবার ঐ ছড়াটীর ন্যায় আর একটী পাঠকদিগকে উপহার দিয়া বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করিব। এই ছড়াটী আমার বহুকষ্টলব্ধ সম্পত্তি, কারণ সকল নাপিত উহা সম্পূর্ণ জানে না, আবার যে যতটুকু জানে, সেও তাহা সহজে অপরকে শিখায় না। এমন কি, যদি (কর্ণকথা) গৌর্বচন জানেনা এমন কোন নাপিতের যজ্মান বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হয়, তবে সেই নাপিতকে আবার কর্ণকথা-জানা অন্য এক নাপিত ভাড়া করিয়া যজ্মানের কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতে হয়, অন্যথা নাপিতের দ্বারা পুরোহিতের আদেশমত "গৌর, গৌর, গৌর" এই কথা মাত্র উচ্চারণ করাইয়া লওয়া হয়।

(পদ্মাপার বগুড়া জেলা হইতে এইটী সংগ্রহ করিয়াছিলাম—পদকর্ত্তার নাম ধাম ইহাতেই পাইবেন।)

গৌর্বচন বা কর্ণকথা ঃ

পতি নিন্দা শুনে সতী, প্রাণ ত্যজিল হৈমবতী
উপনীত হয়ে পিত্রালয়।
যজ্ঞে হর উপনীত, যজ্ঞ করে বিবর্জ্জিত
সতী বিনে দেখে শূন্যময়॥
শব শক্তি হর স্কন্ধে করে নৃত্য নানা ছন্দে,
টলমল ত্রৈলোক্য করয়।
কম্পবান ত্রিভুবন সৃষ্টি হয় বিনাশন
রক্ষা কর প্রভু দয়াময়॥
সুরগণ যুক্তি করি, রাখ সৃষ্টি চক্রধারী
নৈলে সৃষ্টি নাশে মৃত্যুঞ্জয়।
চক্রে কাটেন শক্তি অঙ্গ, দেখে সবে হয় আতঙ্গ
শক্তি অঙ্গে ৫১ পিট হয়॥
নৃত্য ভঙ্গ করি হর, ধ্যানে মগ্ন যজ্ঞেশ্বর,
শক্তি জন্ম হৈল হিমালয়।
জগৎ মাতা জগদীশ্বরী মেনকার গর্ভে হল গৌরী
অষ্টম বর্ষে উপনীত হয়॥
শুভ বার্ত্তা নারদ পেয়ে, হিমালয়ে উত্তরীয়ে
শিবের বিয়ের দেন পরিচয়।
কথা বার্ত্তা লগ্ন স্থির কিন্তু ভয় বাবাজীর
ভূতনাথের ভূতে করি ভয়॥
নানাস্থানে হৈল তত্ত্ব নিমন্ত্রিত স্বর্গ মর্ত্ত্য,
উপনীত হইল হিমালয়।
দেব দেবী আদি করি, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধরী,
নানা বাদ্যে মহাশব্দ হয়॥

বিদ্যাধরী করে গান, বাজে বাদ্য অপ্রমাণ,
নৃত্য করে নর্ত্তকী নিচয় ।
বিনা সূতে গাঁথে হার, সুবর্ণ মাণিক ঝাড়
আম্র কলা রোপণ করয় ॥
আনিয়া মঙ্গল ঘট, অশ্বথ, পাকুড়, বট,
ধূনাতে করিল ধূমময় ।
উপনীত দেবগণ বরিলেন পঞ্চানন
আনন্দিত হৈল হিমালয় ॥
সম্ভ্রমে বসিল পাত্র, বরুণ ধরিল ছত্র
শচীপতি মুকুট পরায় ।
নূতন বস্ত্র অগ্রে দান পাদ্য অর্ঘ্য সপ্রমাণ
তুলসী চন্দন তুলি লয় ।
ব্রহ্মা হইলেন পুরোহিত দান কর্ম্ম সমুচিত
স্বস্তি বচন বিধিমতে কয় ॥
ইন্দ্র কয় চন্দ্রের কানে "গৌর" মোক্ষণ বিনে
বিভাশুদ্ধ শাস্ত্রমতে নয় ॥
জানিয়া বচন মর্ম্ম বচন ও নাপিত কর্ম্ম
দেব সভায় হৈল নির্ণয় ।
মহাদেবের নাভি হতে জন্মে নাপিত আচম্বিতে
তাইতে সবে "নাই" করে কয় ॥
হৈল নাপিত আগুয়ান, ব্রহ্মার নিকটে যান,
শিখায় ব্রহ্মা নীতি সমুদয় ।
চূড়াকর্ম্ম উপনীতে মৃত্যাশৌচ বিবাহেতে
তোমা বিনে না হবে নিশ্চয় ॥

যাবৎ চন্দ্র দিবাকর নাপিত বামুন একেত্তর

পুরোহিত রৈলে দুজনায়।

ব্রাহ্মণের উপনীতে ক্ষৌরী করে ব্রাহ্মণেতে

চরাচর প্রকাশ আছয়॥

নাপিত ব্রহ্মার শিষ্য গৌর বচন নাপিতস্য

মহাদেবের কানে "নাই" কয়।

হরের বন্ধন গাভী ছিল, নাপিত হইতে মুক্ত হৈল

হরিধ্বনি হৈল সভাময়॥

ব্রহ্মার শিষ্য ব্রহ্মদাস হাটসের পুরে বাস,

ঈশ্বর চন্দ্র নাম হয়।

এ বচন পুরাতন নাহি তার নিরূপণ

এই মতে কণ্ঠে কণ্ঠে রয়॥

ডানি শঙ্কর বাঁয় গৌরী বিয়ে হয় হরগৌরী

"গৌর, গৌর, গৌর।"

সভাশুদ্ধ দেও জয় বর কন্যে ঘরে যায়,

গৌর-গৌর-গৌর॥

পাঠক দেখিতেছেন যে দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে রচিত উপরি উক্ত পদ্যটীর প্রত্যেক চরণের শেষে "য়" রহিয়াছে; এরূপ শ্রুতি-কটু অথচ নৈপুণ্যসূচক কবিতা আজকাল বড় দেখা যায় না। কবিতাটী এত বড় কেন? খুব সংক্ষেপেও ত উহা শেষ করা যাইতে পারে।—ইহার উত্তরে উক্ত ঈশ্বর চন্দ্র শীল মহাশয় বলিলেন যে, বিয়ের ক'নেকে উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ করা এবং বিবাহের দ্রব্যগুলি যথাবিধানে প্রস্তুত রাখা আমাদের উদ্দেশ্য। "সে কি রকম?"—উত্তর—

ঐ দেখুন "পতিনিন্দা শুনে সতী, প্রাণ ত্যজিল হৈমবতী"—বাসর

ঘরে যাইবার পূর্ব্বে নববিবাহিতা মেয়েটীকে বলিয়া দেওয়া হইল—যে পতির যদি কেহ নিন্দা করে তাহা হইলে তোমার যেন অসহ্য হয়, অর্থাৎ তুমি পতি ভক্তি করিতে ত্রুটি করিবে না, কেননা জগন্মাতা দুর্গা পতির নিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আর ঐ দেখুন ধূপ, কলা, অশ্বথ, আম্রশাখা, নূতন বস্ত্র, মুকুট, তুলসী, চন্দন, গাভী ইত্যাদি বিবাহের আবশ্যকীয় অনেক জিনিষ আছে যাহা মেয়েরা সকলে জানেনা। বিয়ের পাত্রীটিকেও শিখান হইল, আবার ঐ বিবাহ বাড়ীতে সমুপস্থিত অপর সকল মেয়েকেও জানান হইল। "আর আশীর্ব্বাদ?" হাঁ, আমরা রীতিমত ধান-দূর্ব্বা সহকারে বর কনেকে আশীর্ব্বাদ ক'রে থাকি।

আমি দেখিলাম "ছেঁড়া সাঁকালে খাসা চাউল" পাওয়া গেল।

আচ্ছা, এখন দেখা যাউক উল্লিখিত বচন দ্বারা আমরা কি কি পাইলাম। বুঝিলাম ঐ বচনানুসারে হরগৌরীর বিবাহকালে মহাদেবের নাভি হইতে নাপিত উৎপন্ন হইল এবং সেই জন্যই নাপিতের নাম "নাভি' বা "নাই" হইল। আর সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা ঐ নাপিতের বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন এবং তাহাকে একটী মন্ত্র দিলেন, সেই মন্ত্র উক্ত নাপিত বরকে (অর্থাৎ শিবকে) শুনাইল, তাহাতে "শিবের বন্ধন গাভী মুক্ত হইল" এবং বিবাহও নিষ্পন্ন হইল।—সেই মন্ত্রটী কি, আর "গৌর গৌর" এর অর্থই বা কি, ইহা বুঝা গেল না। এই বার বেদে হাত দিতে হইল। বৈদিক মন্ত্রাদির মর্ম্মভেদ না করিতে পারিলে আর উপায় নাই। কিন্তু বেদমাতা সরস্বতী কি আমায় তেমন শক্তি দিবেন? যে জটিল কূট-জালে নাপিত-রহস্য সমাচ্ছন্ন, তাহা ভেদ করিয়া প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা মাদৃশ অভাজনের পক্ষে বাস্তবিকই সুকঠিন। অতএব গুরুজন ও স্বজাতি মহাশয়গণের আশীর্ব্বাদ মস্তকে করিয়া অতঃপর গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

সাহিত্য-দূষণ

আমি পূর্ব্বেও কয়েক জায়গায় গ্রন্থ দূষণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি। সাধারণের বিশ্বাস যে শাস্ত্রাদি কি কখনও দূষিত, লুপ্ত বা প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে! ঐ সকল যে আমাদের পরম পূজ্য প্রাচীন ঋষিদিগের লিখিত !! বাস্তবিক এরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যেমন সে "রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই" তেমনি সে ব্রাহ্মণও নাই আর সে শাস্ত্রও নাই, সব "সাত নকলে আসল খাস্ত" হইয়াছে। বিশেষতঃ সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে আজ কাল ছাপাখানা যেরূপ সহজ-লভ্য হইয়াছে, তাহাতে যদি কোন মুনি ঋষির কৃত হাতে লেখা পুঁথি সৌভাগ্যক্রমে কোন মহাত্মার হস্তগত হয়, তিনি যথেচ্ছভাবে উহা পরিবর্ত্তিত করিতে অথবা মনের মত করিয়া ছাপাইতে পারেন, রামায়ণ, মহাভারতও এই সকল দোষ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। গ্রন্থকর্ত্তা যিনি তিনিই থাকেন, অনুবাদক বা প্রকাশক উপসত্ত্ব ভোগ করিয়া যথাকালে স্বর্গারোহণ করিলে আর তাকে পায় কে! ইংরাজীতে একটি উপদেশপূর্ণ প্রবাদ আছে The goose's quilc hurts more than the lion's claws.

অর্থাৎ হাঁসের পাখ্না সিংহের থাবা অপেক্ষা অধিক জোরে আঘাত করে।

ভাবার্থ কিনা—সিংহের থাবার আঘাতও কালে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু কলমের খোঁচা কিছুতেই মিলাইবার নহে। সেই জন্য আমাদের শাস্ত্রেও আছে "শতংবদ মা লিখ"—শতবার মুখে বলিতে হয় বলিও, কিন্তু

কোন বিষয় সহজে লিপিবদ্ধ করিও না। কিন্তু ভারতের জাতিনাশা জাতি স্বজাতিকে সেই সাংঘাতিক কলমের খোঁচা দ্বারা বহুকাল হইতে প্রতিনিয়ত যন্ত্রণা দিতেছে! ইহা ভাবিতেও কষ্ট বোধ হয়! লেখনী জবাব দেয়!! বিবেকের তাড়নায় হৃদয় জ্বলে যায়!!!

আমরা এইখানে পাঠককে বঙ্গীয় জাতি-তত্ত্ববিদ্ অন্যান্য ২।১ জন পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিয়া উপহার দিতে মনস্থ করিতেছি।

১। "পরাশর-সংহিতা—

দাস-নাপিত-গোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধ-সীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নাম্ যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥ ২০
শূদ্র কন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসো হ্যসংস্কারে তু নাপিতঃ॥ ২১
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্র কন্যায়াং সমুৎপন্ন যঃ সুতঃ।
স গোপাল ইতি জ্ঞেয়ো ভোজ্যা বিপ্রৈর্ণ সংশয়ঃ॥ ২২
বৈশ্যকন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
আর্দ্ধিকঃ সতু বিজ্ঞেয়ো ভোজ্যা বিপ্রৈর্ণ সংশয়ঃ॥ ২৩

বঙ্গবাসী যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত পরাশর সংহিতা ১১ শ অঃ।

"দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীর কিম্বা যে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, শূদ্রের মধ্যে এই কয়জনের অন্ন ভোজন করা যায়। শূদ্রকন্যা হইতে ব্রাহ্মণ ঔরসে জাত অথচ ব্রাহ্মণ দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে দাস বলা যায়, কিন্তু অসংস্কৃত থাকিলে সে নাপিত হয়। যে পুত্র শূদ্র কন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাকে গোপাল বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই তাহার গৃহে অন্ন ভোজন করিতে পারেন। বৈশ্য কন্যার গর্ভে, ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মিলে এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সংস্কার-প্রাপ্ত হইলে তাহাকে আর্দ্ধিক, (অর্দ্ধসীরি) বলিয়া জানিবে।

বিপ্র নিঃসংশয়ই তাহার গৃহে ভোজন করিতে পারে।”—বঙ্গবাসী যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত পরাশর সংহিতার অনুবাদ ২১ পৃঃ।

এই চারিটা শ্লোক অথবা শেষ তিনটী শ্লোক যে “প্রক্ষিপ্ত,” তাহা বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। যথা,—১ম। আদিপুরাণে দেখা যায় যে কলির আদিতে মহাত্মাগণ কয়েকটী আচার ও ব্যবহার ব্যবস্থা পূর্ব্বক নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে দাস, গোপাল, কুলমিত্র ও অৰ্দ্ধসীরিদিগের অন্নভোজন দ্বিজাতির পক্ষে নিষেধ করা হইয়াছে যথা —শূদ্রেষু দাস গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্। ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য এতানি লোক গুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ নিবর্ত্তিতাণি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥” কিন্তু কলিযুগের প্রবর্ত্তিমানে, কৃতাদি যুগের ধর্ম্ম নষ্ট হওয়ায়, ঋষিগণ ব্যাসের নিকট যাইয়া কলিযুগে মনুষ্যগণের হিতধর্ম্ম কি জিজ্ঞাসা করায়, ব্যাস বলিয়াছিলেন, “আমি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ নহি, পিতাকে জিজ্ঞাসা করুন।” তাহাতে ঋষিগণ ব্যাসকে অগ্রে করিয়া বদরিকাশ্রমে যাইয়া ধৰ্ম্মতত্ত্বকামী হইয়া পরাশরকে জিজ্ঞাসা করায়, পরাশর কলিযুগের শৌচাচার ও প্রায়শ্চিত্ত ধর্ম্ম ঋষিদিগকে বলিয়াছিলেন। কলির আদিতে বুধগণ যাহা ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার বিপরীত পরাশর কলিধর্ম্ম ব্যাখ্যায় কেন বলিবেন? যদি কেহ এইরূপ তর্ক করেন যে পরাশর প্রথমে কলিধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, তৎপরে পণ্ডিতগণ তাহার উপদিষ্ট বিষয়ের মধ্যে দাস গোপালাদির ভোজ্যান্নতা সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নিবর্ত্তিত করিয়াছেন। তদুত্তরে আমরা বলিব যে সর্ব্বতত্ত্বদর্শী পরাশর কি ইহাও বুঝিতে পারেন নাই যে তাঁহার এই উপদেশ কলিকালের উপযোগী নহে ও সমাজের বিশৃঙ্খলতা ঘটাইবেক ও বুধগণ বাধ্য হইয়া ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিষেধ করিবেন? সুতরাং পরাশর স্মৃতির এই বচনের বিপরীত আদি পুরাণের নিষেধ বচন সকল স্থান প্রাপ্ত

হয় না ও বুধগণ সর্ব্বতত্ত্বদর্শী ঋষির উপদেশকে অবজ্ঞা করিতেন না। এমত অবস্থায় আমরা বুঝিয়া লইব যে, পরাশরের এই বচনটী অথবা আদি-পুরাণের বচনের উদ্ধৃত অংশটুকু প্রক্ষিপ্ত। নাপিতের অন্ন ভোজনের নিষেধ আদিপুরাণে নাই।

২২ শ্লোকে আছে,—

ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং সমুৎপন্ন যঃ সুতঃ।
স গোপালো ইতি জ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্ণসংশয়॥

যথার্থ অনুবাদ—"ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্র কন্যাতে যে সুত হইয়াছে, তাহাকে গোপাল জানিবে। সে বিপ্রকর্ত্তৃক ভোজ্য।"—এখানে "ভোজ্য" পদ "স" অর্থাৎ গোপাল পদের বিশেষণ। পরাশর মুখ হইতে যে এই— অর্থদুষ্ট বাক্য বহির্গত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না। সম্ভবতঃ প্রমাদী "তৈলবটজীবী" ভোজ্যান্ন পদ ব্যবহার করিতে গিয়া ছন্দ মিলাইতে না পারিয়া ভোজ্য পদের প্রক্ষেপ করিয়াছেন।

২৩ শ্লোক—বৈশ্যকন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেনতু সংস্কৃতঃ।
আর্দ্ধিকঃ সতু বিজ্ঞয়ো ভোজ্যা বিপ্রৈর্ণসংশয়ঃ॥

এই শ্লোকের অর্থ যথা—"বৈশ্য কন্যাতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছে। তাহাকে আর্দ্ধিক বলিয়া জানিবে, সে বিপ্র কর্ত্তৃক ভোজ্য তাহার সংশয় নাই। "আর্দ্ধিক" পদের স্থানে "আর্দ্দিক!" ও "ভোজ্যো" পদের স্থলে "ভোজ্যা" পদ মুদ্রাযন্ত্রে ছাপাইবার সময় হইয়াছে। বঙ্গবাসী যন্ত্রালয়ের পুস্তকের অনুবাদক মহাশয় "বৈশ্যকন্যা সমুৎপন্ন" বাক্যের অর্থ "বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মিলে" এই অর্থ কোথা হইতে পাইলেন? সামান্যতঃ এই সমাস বাক্যের অর্থ "বৈশ্য কন্যার গর্ভে জাত।" ঐ পুত্র ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র হইতে বৈশ্যকন্যাতে জাত, তাহা শ্লোক দৃষ্টে অর্থ করা যায় না; তবে এতে

শূদ্রেষু ভোজ্যান্না” বাক্যের সহিত অন্বিত হওয়ায় ইহাদিগকে শূদ্র বলা হইয়াছে; সুতরাং এই পুত্র শূদ্র পুরুষ হইতে বৈশ্য কন্যাতে জাত “আয়োগব” এইরূপ বুঝা যায়, কারণ মনুসংহিতার ১০ ম অঃ, ৪১ শ্লোক ও ৬৯ শ্লোক অনুসারে শূদ্র ভিন্ন অপর বর্ণের পুরুষ হইতে বৈশ্য কন্যার গর্ভোৎপন্ন পুত্র দ্বিজ হয়।

৪র্থ। মনু “দাস” শব্দ নৌকর্ম্মজীবী কৈবর্ত্তাখ্যা সংকীর্ণ শূদ্র জাতিতে ব্যবহার করিয়াছেন যথা ;—

“নিষাদো মার্গবং সূতে দাসং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যৎ প্রাহুরার্য্যোবর্ত্ত নিবাসিনঃ॥”

১০ম অঃ, ৩৪ শ্লোক।

ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রাগর্ভোৎপন্ন পুত্রকে মনু যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস প্রভৃতি পারশর ও নিষাদ নাম দিয়াছেন। ঐ সকল ঋষি ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্র কন্যার গর্ভোৎপন্ন পুত্রকে “উগ্র” নাম দিয়াছেন ও ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যার গর্ভোৎপন্ন পুত্রের “অম্বষ্ঠ” নাম দিয়াছেন। আর্দ্ধিক, দাস, গোপাল নাপিত প্রভৃতি পদ বৃত্তিবাচক না হইয়া যদি জাতিবাচক হইত, তাহা হইলে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঐ সকল পদের পরিবর্ত্তে অম্বষ্ঠ, নিষাদ, উগ্র প্রভৃতি পদসকলের ব্যবহার করিতেন অথবা অর্দ্ধসীরি, দাস, গোপাল, নাপিত প্রভৃতি পদ প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না হইলেও ঐ সকল পদ জাতিপর হইলে তাহাদের অর্থ অথবা লক্ষণা করিতেন।”

উদ্ধৃত সমস্ত অংশটুকু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নারায়ণ রায়ের প্রণীত “জাতিতত্ত্বে” দ্রষ্টব্য।

বৃহদ্ধর্ম্ম পূরাণ

২। ১৩০০ সালে বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত

পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য তর্করত্ন দ্বারা অনুবাদিত ও প্রকাশিত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উত্তর খণ্ড ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে।—

"ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্র কন্যায়াং জাতৌ নাপিতমোদকৌ" ইহার বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে—শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে নাপিত ও মোদক জাতির জন্ম।" বা! বাহোবা!! ক্ষত্রিয় দ্বারা শূদ্রার গর্ভে নাপিত ও মোদকের জন্ম—ইহাই হইল উক্ত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ; তাহা না হইয়া একেবারে শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে! অর্থাৎ মনু যে ক্ষেত্রে চণ্ডাল জন্মাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন! কেহ হয় ত বলিবেন যে এই দোষটী ইচ্ছাকৃত নহে, ভ্রমক্রমে বা মুদ্রা যন্ত্রের দোষে ঐরূপ হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় আবার এক অযাচিত কৈফিয়ৎ দিয়া কাজ খারাপ করিয়াছেন। পুস্তকের গোড়ায় ভূমিকাতে তিনি বলিতেছেন—"এই গ্রন্থের অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীরামানুজ বিদ্যার্ণব, শ্রীজগন্নাথ বিদ্যার্ণব. আমার ছাত্র দ্বারকেশ কাব্যতীর্থ এবং আমি। পূর্ব্ব খণ্ডের প্রথম কয়েক অধ্যায় এবং উত্তর খণ্ডের শেষ ৭ অধ্যায় এবং মধ্যে মধ্যে দুই এক অধ্যায় আমার কৃত"।

এই পুরাণের উত্তর খণ্ডে মাত্র ২১টী অধ্যায়, তন্মধ্যে শেষ ৭ অধ্যায় (যাহা পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের নিজের অনুবাদিত বলিতেছেন, তাহা) বাদ দিলে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধ হইতে নামিল, সুতরাং উক্ত দোষটীও ঐ অধ্যায়েই ঘটিল! ঐটী জাতি বিভ্রাটের অধ্যায় কি না!!

ব্যাস-সংহিতা

৩। ব্যাস-সংহিতার সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, যিনি বেদ বিভাগ করিয়া অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হিন্দুর পরমারাধ্য প্রাতঃস্মরণীয় সেই মহাত্মার স্মৃতিখানিও দূষিত হইয়া

গিয়াছে। ইহা আলোচনা করিতেও কষ্ট বোধ হয়। বিগত ১৩০৯ সালের বৈশাখের "কায়স্থ পত্রিকাতে" এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, এখানে তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত হইল।

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্কিরাত কায়স্থ মালাকার কুটুম্বিনঃ॥
বরাটো মেদ চাণ্ডালো দাসশ্বপচ কোলকাঃ।
এতোন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ॥

উক্ত বচন দৃষ্টে কোন কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধি কায়স্থ জাতিকে অন্ত্যজ বলিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। এমন কি "কায়স্থের বর্ণনির্ণয়" গ্রন্থে, উক্ত মণ্ডিত বচনের প্রকৃত পাঠ প্রকাশিত হইলেও এখনও কোন কোন বিকৃত মস্তিষ্ক বিদ্যাভূষণ-মুদ্রিত ব্যাস-সংহিতার বিকৃত পাঠের সমর্থনে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন ও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এসিয়াটিক সোসাইটীর II A 11 নং পুথি এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গবাসী প্রেস ও বোম্বাই নগরের মহাদেব শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ব্যাস সংহিতার দোহাই দিতেছেন! বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যে ১১৫২ সংখ্যক ব্যাসংসহিতা পুঁথির সাহায্যে "কায়স্থের বর্ণনির্ণয়" গ্রন্থে প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই পুঁথিখানির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দিহান হইয়াছেন। এমন কি, কেহ বা পুঁথির সংবাদদাতাকে মিথ্যাবাদী বলিতেও বিমুখ হন নাই।

বিদ্বেষীগণ এসিয়াটিক সোসাইটির যে হস্তলিপির প্রমাণ দিতেছেন, তাহা প্রাচীন পুঁথি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; তাহা একখানি বাঁধান খাতা ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একজন আধুনিক পণ্ডিতের লেখা। তদ্দৃষ্টে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাসসংহিতা মুদ্রিত করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই মুদ্রিত গ্রন্থ দৃষ্টে বোম্বাই নগরে মহাদেব শাস্ত্রী ও কলিকাতায় বঙ্গবাসী প্রেস কর্ত্তৃক ব্যাসসংহিতা প্রকাশিত হইয়াছে,

কাজেই এই কয়েকখানি ব্যাস-সংহিতা এক ছাঁচে ঢালা। যদি পরবর্ত্তী প্রকাশকবর্গ পূর্ব্ব মুদ্রিত গ্রন্থের উপর নির্ভর না করিয়া দুই পুথির সাহায্য গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় মুদ্রিত ব্যাস-সংহিতার এরূপ দুর্দ্দশা দেখিতে পাইতাম না। যাঁহারা যত প্রাচীন সংস্কৃত পুথি মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, এক গ্রন্থের বহু প্রাচীন পুথিতে পাঠান্তর থাকে। ব্যাস-সংহিতার প্রাচীন পুথিতেও পাঠান্তরের অভাব নাই; ১৪০৯ শকে ও ১৬৫৭ সংবতে লিখিত দুই খানি ব্যাস-সংহিতার প্রাচীন হস্তলিপিতে,

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপো আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্কিরাত-কায়স্থমালাকার কুটুম্বিনঃ॥"

—এই শ্লোকটী এককালে নাই। ভট্টপল্লীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নও কায়স্থ-তত্ত্ব সমালোচনা কালে লিখিয়াছেন;—"আমরা বলি কায়স্থ, মালাকার, নাপিত, কুম্ভকার, এতগুলি প্রচলিত উচ্চজাতি যে শাস্ত্রমতে অন্ত্যজ, তাহা কখনই নয়। শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত হইবার বিশেষ সম্ভব।" কারণ ব্যাস-সংহিতার অন্যস্থানে দেখা যায়,—

"নাপিতান্বয় মিত্রার্দ্ধসীরিণোদাসগোপকাঃ।
শূদ্রানামপ্যমীষাস্তু ভুক্তান্নং নৈব দুষ্যতি॥"

(ব্যাস ৩য় অঃ ২০ শ্লোক)

যে ব্যাস, নাপিতের অন্ন ব্রাহ্মণের ভোজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেই ব্যাসই নাপিতকে অন্ত্যজ বলিয়া উল্লেখ করিবেন, তাহা কখনই সঙ্গত নয়; দেব নাগরাক্ষরে লিখিত বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ১১৫২ নম্বর ব্যাস-সংহিতার পুঁথিতে এইরূপ প্রকৃত পাঠ গৃহীত হইয়াছে।—

বর্দ্ধকী নাপিতো গোপোঃ দাসোবৈ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্ বিরাটকায়স্থ মালাকার কুটুম্বিনঃ॥

এতে চান্যে চ বহবঃ শূদ্রাভিন্নাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
চর্ম্মকারস্তথা ভিল্লো রজকঃ পুক্কসো নটঃ॥
বরাটো মেদ চণ্ডালদালসশ্চৈব লৌকিকাঃ।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ॥

অর্থাৎ বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, দাস, কুম্ভকার, বণিক বিরাটকায়, মালাকার, কুটুম্বী ও অন্য বহু শূদ্র স্ব স্ব কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন হইয়াছে। চর্ম্মকার, ভিল্ল, রজক, পুক্কস, বরাট, মেদ, চণ্ডাল, দালস ও লৌকিকগণ এবং যাহারা গোমাংশ ভোজন করে, তাহারা অন্ত্যজ বলিয়া গণ্য।

উক্ত শ্লোকে নাপিত-গোপাদি কেবল শূদ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে, অন্ত্যজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই অথবা ব্যাসের অপর শ্লোকের সহিত ইহার কিছুমাত্র অসঙ্গতি নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মুদ্রিতব্যাস-সংহিতা সমূহে—

এতেচান্যে চ বহবঃ শূদ্রা ভিন্নাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
চর্ম্মকারস্তথা ভিল্লো রজকঃ পুক্কসো নটঃ।

এই আবশ্যকীয় চারিচরণ এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন "বিরাট-কায়স্থ" এই প্রকৃত পাঠের স্থানে "কিরাত কায়স্থ" এই বিকৃত পাঠ গৃহীত হইয়াছে। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত সমস্ত পুঁথি এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে ১১৫২ নম্বর পুথিখানি যে কেহ গিয়া দেখিয়া আসিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিতগণ স্বচক্ষে এই পুথিখানি সন্দর্শন করিয়াছেন। চন্দ্র সূর্য্যের অস্তিত্ব যেরূপ মিথ্যা নয়, এই পুথিখানির অস্তিত্বও সেইরূপ প্রকৃত। আমাদের সংগৃহীত প্রাচীন ব্যাস-সংহিতার পুথির সহিত বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের উক্ত পুথির অনৈক্য নাই। গবর্ণমেণ্টের পুথি প্রকাশ্য স্থানে রহিয়াছে এবং সাধারণের সহজেই নয়ন-গোচর হইতে পারিবে বলিয়াই ঐ পুথিখানির কথা বলিলাম।

এখন যাঁহারা ব্যাসসংহিতার বিকৃত পাঠ দৃষ্টে কায়স্থকে অন্ত্যজ মধ্যে গণ্য করিতে অগ্রসর: বিচার করিয়া দেখুন, তাঁহাদের যুক্তি কতই অসার ও ভিত্তিশূন্য।"

ইহার উপর টীকার আবশ্যকতা নাই, তবে ব্যাসদেব নাপিতের কোন অনিষ্ট চিন্তা বা অন্যায় করিতেই পারেন না। কারণ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের ব্যাখ্যানুসারেই—বলিতে ভয় হয়—হে পরাশরাত্মজ, সর্ব্বান্তর্যামিন, নর-নারায়ণ, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস!—আমার অপরাধ হইলে ক্ষমা করিবেন—আমি ভবদীয় প্রিয় পাত্রদিগের প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করিতেছি, অতএব জ্ঞানতঃ আমি কোন দোষই করিতেছি না। বেদান্ত, মহাভারত, সংহিতা, পুরাণ, উপপুরাণাদি ভবদীয় যাবতীয় শাস্ত্র গ্রন্থ প্রধানতঃ বঙ্গবাসী প্রেসেই মুদ্রিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এই সকল শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদক পণ্ডিত-মণ্ডলীর কর্ত্তাও উক্ত তর্করত্ন মহাশয়—আর কলিযুগ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক আপনার পিতা মহামুনি পরাশর! সুতরাং **পরাশর-সংহিতার** বচন এবং পণ্ডিত-মণ্ডলীর ব্যাখ্যা—অর্থাৎ শূদ্র কন্যা হইতে ব্রাহ্মণের ঔরসে-জাত অথচ ব্রাহ্মণদ্বারা অসংস্কৃত থাকিলে সে নাপিত হয়--একথা সত্য হইলে—হে বেদবিভাগ-কর্ত্তা মৎস্যগন্ধা-নন্দন ব্যাসদেব! আপনিই ত নাপিতের বীজপুরুষ!!! কারণ আপনি তপঃসিদ্ধ, পরম ব্রাহ্মণ পরাশরের ঔরসে, শূদ্রকন্যা মৎস্যগন্ধার গর্ভে জাত এবং আপনার সংস্কারও হয় নাই—একথা ভারতবাসী পণ্ডিত মণ্ডলী সকলেই জানেন। পাঠক পুস্তকের "সূচনা" দেখুন, আর বিচার করিয়া বলুন, যে পুরাণ, উপপুরাণাদি যাহা ব্যাসদেব রাখিয়া গিয়াছেন তাহা নাপিতেরই পৈতৃক সম্পত্তি কি না? আর ঐ সকল সম্পত্তি হইতে নাপিতকে বঞ্চিত, অপিচ বিকৃত করিয়া বিক্রয় করায়, উক্ত পণ্ডিত মহাশয়েরা দোষী, সুতরাং দণ্ডিত ও অভিশপ্ত হইবেন কি না।

সাহিত্য ও সমাজ।

সাহিত্য মনুষ্যজাতির দর্পণ-স্বরূপ। কোন দেশের কোন মানব সমাজের অবস্থা, আচার ব্যবহার, শক্তি, সামর্থ্য রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে সেই জাতির সাহিত্যই সাক্ষ্য দিয়া থাকে। যদি কোন সুধী কোন নূতন দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অবগত হইতে ইচ্ছা করেন অথবা সেই দেশে যাইতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি সেই দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অগ্রে সেই জাতির সাহিত্য-দ্বারা অবগত হইয়া থাকেন। সৎ-সাহিত্য সজ্জাতির গৌরব ও সভ্যতার পরিচায়ক। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের বিশেষতঃ বাঙ্গালীর এমন সাহিত্য নাই বলিলেও চলে। যে জাতির শাস্ত্রীয় পুস্তকের পাতায় পাতায় উল্লিখিতরূপ জাতিনাশা আশা ও কর্ম্মনাশা ভাষার ভূরি ভূরি প্রয়োগ ও প্রচলন বিদ্যমান, বিদ্যাশিক্ষাও তাহাদের বিফল। শাস্ত্রে তো আছে "বিদ্যা বিনয়ং দদাতি"—কিন্তু বাঙ্গালী যতই বিদ্যা শিখিতেছে, যতই উচ্চশিক্ষা পাইতেছে, ততই যেন তাহাদের অহঙ্কার, উচ্ছৃঙ্খলতা ও জাত্যাভিমান বাড়িয়া যাইতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রাদির আলোচনা ছাড়িয়া দিলেও আধুনিক নব্য বাঙ্গালীর সাহিত্যেও তাই জাতি-বিদ্বেষ ও চিরবিচ্ছিন্নতার "গুপ্তছুরী সদা হেরি, আলিঙ্গন মাঝে"! সুবিজ্ঞ চিন্তাশীল পাঠক, একটু মনোযোগ সহকারে বাঙ্গালীর আধুনিক সাহিত্যের ধারা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, নাটক নভেল, ইতিহাস এমন কি স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেও জাতি-ভেদের তীব্র হলাহল স্থানে স্থানে ছড়ানো রহিয়াছে। Caste system অর্থাৎ বাঙ্গালীর জাতিভেদ প্রথা এদেশবাসীগণের হৃদয় ও মস্তিষ্ক যেন বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। পরিণামে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াও পূর্ব্বসংস্কার বশে তথাকথিত জাতির গণ্ডী সম্পূর্ণরূপে পার হইতে পারিয়াছেন এমন হিন্দু প্রায়ই দেখা যায় না। জাতিভেদ প্রথা হিন্দুর হৃদয়কে এতই সংকীর্ণ

ও বিদ্বেষপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে যে অনিচ্ছাসত্বে বা অজ্ঞাতসারেও এক ভাই অপর ভাইকে 'নীচ', 'ইতর', "ছোটজাত," Backward, Depressed Class" প্রভৃতি অভিনব অশ্লীল শব্দের বিষয়ীভূত করিতেও ছাড়িতেছেন না। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, "উচ্চশ্রেণী" বলিয়া পরিচিত অনেক সাহিত্য-ব্যবসায়ীর পুস্তকেও জাতি লইয়া রঙ্গ ব্যঙ্গ, জাতিভেদের "মজা" লইয়া কত রস-তরঙ্গ, জাতি-প্রথার উপকারিতা বিষয়ে অসামান্য রূপলাবণ্য-সম্পন্ন কত রকমের ব্যাখ্যা ও প্রশংসাই না দেখিতে পাওয়া যায়! যে প্রথা বাঙ্গালী জাতিটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থায় যে প্রথার মত শত্রু আর নাই বলিলেও চলে, সেই "সর্ব্বনেশে" প্রথার সমর্থক ও সংরক্ষকেরও অভাব নাই। বাস্তবিক বিচ্ছিন্নতা-প্রীতিই যেন বঙ্গীয় হিন্দুজাতির বিশিষ্টতা দাঁড়াইয়াছে। এই জাতির আবার শিক্ষা ও সভ্যতার গৌরব। ইহাদের আবার স্বদেশ-প্রীতি, সমাজ-সংস্কার ও জাতি-সংগঠন। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীজাতির অধঃপতন ও উচ্ছেদ সাধনের যাহা কিছু দরকার, এই জাতির সাহিত্যেই তাহা প্রচুর পরিমাণে মজুত আছে। রোগের কারণ বিদ্যমান রাখিয়া রোগ তাড়ানো যেমন অসম্ভব, বাঙ্গালীর সাহিত্য-সংস্কার না করিয়া সমাজ-সংস্কার, জাতি সংগঠনাদিও তেমনি অসম্ভব। কণ্টকিত আসনে দেশ-মাতৃকার অধিষ্ঠান কি সম্ভব? আন্তরিক সহানুভূতি ও সমপ্রাণতা জাতীয়তার নিদান; তাহা যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ জাতি-সংগঠন চেষ্টা আলেয়ার পেছনে পেছনে দৌড়ান মাত্র। আমার মনে হয় বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালীর সাহিত্য-সংস্কারই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কারণ সৎ-সাহিত্য মানবের নির্জনের বন্ধু, অসময়ের সম্বল ও হিতৈষী শিক্ষক। জাতিভেদ-পীড়িত, দারিদ্র-কবলিত, অভাব অশান্তিগ্রস্ত বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সাহিত্যেও প্রাণ জুড়াইবার স্থান নাই—সদা মনে ভয়, কখন কি হয়। সামাজিকের ভাবনাও যেরূপ,

সাহিত্যিকের ভাবনাও সেইরূপ, ফলও হইতেছে তদ্রূপ—
"যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী।"

অষ্টম অধ্যায়

বৈদিক আভাষ।

বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় পণ্ডিত স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত-প্রবর ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও প্রসিদ্ধ ইতিহাস বেত্তা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়গণের অনুমোদিত ঋগ্বেদের অনুবাদে বঙ্গ-গৌরব স্বর্গীয় মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন—

"প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে অগ্নি একজন অগ্রগণ্য দেবতা ছিলেন। খৃষ্টের পূর্ব্বে পঞ্চম শতাব্দে যাস্ক * জীবিত ছিলেন, তিনি দেবগণের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন যথা—

নৈরুক্তদিগের মতে দেব তিন জন, পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূর্য্য। তাঁহাদিগের মহাভাগ্যকারণ এক এক জনের অনেকগুলি নাম অথবা এটী পৃথক পৃথক কর্ম্মের জন্য, যথা—হোতা, অধ্বর্য্য, উদ্গাতা। অথবা তাঁহারা পৃথক পৃথক দেবই ছিলেন কেন না তাঁহাদিগের পৃথক পৃথক স্তুতি করা হইয়াছে এবং পৃথক পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে। নিরুক্ত ৭।৫।

"ঋগ্বেদ রচনার প্রারম্ভে চারি জাতি ছিল না। কেবল মাত্র দুই জাতি ছিল—অর্থাৎ আর্য্য এবং অনার্য্য বা দস্যু। ঋগ্বেদ রচনা কালের শেষে আর্য্যদিগের মধ্যে ঋত্বিক বা পুরোহিত শ্রেণী, রাজপুরুষগণ, ও সাধারণ শ্রমজীবীগণ বা ব্যবসায়ী লোক এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী

---

* যাস্ক—নিরুক্তকার, বেদের পদ-ব্যাখ্যাতা মুনি বিশেষ।

হইয়াছিল কিন্তু তখনও এই ভিন্ন২ শ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে আহারাদি বা বিবাহাদি কার্য্য নিষিদ্ধ হয় নাই। প্রাচীনকালে ইদানীন্তন জাতি বিভাগের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সূক্ত ১০ ঋক ১ টিকা ২

ঋগ্বেদে "ব্রহ্ম" অর্থে প্রার্থনা বা স্তুতি। ব্রহ্মা একজন স্তুতিবাচক পুরোহিত বিশেষ। "ব্রহ্মাণঃ" অর্থে স্তুতিবাদকগণ বা পুরোহিতগণ। সায়ণ * যে ব্রহ্মান অর্থে "ব্রাহ্মণ" করিয়াছেন সে অসঙ্গত। কেন না পুরোহিতেরা তখনও ব্রাহ্মণ নামে একটী ভিন্ন জাতি ভুক্ত হয় নাই। ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকে আদৌ ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যবহার নাই।"

"ঋগ্বেদ রচনার সময়ে হিন্দুগণ একেশ্বর বাদী ছিলেন না। প্রকৃতির মধ্যে সুন্দর ও গৌরবান্বিত বস্তুসমূহকে উপাসনা করিতেন। কিন্তু যখন হিন্দুদিগের মধ্যে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন হইল, তখন তাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিলেন প্রকৃতির সমস্ত বস্তু ও সমস্ত কার্য্যই একই নিয়ম শ্রেণী দ্বারা আবদ্ধ ও পরিগণিত, তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে উদয় হইল যে সূর্য্য, আকাশ, বায়ু, অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন দেব নহে—ইহাদিগের নিয়ন্তা, ইঁহাদিগের পরিচালক, ইঁহাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন মাত্র দেব আছেন। সে দেবকে কি নাম দিবেন ? "আরাধ্য" দেবের নাম নাই অথবা নাম আরাধ্য। আরাধনা বা প্রার্থনা সূচক বেদে যে শব্দটী পাইলেন সেই "ব্রহ্ম" শব্দ দ্বারা জগতের সৃষ্টি কর্ত্তাকে ব্রহ্মা নামে উপাসনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৈদিক "ব্রহ্ম (প্রার্থনা) শব্দ হইতে পুরাণের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে একজন সৃষ্টিকর্ত্তার কতক অনুভব আছে তাহা আমরা পরে পাইব, কিন্তু

* সায়ণ—বেদভাষ্যকার।

তাহাকে "ব্রহ্মা" নাম দেওয়া হয় নাই। ঋগ্বেদে ব্রহ্মা একজন পুরোহিত মাত্র।"

২২ সূক্ত ৫।১ ঋক

২। "সূর্য্য আদিম আর্য্যদিগের উপাস্য দেব ছিলেন সুতরাং সেই সেই আর্য্যজাতির ভিন্ন শাখায় তাহার উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্য ও সবিতা একই দেব, কি ভিন্ন ভিন্ন দেব, এ বিষয়ে লইয়া তর্ক আছে। যাস্ক বলেন—আকাশ হইতে যখন অন্ধকার যায়, কিরণ বিস্তৃত হয় সেই সবিতার কাল। সায়ন বলেন সূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি তাহাই সবিতা। উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত যে মূর্ত্তি সেই সূর্য্য। অতএব আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে সূর্য্য ও সবিতা একই দেব। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদিগেরও সেইমত এবং সূর্য্যও সবিতা সম্বন্ধে ঋগ্বেদের সমস্ত সূক্ত পাঠ করিলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।"

১ম মণ্ডল ২২ সূক্ত ঋক্ ১৬।১৭ *

৪। বিষ্ণু সপ্তকিরণের সহিত যে প্রদেশ হইতে পরিক্রম করিয়াছিলেন সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৭। বিষ্ণু এই জগৎ পরিক্রম করিয়াছিলেন। তিন প্রকার পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধুলিযুক্তপদে জগৎ আবৃত হইয়াছিল।

টিকা—সূর্য্যরূপ বিষ্ণুর জগতে পদ বিক্ষেপরূপ উপমা হইতে ক্রমে নানা উপাখ্যান রচিত হইতে লাগিল।

"ঐতরেয় ব্রাহ্মণে" আছে যে দেব ও অসুরদিগের মধ্যে এই জগৎ বিভাগকালে ইন্দ্র বলিলেন "বিষ্ণু যতটুকু তিন পদে বিক্রম করিতে পারিবেন, ততটুকু দেবগণের অবশিষ্ট অসুরদিগের। অসুরগণ সম্মত হইল

* বাহুল্যবোধে বেদের মূলমন্ত্রগুলি পরিত্যক্ত হইল, উহাদের অনুবাদ মাত্র দেওয়া গেল।

এবং বিষ্ণু তিন-পদ-বিক্রমে জগৎ, বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করিলেন। (এখানে) বিষ্ণু সূর্য্যের একটী নাম মাত্র, বেদের অনেক দেবগণের মধ্যে একজন দেবের একটী নাম মাত্র। তিনি পুরাণের জগৎ পিতা পরম দেব হইলেন কিরূপে? ইহা মীমাংসা করা কঠিন নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বেদ রচনার সময়ে সরলচিত্ত উপাসকগণ প্রকৃতির প্রত্যেক বিস্ময়কর দৃশ্যে বা কার্য্যে একজন দেব অনুমান করিতেন। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যখন জ্ঞানের উন্নতি হইল—তখন হিন্দুগণ প্রকৃতির সকল কার্য্যে একজন নিয়ন্তা দেখিতে পাইলেন, একজন পালনকর্ত্তা বুঝিতে পারিলেন। সূর্য্য আমাদিগকে পালন করেন, অগ্নি আমাদিগকে পালন করেন, বায়ু আমাদিগকে পালন করেন কিন্তু এগুলি কার্য্যমাত্র। একজন কর্ত্তা এই কারণ সমূহের দ্বারা বায়ু, অগ্নি ও সূর্য্য দ্বারা আমাদিগকে পালন করেন, সভ্য হিন্দুগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন। সে দেবের কি নাম দিবেন? বিষ্ণু জগৎ রক্ষা করেন, তিনপদ বিক্ষেপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন এরূপ বর্ণনা বেদে আছে, অতএব সভ্য হিন্দুগণ বেদ হইতে সূর্য্যের বিষ্ণু নামটী গ্রহণ করিয়া জগতের পালন কর্ত্তাকে সেই নাম দিলেন।"

পৌরাণিক বিষ্ণু ত্রিমূর্ত্তি পরমেশ্বরের দ্বিতীয় মূর্ত্তি। বৈদিক ধর্ম্ম বহুল দেব-উপাসনা-মূলক অতএব বেদে সেই এক ঈশ্বরের ত্রিমূর্ত্তির কোন উল্লেখ নাই। যাস্ক খৃষ্টের পঞ্চম পূর্ব্ব শতাব্দিতে জীবিত ছিলেন, তাহারও নিরুক্তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবের কোন উল্লেখ নাই। তিনি অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য্যকে প্রধান দেবতা বলিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মী পৌরাণিক বিষ্ণুর স্ত্রী কিন্তু ঋগ্বেদে লক্ষ্মী দেবীর কোন উল্লেখ নাই।

ঋগ্বেদ—প্রথম মণ্ডল ১৬৪ সূক্ত ৪৪ ঋক

কেশ বিশিষ্ট তিনজন সম্বৎসরের মধ্যে যথাসময়ে ভূমি পরিদর্শন করেন। আর একজনের রূপ দৃষ্ট হয় না কেবল গতি দৃষ্ট হয়।

৬টীকা—অগ্নি, আদিত্য ও বায়ু এই তিন জন। সায়ন "বপতে" শব্দের অর্থ করেন "দাহেন বনস্পত্যাদিকচ্ছেদনেন নাপিত কার্য্যং করোতি।

১০ম মণ্ডলের ৭২ শূক্তে আছে যে "অদিতির আটপুত্র তন্মধ্যে তিনি মার্ত্তণ্ডকে ত্যাগ করিয়া ৭ জনকে দেবগণের নিকট লইয়া যান যথা :—

অষ্টৌপুত্রা সো আদির্ত্যে জাতান্বস্পপরি
দেবা উপপ্রেৎ সপ্তভিঃ পরা মার্ত্তণ্ডামাসাৎ। ৮ ঋক।

অদিতির অর্থ কি? দিতধাতু বন্ধনে বা খলনে বা ছেদনে,—যাহা অখণ্ড, অচ্ছিন্ন ও অসীম তাহাই অদিতি; অতএব অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি সুতরাং অদিতি সকল দেবের জনয়িত্রী এবং যাস্ক "আদিনা দেবমাতা" কহিয়াছেন।

ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ৮৫ সূক্ত

তৃষ্টমেতৎ কটুকামেতদ পাষ্টবদ্বিষবন্নৈদত্তবে।
সূর্য্যাং যো ব্রহ্মা বিদ্যাৎস ইদ্বাধূয় মর্হতি॥ ৩৪ ঋক

এই বস্ত্র দূষিত, অগ্রাহ্য মলিন যুক্ত ও বিষযুক্ত। ইহা ব্যবহারের যোগ্য নহে, যে ব্রহ্মা নামা ঋত্বিক সূর্য্যাকে জানেন, সে বধুর বস্ত্র পাইতে পারে। ৫॥"

আশসনং বিশসনমথো আধিবিকর্ত্তনং
সূর্য্যায়াঃ পশ্য রূপাণি তানি ব্রহ্মা তু শুংধতি॥ ৩৫

সূর্য্যের রূপ দর্শন কর। আশসন বস্ত্র, বিশসন বস্ত্র, অধিবিকর্ত্তন বস্ত্র, আশীর্ব্বাদ, গাত্রহরিদ্রা ও অধিবাসের কাপড় (?) এ সকল ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক শোধন করিয়া লইতে পারেন। ৩৫

৫ টীকা—এই ঋকগুলি বিবাহের আচার সম্বন্ধে। এক্ষণে

যেমন নাপিত বিবাহের বস্ত্র লাভ করে, তৎকালে সে বস্ত্র ঋত্বিকের প্রাপ্য ছিল।"

পাঠক, এইবার আমাদের নিজের পালা আসিল,—সুতরাং নাপিতের সেই গৌরবচন স্মরণ করুন; আর ঋত্বিক কাহাকে বলে শুনুন **ঋত্বিক পুরোহিতযাজনিক**-ইত্যমর। সুতরাং ঋত্বিক ও পুরোহিত একার্থবাচক কিন্তু পুরোহিত কথাটাই সমধিক প্রচলিত! যজ্ঞ করিতে হইলে ৪জন প্রধান ঋত্বিক আর ১২ জন সহকারী আবশ্যক। প্রধান ঋত্বিকের মধ্যে যিনি সামবেদ উচ্চারণ করেন তাহার নাম উদ্গাতা, যিনি যজুর্ব্বেদ পাঠ করেন তাহার নাম হোতা, যিনি ঋঙ্মন্ত্র পাঠ করেন তাহার নাম অধ্বর্যু, আর যিনি সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন তাহার নাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মার স্বতন্ত্র বেদ নাই কিন্তু তাহাকে সকল বেদ জানা চাই—(**বিশ্বকোষ**-ঋত্বিকশব্দ দ্রষ্টব্য)। যজ্ঞ, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে এই সকল ঋত্বিকের প্রয়োজন। তবে কার্য্যের গুরুত্বানুসারে ঋত্বিক সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। উপরে প্রধান ৪ জন ঋত্বিকের কার্য্যোল্লেখ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ঋত্বিকেরা বোধ হয় যজ্ঞাদির আবশ্যকীয় ঘৃত, কাষ্ঠ, দুর্ব্বা, পুষ্প ও পবিত্র জলাদি সংগ্রহ করিতেন এবং আবশ্যক হইলে প্রধান ঋত্বিকের কার্য্যও করিতেন। বৈদিকযুগে জাতিভেদ না থাকাতে* বেদজ্ঞ যে

---

* In the time of Rig-Veda, the caste system was not well organised, if, indeed it existed at all. The same man might be a priest, warrior and husband man. The women of the upper classes were educated and held in great respect. They sometimes even performed sacrifices and composed hymns. The people led very simple lives. Agriculture formed their principal occupation, and cattle consituted their chief wealth. Several of the industrial and fine arts were also cultivated.

১০

কোন আর্য্যজাতি গুণানুসারে এই সকল কার্য্যে ব্রতী হইতেও পারিতেন বোধ হয়। যাহা হউক আমরা এক্ষণে পুরাণাদিতে যে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উল্লেখ দেখিতে পাই, তিনি বৈদিক যুগের ব্রহ্মা নামা পুরোহিত মাত্র, ইহা আমরা বঙ্গের বিখ্যাত পণ্ডিতগণানুমোদিত মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্তের ব্যাখ্যাতে পাইয়াছি। এখনও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারের ফর্দ্দ চাহিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা গুরুবরণ, পুরোহিতবরণ, হোতাব রণ, ব্রহ্মাবরণ, বিরাট-

Mention is made in the Rig-Veda of Artsians Goldsmiths, the Blacksmiths Weavers, Carpenters and Barbers (?). Vide History of Indian people By Adhor Chandra Mukherjee. M. A. B. L.)

এইখানে ঋক্ বেদের অনুবাদক ও প্রকাশক বিশ্ব-বিখ্যাত আচার্য্য Max Mullerএর ভারতীয় জাতিভেদ সম্বন্ধে একটী মত উদ্ধৃত হইল।

If then, with all the documents before us, we ask the question, Does caste, as we find it in Manu and at the present day, form part of the most ancient religious teaching of the Vedas? We can answer with a decided No. There is no authority whatever in the hymns for the complicted system of castes. no authority for the offensive privileges claimed by the Brahmans, no authority for the degraded position of the Sudras.

অর্থ—"এখন যদি কেহ প্রশ্ন করেন—মনু-সংহিতার এবং বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের জাতি-ভেদ প্রথা সুপ্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপ ছিল কি না? আমরা যে সকল দলিল প্রমাণ পাইয়াছি, তদ্দৃষ্টে আমরা নিঃসন্দেহ চিত্তে উত্তর দিব,—না) এই জটীল জাতিভেদ প্রথার কোন উল্লেখ বা প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণগণের এতাদৃশ অপরাধ-জনক সুবিধার দাবীরও কোন দলিল নাই, শূদ্রদিগের এই শোচনীয় পতনের কোন প্রমাণ নাই।

বরণ, প্রভৃতি ষোড়শ বরণের তালিকা প্রদান করিয়া থাকেন। কার্য্যতঃ কিন্তু অধিকাংশ স্থলে এক ক্ষৌরকার আর এক দ্বিজ-বরকে এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে দেখা যায়। কর্ম্মস্থলে ইঁহারা যজমানের "নাপিত" ও "পুরোহিত" বলিয়া অভিহিত হয়েন। উক্ত বরণগুলি ভিন্ন ভিন্ন ঋত্বিকের প্রাপ্য হইলেও তাঁহাদিগের অনুপস্থিতি-নিবন্ধন, অধিকাংশ স্থলে এক পুরোহিত মহাশয়ই সব পাইয়া থাকেন! নাপিত কিন্তু ক্ষৌরকর্ম্মছাড়া অশৌচনাশ, দূর্ব্বা, পুষ্পাদি উপকরণ সংগ্রহ-পূর্ব্বক যতদূর সম্ভব যজমানের হিত সাধন ও পুরোহিতের সাহচর্য্য করিয়া থাকে এবং স্বল্প-লাভেই সন্তুষ্ট হয়। মূল দক্ষিণা ও ভোজন দক্ষিণান্তে গৃহে প্রত্যাগমনকালে হয়ত পুরোহিত মহাশয় উক্ত ব্রহ্মাদি-বরণ সমূহ ও চাউল-বস্ত্রাদি-পরিপুষ্ট বোচ্‌কাটী ঐ নাপিতের মস্তকে চাপাইয়া "নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ"—এই নাতিশীতোষ্ণ বচনটী আওড়াইতে আওড়াইতে নিখরচায় সমুলব্ধ জিনিষগুলা বাড়ী লইবার চেষ্টা করেন। বর্ব্বর নাপিত ঐ বচন শুনিলে বড়ই আমোদ প্রাপ্ত হয়, কারণ মঙ্গলময় খুড়োঠাকুর যখন বলিতেছেন "নরের মধ্যে নাপিতের মত চালাক আর নাই," সুতরাং নিশ্চয়ই জগদীশ্বর তাহাকে এক বিশিষ্ট উপাদানে তৈয়ারি করিয়াছেন, ইহাই তাহার ধারণা!

পাঠক, মহাত্মা রমেশচন্দ্র যাবতীয় হিন্দু শাস্ত্রকে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সকলেই ঐ সমস্ত পাঠ করিতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত বিবাহ সংক্রান্ত শ্লোকটীর টিকাতে তিনি লিখিতেছেন "এক্ষণে যেমন নাপিত বিবাহের বস্ত্র লাভ করে তৎকালে সে বস্ত্র ঋত্বিকের প্রাপ্য ছিল" অর্থাৎ ঐ ঋত্বিকের বংশই নাপিত, একথা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। কিন্তু ঐ ঋগ্বেদের অনুবাদের অন্য এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন—"ঋগ্বেদে সরলভাবে একজন ঋষি বলিতেছেন—দেখ আমি স্তোত্রকার, আমার পিতা চিকিৎসক, আমার মাতা প্রস্তরের উপর যব-ভর্জ্জন-কারিণী। আমরা সকলে

ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠ মধ্যে তৃণ কামনায় ভিন্ন দিকে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধন-কামনায় তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি অতএব হে সোম! তুমি ক্ষরিত হও”—এইখানে রমেশবাবু লিখিতেছেন—“যাঁহারা বৈদিক সময়ে জাতিভেদ ছিল বলিয়া মনে করেন তাঁহারাই বলুন, যে পরিবারের পুত্র মন্ত্র-প্রণেতা ঋষি, পিতা বৈদ্য এবং মাতা ময়দাওয়ালী, তাহারা কোন্ জাতি ভুক্ত?”

রমেশবাবুর এই লিখন-ভঙ্গীতেই বুঝা যাইতেছে যে তিনিও প্রকারান্তরে নাপিতের ঋত্বিকতার স্পষ্টই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু পাঠক মহাশয়ের বোধ হয় এখনও সন্দেহ যায় নাই; আর সহসা যাইবেই বা কেন? প্রায় আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া যে ময়লা জমিয়াছে তাহা সহজে উঠিবে কি! যাক্, হিন্দুর বিবাহ প্রথা যে একটী প্রধান বৈদিক সংস্কার এবং উহা যে ভারতের যাবতীয় আর্য্য-জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল এবং আছে ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন। বিবাহ সংস্কারেও অগ্নিস্থাপনা করিতে হয়। সুতরাং ইহাও একটী যজ্ঞ বিশেষ। যজ্ঞ সমাধা করিতে অন্ততঃপক্ষে ৪ জন (হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা) ঋত্বিক বা পুরোহিতের দরকার। আমরা কিন্তু এক্ষণে পাত্রপক্ষের নাপিত, পুরোহিত আর কন্যা পক্ষের নাপিত, পুরোহিত এই ৪ জন দ্বারাই প্রধানতঃ উক্ত সংস্কার সমাধা হইতে দেখি। বরপক্ষের নাপিত, পাত্রীর (ক’ণের) বস্ত্র তিন খানি (আশোষণ, বিশেষণ ও অধিবিকর্ত্তণের বস্ত্র) এবং ক’ণে পক্ষের নাপিত, বরের বস্ত্র ও দক্ষিণা পায়। অধিকন্তু শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারেই “গৌর গৌর” বলিযা পুরোহিতের সহিত প্রত্যক্ষই সাহচর্য্য করিয়া থাকে। (৬ষ্ঠ অধ্যায় কর্ণকথা দেখুন)

ভবদেব ভট্টের পদ্ধতিতে “নাপিতেন গৌ-র্গৌ-র্গৌঃ” উচ্চারণের পর “ওঁ মাতা রুদ্রানাং দুহিতা বসুনাং” ইত্যাদি

মন্ত্রদ্বারা গাভীকে স্তব করিবার ব্যবস্থা আছে। নাপিত কিন্তু "গৌ-র্গৌ র্গৌঃ" বলিতে যাইয়া "গৌর, গৌর, গৌর" বলিয়া থাকে। নাপিতের মধ্যে অধিকাংশই গৌর ভক্ত ও বৈষ্ণব। গৌর চৈতন্যের নাম শুনিলে তাহাদিগের চৈতন্য লুপ্তপ্রায় হয়। কিন্তু আর্য্যদিগের প্রতিষ্ঠিত এই সকল বৈদিক সংস্কারের সহিত চৈতন্যদেবের নামোল্লেখের কোন কারণ নাই। পতিত-পাবনাবতার গৌরাঙ্গদেব তো সেদিন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কোন্ অনাদি অনন্তকাল পূর্ব্বে বৈদিক সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তাই হয় না। ফলতঃ রজাত বিসর্গ যুক্ত সংস্কৃত "গৌঃ" শব্দটী তিনবার সন্ধি-বদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে গেলে, ব্যাকরণনিয়মানুসারে "গৌ-র্গৌ-র্গৌঃ" হইয়া পড়ে। সংস্কৃতে জ্ঞান না থাকায় মূর্খ, সরলপ্রাণ নাপিত ঐ শব্দ তিনটীকে নাপিতস্থ "গৌর গৌর গৌর" করিয়া ফেলিয়াছে। গৌরাঙ্গ-প্রেমাবেশেই যেন তাহারা ঐ কথা বলিতেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে নাপিতের পক্ষে ঐকথাটী মিথ্যা স্বাক্ষ্য স্বরূপ। কারণ—

গোভিল-গৃহ্য-সূত্রে দেখা যায় যে বিবাহের দক্ষিণা একটী গরু। (গৌর্দক্ষিণা —দ্বিতীয় প্রপাটক্ ২য় খণ্ড ২২) বৈদিক যুগে গরুই আর্য্যদিগের প্রধান সম্বল ছিল। সৃষ্টির প্রারম্ভে তো আর রজত-মুদ্রা বা কাঞ্চন-মুদ্রা তৈয়ারি হয় নাই, সুতরাং তখন পশ্বাদির বিনিময়েই আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। বিবাহের পণও গরু দ্বারা পূরণ করা হইত। তদ্ যথা—

একং গো মিথুনং দ্বেবা বরাতাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্ম স উচ্যতে॥

(মনু ৩য় অধ্যায়—২৯ শ্লোক)

অস্যার্থ—বরের নিকট হইতে একটী বা দুইটী গাভী বা বৃষ লইয়া যথাবিধানে যে কন্যাদান করা হয় তাহাকে আর্য বিবাহ বলে। *

* সাম বেদীয় ধর্ম্মসূত্রের মধ্যে গৌতমীয় ধর্ম্মসূত্রই প্রসিদ্ধ। × × × এই

অধুনা প্রাজাপত্য বিবাহই সমধিক প্রচলিত। সভ্যতা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ অপর প্রথাগুলি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে এবং গোর্দ্দক্ষিণার পরিবর্ত্তে "রজত-খণ্ডং" ব্যবস্থা হইয়াছে। অপিচ দেখা যাইতেছে যে মন্ত্রাদি শেষ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই "দক্ষিণান্ত" করিতে হয়! কিন্তু সরলপ্রাণ ঋষিগণ যখন প্রথমে ব্যবস্থা করেন তখন কার্য্য সমাধান্তে দক্ষিণান্তের ব্যবস্থা ছিল। (গোভিল-গৃহ্য সূত্র দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক বৈদিক বিধানে বিবাহের দক্ষিণা যখন ১টী গরু, তখন বিবাহের দক্ষিণা-স্বরূপ পুরোহিতকে গো-দান করাই এখনও কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল যজমান তো আর আজকাল গরু দান করিতে পারে না, আবার পুরোহিতের পক্ষেও বিশেষ অসুবিধা। আর্য্যদিগের যে কৃষি-কার্য্য প্রধান উপজীবিকা ছিল, কালে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তাহা যখন লোপ পাইল, তখন পুরোহিতের পক্ষেও গো দক্ষিণা গ্রহণ করা বোধ হয় যুক্তিসিদ্ধ হইল না। হাটে বাজারে গরু বিক্রয় করিয়া বেড়ানর চেয়ে কিঞ্চিৎ কম হইলেও যাহা পকেটে করিয়া অনায়াসে লইয়া যাওয়া চলে, তাহাই দক্ষিণা ব্যবস্থা হইল। গো-হাটাও আবার সকল বাজারে নাই,—"ভাদা'লে, আর পদ্মবিলে!" কিন্তু বৈদিক মন্ত্রের ত অঙ্গহানি করা যায় না! অতএব "গরু আছে, পুরোহিত মহাশয় কার্য্য সামধা করুন"-এরূপ সাক্ষ্য যদি কোন প্রধান (প্রামাণিক) ব্যক্তি

(ধর্ম্মসূত্রের) গৃহস্থ ধর্ম্ম বিবরণের মধ্যে চতুর্থ অধ্যায়ে গৌতম আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য্য, প্রজাপত্য, আসুর গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। তাহার মধ্যে প্রথম চারিটী উৎকৃষ্ট এবং শেষ চারিটী অপকৃষ্ট, এই অধ্যায়ে মিশ্র জাতির বিবরণও আছে। সে সময়ে অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ, দৌষন্ত, পারশব, সূত, মাগধ, আয়োগব, ক্ষত্তা, বৈদেহিক, চণ্ডাল, ধীবর, পুক্কস, ভূজ, কণ্ঠ, মাহিষ, যবন ও করণ এই অষ্টাদশ বিধ মাত্র মিশ্রজাতি বলিয়া জ্ঞাত ছিল। (৺রমেশচন্দ্র দত্তের হিন্দু শাস্ত্র ৩য় ভাগের ৮ পৃষ্ঠা)—

বলেন, তবে অনায়াসে ঐ কার্য্য সমাধা হইতে পারে। তাই নাপিতের দ্বারা (পূর্ব্বোক্ত ছড়াটী বলিবার অজুহাতে) "গৌ-র্গৌ-র্গৌ বলান হয়। কোন কোন মতে আবার গবালম্ভ্যও বুঝায়। মধুপর্কে পশুবধ যখন নিষিদ্ধ হইল, তখনই এই অভিনব প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর দ্বিতীয় বার হরগৌরীর বিবাহের সময়. বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত আর্ষ বিবাহ প্রচলিত ছিল। কারণ আর্ষবিবাহে যে গরু (গাভী বা বৃষ) কন্যায় পিতা পণ স্বরূপ গ্রহণ করিতেন, উহা আবার যৌতুক স্বরূপ জামাতাকে ফেরৎ দেওয়াও হইত। তাই বোধ হয় 'ষাঁড়' শিবের বাহন হইল। এক্ষণে পাঠক বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে গৌর বচন কথাটী ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ। উহা "গৌর্বচন" এইরূপ হইবে। অধুনা গরু বা গাভী কুত্রাপি বিবাহ সভায় দেখা যায় না, তবে অগ্নিহোত্রী স্বরূপ হুঁকো কল্‌কে হাতে করিয়া নাপিত ঠাকুরকে প্রায়ই বিবাহের সঙ্গে চেতন পদার্থ অথচ জড়স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ বিদ্যমান দেখা যায়! এখন বলিতে পারি কি—

"এ দুঃখের কথা আমি কার কাছে কই।
যার ধন তার ধন নয়, নেপো মারে দই॥"

নাপিত-বামুন।

মহাভারতে ভরদ্বাজ মুনি, মহর্ষি ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"ব্রাহ্মণো কেন ভবতি" ইত্যাদি—অর্থাৎ কিরূপে ব্রাহ্মণ হয়? ইহার উত্তরে ভৃগু কহিলেন—

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈ সংস্কৃত শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ষট্‌সু কর্ম্মস্ব বস্থিতঃ॥
শৌচাচার স্থিতঃ সম্যগ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্য ব্রতী সত্যপর সবৈ ব্রাহ্মণো উচ্যতে॥

অর্থাৎ যাঁহারা জাত-কর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত, পবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত হইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যা বন্দন, স্নান, তপঃ, হোম, দেবপূজা ও অতিথি সৎকার এই ষট্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা শৌচাচারপরায়ণ, নিত্যব্রহ্মনিষ্ঠ, গুরুভক্ত ও সত্য-নিরত তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

মহর্ষি ভৃগু ব্রাহ্মণত্বের যে সকল উপাদান দেখাইয়াছেন তন্মধ্যে প্রথমেই জাতকর্ম্মাদি অর্থাৎ সূতিকাগৃহে জননা-শৌচ-নাশ, চূড়াকরণ ও উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা শুচি হইবার ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে। এই সকল কার্য্য কে বা কাহারা করিবে তাহার কোন উল্লেখ নাই, দশবিধ সংস্কারের মধ্যে জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ (মৌঞ্জীবন্ধন), উপনয়ন (পৈতাগ্রহণ) ও বিবাহ এই কয়টী প্রধান। এই কয়টী সংস্কারেই নাপিতের কার্য্য অপরিহার্য্য অর্থাৎ প্রথমে নাপিত দ্বারা মুণ্ডিত না হইলে কোনরূপেই শুচি হইবার উপায় নাই। তুলসী, গঙ্গাজল প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণ যে কোন অপবিত্রকে পবিত্র করিতে পারেন কিন্তু নাপিতের কার্য্য নাপিত ভিন্ন কোন রূপেই সমাধা করিতে পারেন না আর ঐ সকল সংস্কার না প্রাপ্ত

হইলে সে যে জাতিই হউক শূদ্র থাকিবে। যোনিসম্ভূত মানব মাত্রই প্রথমে শূদ্রাবস্থায় থাকে, কেননা ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছেন—

জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারাৎ দ্বিজো উচ্চতে।
বেদপাঠে ভবেৎ বিপ্র ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

অস্যার্থ—মানব জন্ম দ্বারা শূদ্র ; জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা দ্বিজ, বেদ পাঠ করিলে বিপ্র, আর ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে।

অতএব ব্রাহ্মণের ছেলে হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না, এইজন্যই ভৃগু মহাশয় সর্ব্বাগ্রে জাতকর্ম্মাদি সংস্কারের নাম করিতেছেন, পাঠক, এ বড় শক্ত কথা ; সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ভগবান মনুর মত এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক, কারণ অন্যের মত উড়াইয়া দিলেও মনুর মত খণ্ডিত হইবার নহে। শূদ্রের বেদাধিকার কেন উচ্ছেদ হইল তাহাও বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন। (মনু—২য় অধ্যায় দেখুন)

বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈনিষেকাদি দ্বিজন্মনাম্।
কার্য্যঃ শরীর সংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহচ॥ ২৬
গার্ভৈ র্হোমৈ র্জাতকর্ম্মচৌড় মৌঞ্জী নিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভি কঞ্চৈনো দ্বিজানাম পমৃজ্যতে॥২৭

অস্যার্থ—বৈদিক পুণ্যকার্য্য দ্বারা দ্বিজাতিগণের শরীর সংস্কার করা কর্ত্তব্য। এই সকল বৈদিক সংস্কার ইহকাল ও পরকালের পক্ষে পাবন স্বরূপ। ২৬। (ন পাতং কুতে ইতি নপাত মনে করুন)

গর্ভকালীন গর্ভাধানাদি যে যে হোম করা যায়, জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ ও উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা দ্বিজাতিগণের বীজ পবিত্র ও গর্ভজাত জন্য পাপ সমূহ ক্ষয় হইয়া থাকে। ২৭॥

পাঠক বোধহয় বুঝিয়াছেন যে উক্ত শ্লোক দ্বিজাতি শব্দের প্রয়োগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণকেই বুঝাইতেছে। উপনয়ন সংস্কারের

পর, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যথাসাধ্য বিদ্যার্জ্জন করত সংসারধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন আর ব্রাহ্মণসন্তান উপনয়নান্তে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুগৃহে অবস্থান এবং তথায় বেদাদি অধ্যয়ন পূর্ব্বক বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তৎপরে ব্রহ্মজ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক সংযম, আত্মশুদ্ধি ও তপস্যাদি দ্বারা সিদ্ধ হইলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন এবং তখন ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হয়েন।

কোন্ সময়ে চূড়াকরণ ও উপনয়ন সংস্কার করা উচিত? মনু বলিতেছেন—

চূড়াকর্ম্ম দ্বিজাতানীং সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মতঃ।
প্রথমে অব্দে তৃতীয়ে বা কর্ত্তব্যং শ্রুতি চোদনাৎ॥ ৩৪॥
গর্ভাষ্টমে অব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনয়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাদ্দ্বাদশেবিশঃ॥ ৩৬॥
ব্রহ্মবর্চ্চ সকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে॥ ৩৭॥
আ ষোড়ষাদ্ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতি বর্ত্ততে।
আ—দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রোবন্ধোয়া চতুর্বিংশতেবিশঃ॥ ৩৮
অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যা ভবন্তি—আর্য্যবিগর্হিতাঃ॥ ৩৯
নৈ তৈর পূতৈ বিধি বদাপদ্যপি হি কর্হিচিৎ।
ব্রাহ্মণ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধা নাচরেদ ব্রাহ্মণঃ সহ॥ ৪০

অর্থ—

শ্রুতির বিধান মতে দ্বিজাতিগণের প্রথম বা তৃতীয় বর্ষে কুলধর্ম্ম অনুসারে চূড়াকরণ সংস্কার বিধেয়॥ ৩৫

গর্ভ মাস ধরিয়া অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের, একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের এবং দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যের উপনয়ন প্রশস্ত॥ ৩৬

প্রকৃষ্ট ব্রহ্মতেজঃকামী ব্রাহ্মণের, বলার্থী ক্ষত্রিয়ের এবং ধনকামী বৈশ্যের যথাক্রমে গর্ভ-পঞ্চম, গর্ভ-ষষ্ঠ, গর্ভ-অষ্টম বর্ষে স্ব স্ব বালকের উপনয়ন দেওয়া কর্ত্তব্য॥ ৩৭

ব্রাহ্মণের গর্ভ ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের গর্ভ দ্বাবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের গর্ভ চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়ন কাল অতিক্রম হয় না। এই তিন বর্ণ যদি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত অর্থাৎ সংস্কারপ্রাপ্ত না হয়, তবে উপনয়ন ভ্রষ্ট ও সাবিত্রীপতিত হইয়া সাধু সমাজে নিন্দনীয় হন এবং ইহাদিগকে "ব্রাত্য" বলা হয়॥ ৩৯

এই সকল অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত ব্রাত্যের সহিত ব্রাহ্মণগণ আপদ্ কালেও যাজনাধ্যাপনাদি বেদসম্বন্ধ অথবা কন্যাদানাদি যোনি সম্বন্ধ রাখিবেন না॥ ৪০

আচ্ছা পাঠক, এক্ষণে বলুন দেখি যাঁহারা আমাদিগের হিন্দু শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ অথবা দ্বিজ বটে ত! আর ঐ দ্বিজত্ব লাভ করিতে হইলেই জাত-কর্ম্ম, চূড়াকরণ ও উপনয়নাদি যথাকালে তাঁহাদিগকে সমাধা করিতে হইয়াছিল। কারণ ঐ সকল সংস্কার প্রাপ্ত না হইলে দ্বিজবরকে শূদ্র অথবা ব্রাত্য হইতে হয়। সুতরাং তাঁহার বেদাধিকার বা ব্রাহ্মণত্ব পাওয়া অসম্ভব। আবার জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ ও উপনয়ন নাপিত ভিন্ন কোনরূপেই সমাধা হয় না, তাহা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি। তাহা হইলে নাপিতকে ব্রাহ্মণ সৃষ্টির পূর্ব্বেই ক্ষুরহস্তে এ ভারতে আসিতে হইয়াছিল। আর নাপিতের যিনি আদি পুরুষ তাঁহাকেও প্রাপ্তবয়সে ব্রাহ্মণের বীজ পুরুষগণের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সমাধা করিতে হইয়াছিল; একথা বোধ হয় সকলকেই মানিতে হইবে, অন্যথা ভগবান স্বায়ম্ভুব মনুর উক্ত বচনসমূহ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আবার ইহাও প্রত্যক্ষ যে কর্ম্মী সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেই

কর্ম্মের সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে সে কর্ম্মী আসিয়া করিবে কি? একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক, মনে করুন একটা নূতন রেলওয়ে ষ্টেসন খোলা হইল (অবশ্য Flag station) কর্ত্তৃপক্ষ বড় জোর প্রথমে একজন ষ্টেসন মাষ্টার, একজন Signal man ও একজন খালাসীর দ্বারা ঐ ষ্টেসনের কার্য্য আরম্ভ করিলেন, পরে যেমন যাত্রী ও মালপত্র বাড়িতে লাগিল ক্রমশঃ আসিষ্টাণ্ট ষ্টেসন মাষ্টার, তারবাবু, মালবাবু, টিকেটবাবু ইত্যাদিও আবশ্যক হইল। (এইরূপে Post create হইল) কিন্তু যাঁহারা ঐ ষ্টেসন তৈয়ারি করতঃ উহার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ঐ সকল ষ্টেসন মাষ্টারাদি বাবুকে পাঠাইলেন, তাঁহারা ত ঐ ষ্টেসন সৃষ্টির পূর্ব্বেই জন্মিয়াছিলেন, নৈলে ষ্টেসন ও তাহার কার্য্যাদির বিধি-ব্যবস্থা হইল কিরূপে? আবার ঐ সকল কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যাহার যখন আবশ্যক হইয়াছিল, তাহাকে সেই সময়েই পাঠান হইয়াছিল, অর্থাৎ যখন টিকিট বিক্রয়ের সময় হইল, তখন বুকিংক্লার্ক আসিলেন, যখন মাল পত্র বুক করিবার দরকার হইল, তখন গুড্সক্লার্ক আসিলেন, যখন বৈদ্যুতিক তারের কার্য্যারম্ভ হইল, তখন তারবাবু আসিলেন, কিন্তু এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যও যতদিন একজনের সাধ্যায়ত্ত থাকে, ততদিন এক ষ্টেসন মাষ্টারই সমস্ত নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

এই মানব সৃষ্টির ব্যাপারেও ঠিক ঐরূপই হইয়াছিল। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ যখন সর্ব্বজাতির অগ্রে সৃষ্ট হইলেন, আর নাপিত না হইলেও ব্রাহ্মণত্ব অসম্ভব, কারণ জাত-মাত্রই নাপিতের আবশ্যক, তখন নাপিতও ব্রাহ্মণেরই অব্যবহিত-পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল। যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে কতকগুলা মানব, সৃষ্টির প্রথমে অসংস্কৃত অবস্থায় থাকিয়া নাপিতের কার্য্য অবলম্বন করিয়াছিল, এবং তাহাদের পরবর্ত্তী মানবের জাত-কর্ম্মাদি সংস্কার করিয়া তাহাদের ব্রাহ্মণত্ব পাইবার উপায় করিয়া দিয়াছিল।

অথবা প্রয়োজন বোধে একজন লোককে ভগবান সর্ব্বাগ্রেই নাপিতের বীজ পুরুষরূপে পাঠাইয়াছিলেন। তিনিই বয়োপ্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ সৃষ্টির সুরু হইয়াছিল। পাঠকের বোধ হয় ধৈর্য্য-চ্যুতি হইয়াছে, সুতরাং এইবার আমার উদ্দেশ্য প্রকাশ করি—শাস্ত্রে মানব সৃষ্টি বিষয়ে এইরূপ বিধান আছে যে ব্রহ্মা, প্রজাপতি প্রভৃতি কয়েকজন ঋষিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা অপরাপর মানবের সৃষ্টি সাধন করিয়াছিলেন—(এই পুস্তকের ১৩।১৪ পৃষ্ঠা দেখুন)। মানব সৃষ্টি বিষয়ে এই মতই বোধহয় সর্ব্ববাদী-সম্মত। ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে ৪ রকমের মানব জন্মিয়াছিল, ইহা কল্পনা মাত্র। তবে প্রথমে দেবতা, পরে ব্রাহ্মণ পরে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণেরাই অপরাপর জাতির নিদান ইহা স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত (Darwin theory) আমাদিগকেও মানিতে হয়। এইখানে একটী বংশাবলীর চিত্র দিলে বোধ হয় ব্যাপারটী পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে।

ব্রহ্মা—(প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণের অগোচর)
স্বায়ম্ভুব মনু
১ মারিচি
২ অত্রি
৩ অঙ্গিরা
৪ পুলস্ত্য
৫ পুলহ
কশ্যপ
দুর্ব্বাসা
গর্গ
বিশ্বশ্রবা
(ঔর্ব্ব ঋষির কন্যা কৌন্দলীকে বিবাহ করেন)
(গর্গঋষি নাপিতের গোত্র)
বিবস্বান্ (সূর্য্যদেব)
কুবের (যক্ষরাজ)
রাবণ (রাক্ষস-রাজ)
(বিংশতি পুরুষ পরে)
সগর
অসমঞ্জা
অংশুমান
দিলীপ (২)
ভগীরথ
ভীম
সত্য
দিলীপ
রঘু
অজ
দশরথ
রাম, লক্ষণ, ভরত শত্রুঘ্ন (সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়)
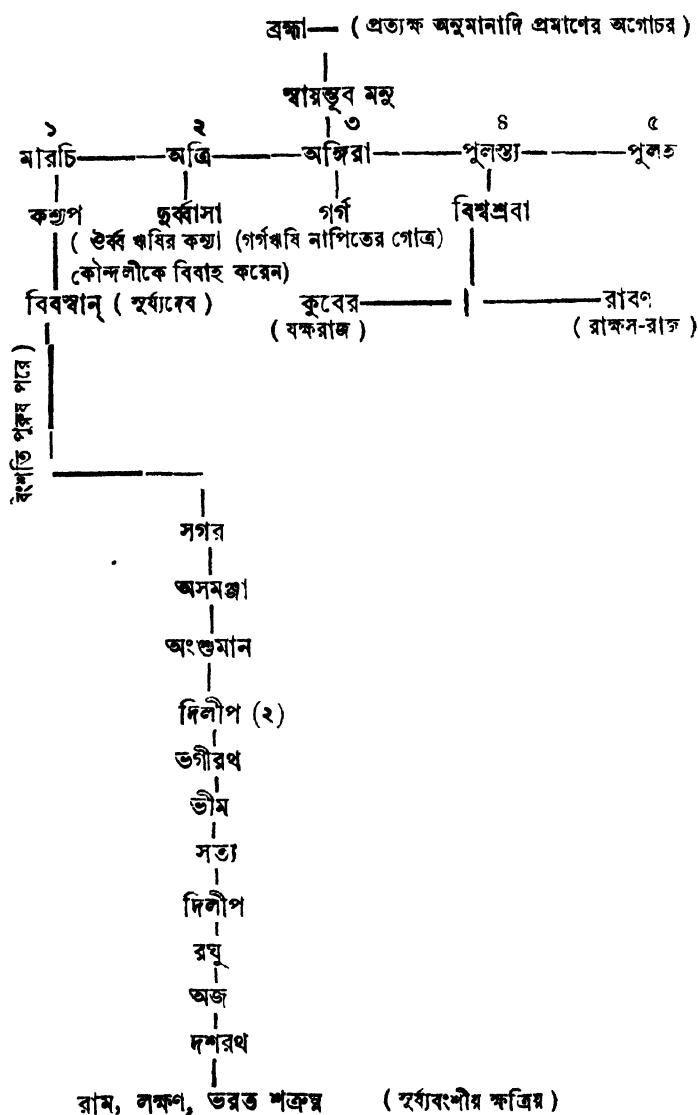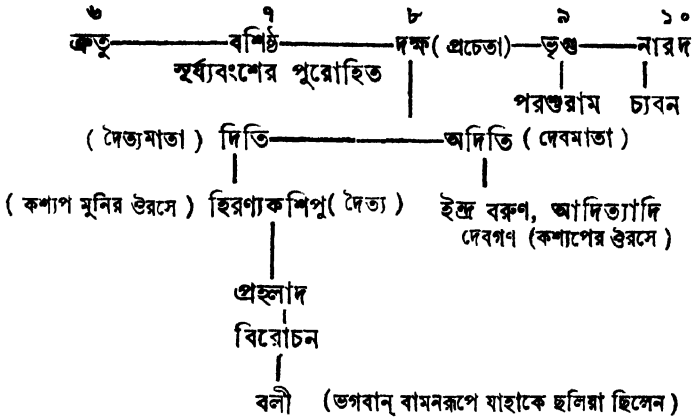
উপরে যে দশজন ঋষির নাম দেখিতেছেন, ইঁহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং প্রজাপতি বা আদিম ঋষি বলিয়া খ্যাত। এই প্রজাপতিগণ হইতে সপ্ত মনুর উৎপত্তি হয়। প্রজাপতিগণ ও মনুবর্গ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মার মানস অনুসারে স্বায়ম্ভুব মনুর নিকট পুত্রত্ব স্বীকার করেন। ঐ সকল ঋষি এবং মনু হইতে প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে, এজন্য ঋষিগণ জগতের পিতৃপর্য্যায় এবং ব্রহ্মার সহিত পিতামহ সম্বন্ধ। প্রজাপতিকে মানব সাধারণের পিতা আর ব্রহ্মাকে পিতামহ বা ঠাকুরদাদা বলে। এক্ষণে দেখুন ঐ সকল ঋষিই লোক সমুহের বীজপুরুষ কি না। সপ্তম স্থানে যে বশিষ্ঠ ঋষিকে দেখিতেছেন উনিই সুদূর ভবিষ্যতে কুরু পাণ্ডবের সৃষ্টি করিবেন। কারণ বশিষ্ঠের পুত্র শক্তৃ, শক্তৃপুত্র পরাশর, পরাশরের পুত্র ব্যাসদেব, ব্যাসদেবের ঔরসেই নিয়োগবিধিতে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম হয়। তন্মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন, দুঃশাসনাদি এক শত পুত্র আর পাণ্ডুর যুধিষ্টির ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব এবং ধর্ম্মপ্রাণ বিদুরেরও অনেকগুলি সন্তান হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরুপাণ্ডব ও বিদুরের বংশ নির্ম্মূল হইয়াছিল, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু, অভিমন্যুর পুত্র

পরীক্ষিত, পরীক্ষিতের জন্মেজয়—এই পর্য্যন্ত সকলেই জানেন কিন্তু দুর্য্যোধনের অপরাপর ভ্রাতার বিশেষতঃ বিদুরের সন্তানগণের কি হইল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। কে বলিবে যে কুরু পাণ্ডবের বংশধরগণের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ অদ্যাপি বর্ত্তমান নাই! বেশ বুঝা গেল যে ঐ দশজন ঋষি এবং সপ্তমনুর সন্তানসন্ততিতে এই পৃথিবী জুড়িয়া গিয়াছে। যেমন ক্ষুদ্র একটি সুপারি পরিমাণ ফলের মধ্যে শাখা-প্রশাখাদি যুক্ত প্রকাণ্ড অশ্বথ বৃক্ষের বীজ সঞ্চিত থাকে, সেইরূপ ঐ দশজন ঋষি ও সপ্তমনুর সন্তানই কালে এই বৃহৎ মনুষ্য সমাজ সৃষ্টি করিয়াছে। দেব, দৈত্য, যক্ষ রক্ষদিও উঁহাদেরই বংশধর। যাহাহউক নাপিত তাহা হইলে কোন্ তারিখে জন্মিল! নিশ্চয়ই ঐ সকল ঋষির ঔরসে যাঁহারা জন্মিয়াছিলেন তাঁহাদের পূর্ব্বেই নাপিতকে জন্মিতে হইয়াছিল! নচেৎ তাঁহারা জাতকর্ম্মাদি সংস্কার পাইলেন কাহা দ্বারা? পাঠক এইবার ব্রহ্মা নামা ঋত্বিক ও নাপিতের গৌর্বচনে "যাবচ্চন্দ্র দিবাকর, নাপিত বামুন একেত্তর" স্মরণ করুন আর ঐযে Flag stationএর দৃষ্টান্ত দিয়াছি মিলাইয়া লউন—

নবম স্থানে যে ভৃগু মহর্ষির নাম দেখিতেছেন, উনিই বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ হইতে হইলে প্রথমে জাতকর্ম্মাদি সংস্কার হওয়া আবশ্যক। এই ভৃগু মহাশয় আবার মনুর আজ্ঞাতে মনুসংহিতা প্রনয়ন করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং উক্ত ঋষির বচন ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান গুলি ব্রাহ্মণকে অসংকোচে অম্লান-হৃদয়ে মানিতেই হইবে। তাহা হইলেই নাপিতকেও চূড়াকরণ উপনয়নাদি বৈদিক অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই জন্মিতে হইয়াছিল, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। কেহ যদি প্রশ্ন করেন যে ঐ কয়জন ঋষি এবং সপ্তমনুর জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিল কে? উত্তর, উঁহাদের সংস্কার দরকার হয় নাই, কারণ উঁহারা ব্রহ্মার অর্থাৎ সৃষ্টি-কর্ত্তার মানসে উৎপন্ন, যোনি-সিম্ভূত নহে। সুতরাং যাঁহারাই মানস-পুত্র রূপে

জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার না হইলেও কোন দোষ হয় না। সংস্কারের উদ্দেশ্য কি? ওজঃবীর্য্যের দোষ ও গর্ভজাত জন্য পাপ সমূহের ক্ষয় করিবার জন্যই সংস্কার আবশ্যক (১৩০ পৃষ্ঠা ২৭ শ্লোক দেখুন)। তাহা হইলে নাপিত কি ব্রাহ্মণের অগ্রে জন্মিয়াছিল? নিরুপেক্ষভাবে বিচার করিলে তাহাই হইবে, কেননা এদিকেও "নাপিত-বামুন"! "বামুন-নাপিত" বলিতে কেহ শুনিয়াছেন কি? কোন "একঘ'রে"লোককে জাতি তুলিবার সময় অথবা কোন বৈদিক ক্রিয়াকলাপের সময়, "নাপিত-বামুন ঠিক হয়েছে কি?"—এই কথাটী অনায়াসলব্ধভাবে আজিও জিহ্বাযন্ত্রে উচ্চারিত হয়। পক্ষান্তরে 'নাপিত-বামুন' একটী সমস্ত পদও হইতে পারে, যেমন "রামেশ্বর" অর্থাৎ যিনি রাম তিনিই ঈশ্বর, তেমনি যিনি নাপিত তিনিই ব্রাহ্মণ, কারণ ষট্‌কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণকে আবার "অগ্রজন্মা" বলা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের জন্ম অন্যান্য বর্ণের অগ্রে হইয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মণের একটী নাম 'অগ্রজন্মা' কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে নাপিত ব্রাহ্মণের পূর্ব্বে না জন্মিলে ব্রাহ্মণত্বের পথে অনেক ব্যাঘাত পড়ে,—হইতেই পারে না! সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে নাপিতই "অগ্রজন্মনঃ!"

সর্ব্বনাশ কি করিলাম! বামন হয়ে চাঁদে হাত!!

পঙ্গু হ'য়ে সাধ করে, গিরি লঙ্ঘিবারে!!! পাঠক, যদি সত্যের অপলাপ না করিতে হয়, যদি জগতে নিরুপেক্ষ সমালোচক কেহ থাকেন যদি কলির তমঃ এক মুহূর্ত্তের জন্য অবসর দেয়, তাহা হইলে আশাকরি আমার যুক্তি ও উক্তি অসঙ্গত বলিয়া কেহ প্রতিবাদ করিবেন না। কলিযুগ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহামুনি পরাশর নাকি বলিয়াছেন—

শূদ্র কন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মনেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসো অসংস্কারে তু নাপিতঃ॥

বিবাহিত শূদ্র কন্যাতে ব্রাহ্মণ দ্বারা যে সন্তান উৎপন্ন হয় সেই সন্তান

জাত কর্ম্মাদি সংস্কার না পাইলে "নাপিত," আর সংস্কার পাইলে "দাস" হয়। পরাশরের এই বচনে এক অতি গূঢ় রহস্য আছে, এই শ্লোক অবলম্বন করিয়াই আমি নাপিতের জন্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি। ব্রাহ্মণ সন্তান সংস্কার না পাইলে নাপিত হইল, ইনিই নাপিতের বীজ পুরুষ! কিন্তু সেই বীজ-পুরুষের সংস্কার হওয়া যে অসম্ভব, তাহা প্রভু প্রকাশ করিলেন না! কারণ নাপিত না জন্মিলে জাতকর্ম্মাদি সংস্কার হয় না সুতরাং উক্ত বীজ পুরুষেরও সংস্কার হইল না। আবার ঐরূপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সংস্কারও হইতে পারে না; তাহা হইলেই নাপিতকে সৃষ্টির গোড়াতে পত্তন করিতে হইল! পক্ষান্তরে একই ক্ষেত্রে অপর সন্তানটীর সংস্কার হইলেও তিনি "দাস" হইলেন! বা! বাহবা শাস্ত্রকার!! কেহ হয়ত বলিবেন যে দাসের সংস্কার বলিলে চূড়াকরণ ও উপনয়ন ব্যতীত মাত্র জাত-কর্ম্ম ও বিবাহাদি বুঝাইবে। আমি বলি "আত্মা বৈজায়তে নরঃ"-অসবর্ণ-বিবাহ যখন প্রচলিত ছিল, আর মনুর বিবাহবিধিমতেই শূদ্রাকে বিবাহ করিয়া ব্রাহ্মণ তাহাতে যখন সন্তান উৎপাদন করিলেন, তখন সেও ত ব্রাহ্মণ হইবে। সেই শূদ্রা পত্নীকে বিবাহ করিয়া অবশ্য তাঁহাকে মাঠে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল না। তাঁহা দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জনাদি তৈয়ারি করিয়া যথাকালে উদরসাৎ করত স্বামী-স্ত্রীরূপে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করা হইয়াছিল। "আত্মাই যদি পুত্ররূপে স্ত্রীরগর্ভে জন্মগ্রহণ করে" তবে তো সে সন্তান ব্রাহ্মণ হইবেই, তাঁহার সংস্কার হইবে না কেন? সেও ত অনুলোমজ সন্তান! প্রত্যুতঃ নাপিত না জন্মিলে হিন্দুত্বের উপকরণ গুলিরই অভাব হইয়া পড়ে। স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্বের গোড়াতেই রহিয়াছে—"অশৌচান্ত দিনে কৃত্যং জননেঽপিচ মুণ্ডনং" ব্রাহ্মণাদি বর্ণের যে সকল অশৌচ বিধি আছে অর্থাৎ পিতা মাতা মরিলে বা সপিণ্ডের

সন্তানাদি জন্মিলে ব্রাহ্মণ দশ দিন, ক্ষত্রিয় ১৩ দিন বৈশ্য ১৫ দিন এবং শূদ্রকে ৩০ দিন অশৌচ পালন করিয়া মস্তকাদি মুণ্ডন করিতে হইবে। (কে করিবে তাহা রঘুনন্দনও বলেন নাই।)

আবার মনু বলিতেছেন যে—

হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শাম্ ।
ক্ষয্যামর্শাপ্য পস্মারি শ্বিত্রি কুষ্টিকুলানিচ ॥

অর্থাৎ হীনক্রিয় (জাত কর্ম্মাদি সংস্কার ক্রিয়া রহিত) নিষ্পুরুষ অর্থাৎ যে কুলে পুরুষ জন্মায় না, কেবল কন্যামাত্র প্রসূত হয়; নিশ্ছন্দ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন রহিত, রোমশ অর্থাৎ বহু লোমযুক্ত, অর্শ, রাজযক্ষ্মা, মৃগী, ধবল ও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বংশের কন্যা বিবাহ করিবে না।

অথাৎ বিবাহ করিবার সময় অগ্রে ব্রাহ্মণকে দেখিতে হইবে যে পাত্রীটির পিতৃকুল যথাবিধানে নাপিতদ্বারা সংস্কৃত ও অশৌচাদি নাশ পূর্ব্বক শুদ্ধীকৃত কিনা। পাঠক বোধ হয় জানেন যে সকল বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ কিন্তু ব্রাহ্মণের গুরু কে? "ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণ গুরু," তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অশৌচ নাশের বেলাও ব্রাহ্মণের আবশ্যক। অপেক্ষাকৃত নির্গুণ, হীনবীর্য্য বা আচার-বিহীনের দ্বারা কি ব্রাহ্মণের অশৌচ নাশ সম্ভব? শুদ্ধি, শোধন করিবার শক্তি না থাকিলে কি নাপিতকে অশৌচ নাশের নিদান মনে করা যায় বা তাহাকে "স্পার্শমণি" বলা যায়? সকলেই জানেন—

"প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা
ম'রগে পাপি যথা তথা"

প্রয়াগতীর্থ সর্ব্বপাপনাশকরী এবং হিন্দুতীর্থ-ক্ষেত্র-মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু সেখানেও নাপিত ভিন্ন পাপ নাশ হইবার উপায় নাই, কারণ নাপিত ভিন্ন মুণ্ডন করিবে কে? ফলতঃ সংস্কারাদি ব্যাপারে ও অশৌচনাশ পক্ষে

নাপিতই হিন্দু সমাজের প্রধান সহায়। কিন্তু তাহা হইলেও তো বড় কঠিন সমস্যায় পড়া গেল; শুধু যুক্তিবলে আর কতই বা বলিব আর লোকেই বা মানিবে কেন? দেখা যাউক ব্রাহ্মণ স্বহস্তে এখনও নাপিতের কার্য্য করেন কিনা এবং ২।১টা নমুনা নাপিত-বামুন এই পৃথিবীতে আছে কি না?

১৩১৯ সালের বটকৃষ্ণ পালের পাঁজীতে "চূড়াকরণের" উপকরণ লিখিতে নাপিতকেও একটা উপকরণ অর্থাৎ অচেতন পদার্থ স্বরূপ ধরা হইয়াছে। ব্যবস্থাটী দেখিয়া বড়ই বাধিত হইলাম। নাপিতকেও যে পূজার দ্রব্য সম্ভার মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে, সেটা নাপিতের কতকটা সৌভাগ্য বটে। এক্ষণে এই চূড়াকরণ ব্যাপারটা কি সকলে স্বচক্ষে দেখুন এবং নাপিত কে তাহা বিচার করুন।

পুরোহিত দর্পণোক্ত ব্যবস্থা

(গোভিল-গৃহ্যসূত্রানুযায়ী।)

সামবেদীয় চূড়াকরণ—পিতা অগ্নির দক্ষিণেস্থিত ক্ষুরপাণি নাপিতকে দেখিয়া পরবর্ত্তি মন্ত্র পড়িবেন—প্রজাপতিঋষিঃ **সবিতা দেবতা** চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। "**ওঁ অয়মাগাৎ সবিতা ক্ষুরেণ।**" পরে কাংশপাত্রস্থিত গরমজল দেখিয়া পরের মন্ত্র পড়িবে,—প্রজাপতিঋষি বায়ুর্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। **ওঁ উষ্ণেন বায়ুউদকেনৈধি।** এই সময় বাম হস্ত দ্বারা পুত্রের দক্ষিণ কর্ণের কিঞ্চিৎ উপরিভাগের কেশ লইয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা পূর্ব্বস্থাপিত কিঞ্চিৎ উষ্ণোদক লইয়া এই জলে ঐ কেশ ভিজাইয়া দিবে, মন্ত্র—"প্রজাপতিঋষি রাপো-দেবতা চূড়া করণে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপ উদন্তুজীবসে।"

অনন্তর ক্ষুর দেখিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রে—

"প্রজাপতি ঋষি বিষ্ণুর্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্টোর্দ্দংষ্ট্রোঽসি" বলিবেন। পরে পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত দর্ভপিঞ্জলীর একটী লইয়া দক্ষিণ কর্ণের উপরিভাগের আদ্রকোণে ঊর্দ্ধমূল করিয়া বন্ধন করিবে, মন্ত্র যথা—"প্রজাপতি ঋষিরোষধির্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। "ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনং"। পরে বাম হস্ত দ্বারা গৃহীত দর্ভপিঞ্জলী সহিত কর্ণের উপরিভাগে দক্ষিণ হস্তস্থিত ক্ষুর দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্পর্শ করিবে ; মন্ত্র যথা—"প্রজাপতি-ঋষি 'স্বধিতির্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতেমৈনং হিংসীঃ"। আবার ঐ স্থানের কেশ পূর্ব্ববৎ মন্ত্রদ্বারা স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পড়িবে ;—"প্রজাপতিঋষি পুষাদেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ—ওঁ যেন পূষা বৃহস্পতে-র্ব্বায়োরিন্দ্রস্য চাবপৎ তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় দীর্ঘায়ুষ্টায় বলায় বর্চ্চসে!" পরে ঐ ক্ষুর দুই বার নাড়িয়া দক্ষিণ কর্ণের উপরি-ভাগের চুল কর্ত্তন করিয়া বৃষ-গোময় পাত্রে দর্ভপিঞ্জলী সহিত রাখিবে। পরে সন্তানের মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগে নিম্ন স্থানের কেশ উষ্ণজল দ্বারা ধৌত করিয়া ক্ষুর দর্শন ও দর্ভপিঞ্জলী সংযোগ প্রভৃতি মন্ত্র পড়িয়া করিতে হইবে। ঐরূপ বামকর্ণের ঊর্দ্ধ স্থানের কেশো-উষ্ণজল প্রক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ করিতে হইবে। পরে পিতা উভয় করতল দ্বারা কুমারের মস্তক আবৃত করিয়া এই মন্ত্র পড়িবেন—

"প্রজাপতিঋষি রুষ্ণিকছন্দো যমদগ্নিকশ্যপাগস্ত্যাদয়ো দেবতাশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ জমদগ্নে ত্র্যায়ুষং, অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং। তত্তেঽস্তু ত্র্যায়ুষং"। তৎপরে বস্ত্রাদি ভূষিত নাপিত পূর্ব্ব বা উত্তরাস্য কুমারের মস্তক মুণ্ডন ও কর্ণবেধ করিবে। সকল কেশ বাঁশবনে বা অরণ্যে বা মৃত্তিকা গর্ভে নিক্ষেপ করিবে। পরে পিতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া অগ্নিতে সমিধপ্রক্ষেপ পূর্ব্বক উদ্দীচ্য কর্ম্ম করিবেন।

প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণবও বলিতেছেন—

"চূড়াকরণ—(ক্লী) চূড়ায়াকরণং ৬ তৎ। ১০ দশবিধ সংস্কারের অন্তর্গত ১টী সংস্কার, গর্ভাধান প্রভৃতি সংস্কারের ন্যায় এই সংস্কারটীও হিন্দুগণের বিশেষ আদরণীয় ও অবশ্যকর্ত্তব্য। "মুহূর্ত্ত চিন্তামণি"র মতে গর্ভাধান বা জন্মদিন হইতে তৃতীয়, পঞ্চম বা সপ্তম বর্ষে চূড়াকরণ করিবে। কিন্তু মনুর মতে প্রথম বর্ষেও চূড়ার বিধান আছে, "পীযুষধারায়" মতে গৃহ্যসূত্রে যাহার যে বিধান আছে, তাহার তদনুসারেই চূড়াকরণ করা উচিত। অনেক স্থানে উপনয়নের সহিতই এই সংস্কারটী হয়; আবার কোনও স্থলে পৃথকরূপে প্রচলিত আছে। বিবাহাদির ন্যায় চূড়াকরণও বেদভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।"

"ভবদেব ভট্টকৃত "দশকর্ম্ম-পদ্ধতি"তে সামবেদীয় চূড়াকরণ এই প্রকার লিখিত আছে।—যে দিন চূড়াকরণ হইবে, সেই দিন প্রাতে বালকের পিতা যথানিয়মে প্রাতঃস্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে। তৎপরে কুশণ্ডিকার নিয়মানুসারে বিরূপাক্ষ-জপান্ত কুশণ্ডিকা করিবে। ইহাতেও সভ্য নামক অগ্নি স্থাপন করিতে হয়, তৎপরে একবিংশতিদর্ভ পিঞ্জুলি অর্থাৎ প্রত্যেক ভাগে ৭টী অপর ১টী কুশপাত্রে বেষ্টন করিবে। উষ্ণজল পরিপূর্ণ কাংশ্যপাত্র, তামার ক্ষুর, তাহার অভাবে দর্পণ আনিয়া রাখিতে হয় এবং নাপিতকে লৌহক্ষুর হাতে করিয়া রাখিতে হইবে। অগ্নির উত্তর দিকে বৃষগোময়, তিল, তণ্ডুল ও মাষযোগে পক্ককৃশর (খিচুড়ী), অগ্নির পূর্ব্বদিকে ধান, যব, তিল ও মাষ এই সকল দ্রব্যে পরিপূর্ণ তিনটী পাত্র রাখিবে, ইহার পরে বালকের গর্ভধারিণী একখানি পরিষ্কার বস্ত্রে আচ্ছাদিত বালককে ক্রোড়ে লইয়া অগ্নির পশ্চিমে স্বামীর বাম পার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশার উপরে পূর্ব্বমুখী হইয়া উপবেশন করিবে। ইহার পরে বালকের পিতা প্রাদেশ পরিমিত ১টী সমিধ ঘৃত মাখাইয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে

কুশণ্ডিকার নিয়মানুসারে ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি করিতে হয়। বালকের পিতা উঠিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া পশ্চিম দিকে অবস্থিত নাপিতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাকে সূর্য্যের ন্যায় ভাবিয়া "প্রজাপতি ঋষিসবিতা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওম্ আয়মগাৎ সবিতা ক্ষুরেণ—এই মন্ত্রটী ও উষ্ণজলপূর্ণ কাংশ্য-পাত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং মনে মনে বায়ুকে চিন্তা করিয়া "প্রজাপতিঋষি র্বায়ুদেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগ। ওঁ উষ্ণেন বায় উদকে নৈধি"—এই মন্ত্রটী জপ করিবে। ইহার পরে পূর্ব্বস্থাপিত কাংশ্যপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ উষ্ণজল ডান হাতে লইয়া বালকের ডান দিকের কপুষ্ণিকা ভিজাইয়া দিবে। (শিখা স্থানের নীচে ও কর্ণের নিকটবর্ত্তী উচ্চস্থানকে কপুষ্ণিকা বলে) মন্ত্র যথা—"প্রজাপতিঋষি রাপো দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপ উদন্তু জীবসে।" অনন্তর তাম্রক্ষুর বা দর্পণ অবলোকন করিয়া "প্রজাপতিঋষি বিষ্ণুদেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণো দংষ্ট্রোহসি।" এই মন্ত্রে পাঠ করিবে। ইহার পরে কুশবেষ্টিত সেই দর্ভ পিঞ্জলটী লইয়া "প্রজাপতিঋষি রোষধিদে র্বতা চূড়াকরণে বিনি-য়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসী।" এই মন্ত্র উচ্চারণে তথায় সংযোজিত করিতে হয়। ইহার পরে সেই স্থানে তাম্রক্ষুর বা দর্পণ স্পর্শ করাইয়া "প্রজাপতিঋষিঃ পুষাদেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেন পূষা বৃহস্পতে র্বায়োরিন্দ্রস্য চাবপত্তেন তে ব্রহ্মণা জীবাতবে বপামি দীর্ঘায়ুষ্টায় জীবনায় বলায় বর্চ্চসে'—এই মন্ত্র পড়িয়া এরূপ ভাবে চালনা করিবে যেন একটীও কেশ ছিন্ন না হয়। ইহা ছাড়া বিনা মন্ত্রেও দুইবার চালনা করিতে হয়। ইহার পরে লৌহক্ষুর দ্বারা সেই কপুষ্ণিক দেশের কেশ ছেদন করিয়া বালকের কোন মিত্র ব্যক্তির হস্তস্থিত সেই বৃষগোময় পুর্ণ পাত্রের উপরে দর্ভ পিঞ্জলীর সহিত কেশগুলি রাখিয়া দিবে। তৎপরে কপুচ্ছল দেশের কেশ ছেদন করিতে হয়। (মাথার পিছন

শিখাস্থানের নীচ ও নাপিতের ক্রোড়াভিমুখ উচ্চস্থান "কপুচ্ছল" শব্দে বুঝিতে হইবে)।" (**বিশ্বকোষ**—"চূড়াকরণ" দ্রষ্টব্য)

পাঠকের সন্দেহটা বোধ হয় অনেক পরিমাণে অপসারিত হইয়াছে। কারণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে স্বহস্তে আধুনিক নাপিতের ন্যায় বালকের কেশ জল দ্বারা সিক্ত ও সজ্জিত করিয়া যথাকালে মুণ্ডন করিতে দেখিয়াছেন আর নাপিত মহাশয়কে সবিতা অর্থাৎ সূর্য্যদেবের প্রতিনিধি স্বরূপ মনে করিয়া ব্রাহ্মণ ধ্যান করিলেন তাহাও দেখিয়াছেন। নাপিতের বেশ ভূষা আবার কিরূপ না "মাল্যাদ্যালঙ্কৃতঃ নাপিতঃ" ইতি (ভবদেব পদ্ধতি) সুতরাং জীবন্ত দেবতা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

হায় রে! যে যজ্ঞস্থানে শূদ্রগণের আদৌ প্রবেশাধিকার নাই, এমন কি দূর হইতে বেদ-মন্ত্র-উচ্চারণও শুনিবার অধিকার নাই, সেই যজ্ঞের পুরোভাগে নাপিত পুষ্পমালাদি ভূষিত হইয়া বিরাজিত, ও দ্বিজাদি দ্বারা ধ্যাত! কিন্তু সাধারণ্যে শূদ্র বলিয়া পরিচিত!! তাই আবার বলিতে হয় নাকি—

> "এ দুঃখের কথা আমি কার কাছে কই।
> যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই॥"

পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন যে রঘুনন্দনের স্মৃতি আর ভবদেব ভট্টের বিধি এই দুইটীই আধুনিক হিন্দুত্বের ভিত্তি। ইঁহারা উভয়ে নাপিত সম্বন্ধে যতটুকু বলিয়া গিয়াছেন তাহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। কালে হয়ত ঐ সকল নজীরও লোপ পাইবে। কারণ নাপিত জাতি অনুস্বর বিসর্গের মর্ম্ম বুঝিতে শিখিয়াছে দেখিলে, হয়ত প্রভুরা ঐ নিদর্শন গুলিও বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। যাহা হউক ভবদেব ভট্ট চূড়াকরণে নাপিতের স্থান ও সাজসজ্জা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বুঝিবার ও শিখিবার অনেক আছে; কোন পুস্তকে "পুষ্পাদ্যালঙ্কৃতঃ নাপিতঃ"

আবার কোন পুস্তকে "মাল্যাদ্যলঙ্কৃতঃ নাপিতঃ"—এইরূপ বলিয়াছেন। পুষ্পাদি বলাতে পুষ্পের মালা, চন্দন ও নববস্ত্রে শোভিত এইরূপই বুঝাইতেছে, আর চূড়াকরণে সত্যনামক অগ্নিস্থাপন করতঃ যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানই করা হয়—সুতরাং ভাগ্যাধীন অর্ব্বাচীন নাপিতকে যজ্ঞস্থানে শূদ্রজ্ঞানে এবেশে দাঁড়াইতে দেওয়া হয় কি? আচ্ছা মালা-চন্দন পায় কে দেখা যাউক। ব্যাসদেব বলিতেছেন—

সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈ ব্রাহ্মণাম্ স্বস্তি বাচয়েৎ।
ধর্ম্মে কর্ম্মনি মাঙ্গল্যে সংগ্রামাদ্ভুত দর্শনে॥

ধর্ম্ম কর্ম্মে, মাঙ্গল্য কর্ম্মে, যুদ্ধে এবং অদ্ভুত দর্শন হইলে ব্রাহ্মণদিগকে গন্ধ পুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া স্বস্তি বাচন করিবে।

আবার বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আছে—

মাল্যানুলেপনাদগ্রং ন প্রদদ্যাত্তু কস্যচিৎ।
অন্যত্র দেবতা বিপ্রগুরুণাং ভৃগু নন্দন।

অর্থ—হে ভৃগুনন্দন, ব্রাহ্মণ এবং গুরু ভিন্ন কাহাকেও মালা এবং গন্ধ হইতে অগ্রভাগ দিবে না (রঘুনন্দনকৃত উদ্বাহতত্ত্ব দ্রষ্টব্য) সুতরাং যজ্ঞস্থলে "মাল্যাদ্যলঙ্কৃতঃ নাপিতঃ" (× ×) বই আর কে? এইবার বলি না কেন—

হায়রে, হতভাগ্য নাপিত!
ফুল-মালা-ভূষিত,
চন্দন-চর্চ্চিত,
ব্রাহ্মণ-পূজিত
আজিও ভবে!
শুধু দেখি অবিচার,
তমঃ আর ব্যভিচার,

ধরিয়াছে শাস্ত্র-কার,
আলোকে তাই অন্ধকার,
দেখিছে সবে !!

নাপিতের মঙ্গলকামী একজন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক সংপ্রতি যাহা ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাও অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

সামগানাং চূড়াকরণে কুমারস্থ মাতুঃ পশ্চিমতোবাহিতং ক্ষুর-পাণিং নাপিতং পশ্যন তমেব সবিতৃরূপধ্যায়ন জপেৎ, প্রজাপতিঋষি সবিতা দেবতাঃ চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। আয়মাগাৎ ক্ষুরেণ অস্যার্থ—সবিতা সবিতাদেবঃ অয়ং নাপিত ক্ষুরেণ উপলক্ষিতঃ আ আগতবান্ ইতি। যো জন্ম মাসে ক্ষুর-কর্ম্ম যাত্রাং কর্ণস্থ বেধং কুরুতে মোহাৎ নুনং স রোগং ধনপুত্র নাশং প্রাপ্নোতি মূঢ়ঃ বধবন্ধনানি, ইতি স্মার্ত্ত রঘুনন্দনীয়ঃ বচনপ্রমাণাচ্চ দ্বিজানাং স্বংস্কার সমকালীন নাপিতানামুৎপত্তি প্রতীয়তে। অতঃ বৈদিক যুগ এব তেষামুৎপত্তি কাল অবগম্যতে অন্যথা উক্ত বচনং বৈয়ার্থপণ্ডে।

নপ্তা

পাঠক এইবার সেই "নপ্তা" কথাটীর ব্যাখ্যা করিয়া বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করা যাউক—নপ্তা শব্দে পৌত্র, দৌহিত্র অর্থাৎ নাতিকে বুঝায়। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা মরিচি, অত্রি, প্রভৃতি যে দশ প্রজাপতিকে সৃষ্টি করেন, তাহার পরই নাপিতের উৎপত্তি একান্ত আবশ্যক তাহা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি। তাহা হইলে প্রজাপতি-সৃষ্ট-নাপিত সম্পর্কে ব্রহ্মার নপ্তা অর্থাৎ নাতি হইল! যে সূত্রে ব্রহ্মা লোকের পিতামহ অর্থাৎ ঠাকুর দাদা সে সূত্রেই নাপিত ব্রহ্মার নপ্তা অর্থাৎ নাতি! ঐ নপ্তা কথাটীই সেই বৈদিককাল হইতে চলিয়া আসিতে আসিতে এক্ষণে "নাপিত" এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে যে "নপাত" শব্দের উল্লেখ করিয়াছি, উহা খাঁটী বৈদিক শব্দ, এবং নিরুক্তকার উহার অর্থ করিয়াছেন —"নপাত-অপত্যম্"! তাহা হইলে নপ্তা ও নপাত উভয়েই একার্থ অর্থাৎ অপত্যার্থবাচক হইল। নঞ্ পূর্ব্বক পত ধাতু (বর্দ্ধনে) +ক্ত করিলেও "নপ্তা" হইতে পারে। ভাষ্যকার নপাত শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি, (৩৬—৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

পক্ষান্তরে "ব্রহ্মন্" শব্দ হইতে যদি "ব্রাহ্মণ" শব্দ তৈয়ারি হইয়া থাকে, তবে বৈদিক "নপাত" শব্দ হইতে সংস্কৃত "নাপিত" শব্দ কেন না প্রচলিত হইবে! "নাপিত" শব্দটী লইয়া অনেক সাহিত্যরথী লড়িতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের এই একটী বিষম ভুল যে তাঁহারা নাপিতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়াই স্ব স্ব অভিমত জ্ঞাপন করিতেছেন; নাপিতের উৎপত্তি, বৃত্তি ও অধিকার বিষয়ে তাঁহাদের লেখনী যেন জবাব দিয়াছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে কাহাকেও কিছু বলিতে চাই না।

ভুল আমারও হইতে পারে, কারণ "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"—সুতরাং সংশোধন হয় হউক। আমি বুঝিয়াছি—জগৎ পরিবর্ত্তনশীল; এবং সেই পরব্রহ্ম পরম কারুণিক জগত-পিতার সন্তান সকলই সমান। বিদ্বেষির পাপচক্ষুই ভেদ-নীতির অনুসরণ করে, কিন্তু পতিত-পাবনাবতার চৈতন্যদেবের ন্যায় মহাপুরুষ, যবনের মধ্যেও ব্রাহ্মণ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং নাম দিয়াছেন "ব্রহ্ম-হরিদাস"! আমার বক্তব্য এই যে, যখন সূর্য্যদেবকে "জগৎ-প্রসবিতা মনে করিয়া অদ্যাবধি দ্বিজগণ গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন এবং চূড়াকরণে নাপিতকে "সবিতা" মনে করিয়া ধ্যান করা হয়, তখন আমি যে সূত্র অবলম্বন করিয়া নাপিতকে "নপাত" বলিতেছি, সুধী সজ্জন একটু প্রনিধান করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।—"অবিৎসি নপাতং বিক্রমণঞ্চ বিষ্ণোঃ"—ইহা বেদবাক্য এবং উহার অর্থ—বিষ্ণুর অপত্য এবং তাঁহার মহাশক্তি বলিয়া আমাকে জানিবে। এই বচনের "বিষ্ণু" কে—মীমাংসা হইলেই বোধ হয় গোল চুকিয়া যায়। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে—পূষা, সবিতা, বিষ্ণু, আদিত্য, মার্ত্তণ্ড এ সকল সূর্য্য দেবেরই নামমাত্র। আধুনিক কোন কোন সাহিত্যিক আবার মহাদেব শিবকেই ঋক্-বেদের পূষা বা বিষ্ণু বলিতে চাহেন। (১৩১৯ অগ্রহায়ণের "প্রবাসী" দেখুন)। পুরাণকার শিবকে তমঃগুণের আধার এবং সংহার-কর্ত্তা সাজাইয়াছেন। কার্য্যতঃ কিন্তু শিব সংহার-কর্ত্তা না হইয়া সত্ত্বগুণের আধার হেতু শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন এবং সন্তান-কামনায় লোকে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে ছাড়িয়া শিবের আরাধনাই বেশী করিয়া থাকে। লোক-রক্ষার্থে বাবা বৈদ্যনাথের মাহাত্ম্য সর্ব্বজন বিদিত! পক্ষান্তরে শীতলা ও মনষা পূজা পর্য্যন্ত আমাদের দেশে প্রচলিত, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পূজা করিতে কজনকে দেখা যায়? শিব সংহার-কর্ত্তা হইলে লোকে তাঁহার নিকট সন্তান কামনা করিবে কেন? শিব ও সূর্য্য উভয়েই আবার রুদ্রদেব!

বৈদিক ঋষিগণ সূর্য্যদেবকে নপাত বলিয়াও সম্ভাষণ করিতেন চারি-বেদেই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এইখানে একটীর উল্লেখ করিলাম ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৪২সূক্ত গায়ত্রী ছন্দ :—

সং পূষন্নধ্বস্তির ব্যংহো বিমুচো নপাত।

সক্ষ্বাদেব প্র নম্পুর॥ ১

ঋষি কাতরপ্রাণে প্রাঙ্মুখ হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন—হে নপাত পূষন, আকাশের অন্ধকার ব্যূহ বিমুক্ত হইয়া দর্শন দাও। আমি বিপন্ন পথিক, আমায় পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চল। যেহেতু তুমিই সাক্ষাৎ দেবতা!

প্রবীন সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন,

প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক গুলির ভাষা ক্রমশঃ পরিশুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। সেই সব পুঁথিতে অনেক শব্দ দৃষ্ট হয় যাহা এখন লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—১ম ভাগ ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে "নপাত" শব্দ হইতে "নাপিত" হইলেও পারে!

যাহা হউক পৌরাণিক-চিত্রনৈপুণ্যের ফলে প্রকৃত ব্রহ্মা বা বিষ্ণু কে তাহা নির্ণয় করা বড় সুকঠিন। অতএব স্বর্গীয় মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন আমাদিগকেও তাহাই গ্রহণ করিতে হইল।—তাঁহারা বলেন "বিষ্ণু সূর্য্যের একটী নাম মাত্র। × × × × পৌরাণিক বিষ্ণু ত্রিমূর্ত্তি পরমেশ্বরের দ্বিতীয় মূর্ত্তি। বৈদিক ধর্ম্ম বহুল-দেব-উপাসনা মূলক। অতএব বেদে সেই এক ঈশ্বরের ত্রিমূর্ত্তির কোন উল্লেখ নাই। যাস্ক খৃষ্টের পঞ্চম পূর্ব্ব শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাঁহারও নিরুক্ততে ব্রহ্মা, বিষ্ণুর, শিবের কোন উল্লেখ নাই।" অতএব অনুমান (বর্ত্তমান ১৯২৭+৫০০) আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যদেবকেই আর্য্যগণ বিষ্ণু ও সবিতা

বলিয়া জানিতেন। আর তিনি (সবিতা)-পালনকর্ত্তাই বা না হইবেন কেন? জগতের উপকারক মাত্রই (গো, বিল্ব, তুলসী পর্য্যন্ত) দেবতা-পদ বাচ্য। সবিতা ত দূরের কথা, নদী, বৃক্ষ, পশ্বাদির মধ্যেও যাহারা জগতের উপকার করিয়া থাকে, হিন্দুগণ তাহাদিগকেই দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। অপিচ পুরাণের অনেক দেবতাকে কল্পনার দ্বারা অনুমান করিয়া লইতে হয়, কিন্তু গ্রহেশ্বর জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য প্রত্যক্ষ দেবতা—ত্রাতা ও পালনকর্ত্তা! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সাক্ষী!! অতএব বেদের ঋষিগণ সূর্য্যদেবকে বিষ্ণু বা পালনকর্ত্তা বলিয়া ধ্যান করায় কোন ভুলই করেন নাই!* পক্ষান্তরে চূড়াকরণে দেখান হইয়াছে—"যেন পুষা বৃহস্পতে র্বায়োরিন্দ্রস্য চাবপত্তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় দীর্ঘায়ুষ্টায় বলায় বর্চ্চসে"—এই মন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি, পুষা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগ—পুষা নামক দেবতাকে চূড়াকরণ উপলক্ষে প্রজাপতিঋষি যে মন্ত্রে আরাধনা করিয়াছিলেন সেই মন্ত্র। "যেন পুষা"—এই "পুষা" সূর্য্যদেব ভিন্ন আর কেহই নহেন। ঋগ্বেদে সূর্য্যদেবকেই পুষা ও সবিতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (বৈদিক আভায ১৪২ দেখুন)। তাহা হইলে উক্ত মন্ত্রটির অর্থ হইল—"যে ক্ষুরের দ্বারা সবিতৃদেব বৃহস্পতি, বায়ু ও ইন্দ্রকে মুণ্ডন করিয়াছিলেন, সেই

* সংপ্রতি ১৯১৩ দিনাজপুর সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি জষ্টিশ আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় স্বীয় অভিভাষণে কয়েকটী বৈদিক মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া অনুতাপ সহকারে বলিয়াছেন—"সূর্য্যোদয়" হয় পূর্ব্বে, আমরা পরাঙ্মুখ হইয়া আছি। × × হে ইন্দ্র আমাদিগকে জ্ঞান দাও, যেমন পিতা পুত্রকে জ্ঞান দান করে। এমন পথে শিক্ষা দাও, জীবনে যেন সূর্য্যকে দেখিতে পাই, হে পুরুহূত, আমরা যজ্ঞের জীব, আমরা যেন প্রত্যহ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হই।

ইদং ঋতং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষা নো অস্মিন পুরুহূত যামনি, জীবা জ্যোতিরশীমহি॥

যদি আমরা এই প্রার্থনা করিতে পারিতাম ঈশ্বরও আমাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দিতেন।

ক্ষুরের দ্বারা আমি এই বালকের ব্রহ্মজীবন, দীর্ঘায়ু, তেজ, ও বলবর্দ্ধনের জন্য ক্ষৌর করিতেছি। "বপামি" শব্দের অর্থ—আমি ক্ষৌর করিতেছি। এখানে "আমি" কথাটি দ্বারা অবশ্য পুরোহিত মহাশয়কেই বুঝাইতেছে। আর নাপিত মহাশয় ফুলমালা-বিভুষিত হইয়া শ্যামসুন্দর রূপে দণ্ডায়মান! বালকের মাথার চুলগুলি বালকের কোন মিত্র ব্যক্তির দ্বারা বাঁশবনে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা। অতএব সূর্য্যদেব, বৃহস্পতি ইত্যাতি দেবতাকে ক্ষৌর করিয়াছিলেন বলিয়াই নাপিতকে সবিতারূপে ধ্যান করা হয়। কেন না বিষ্ণুর অর্থাৎ সূর্য্যদেবের সহিত নাপিতের অপত্য সম্বন্ধ, যেহেতু "অবিৎসি নপাতং বিক্রমণঞ্চ বিষ্ণোঃ";—আমাকে বিষ্ণুর অর্থাৎ সবিতার নপাত অর্থাৎ অপত্য এবং মহাশক্তি বলিয়া জানিও (অবিৎসি-বেদ্মি)। সুতরাং সূর্য্যের অপত্যকে সূর্য্যরূপে ধ্যান করিতে আপত্তি কি?

এইখানে আর্য্য ঋষিদিগের অসাধারণ ও অলৌকিক কীর্ত্তি "যজ্ঞের" বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।

অগ্নিষ্টোম—সাতটী সোম সংস্থা যাগ আছে। তাহাদের নাম—অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উকৃথ, ষোড়শী, অতিরাত্র, বাজপেয় এবং আপ্তর্যাম। ইহার মধ্যে অগিষ্টোমই সর্ব্বপ্রধান, অন্যান্যগুলি প্রায় ঐরূপ, কেবল কোন কোন স্থলে কিছু কিছু বিভিন্নতা মাত্র। অগ্নিষ্টোমকে প্রকৃতি যাগ এবং অপর ছয়টীকে বিকৃতি যাগ বলা যায়।

যে সময় পুষ্পাদিতে অতিরিক্ত মধু উৎপন্ন হয় সেই বসন্ত ঋতুতে অগ্নি-ষ্টোম যাগ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এটী সোম যাগ। ইহার দ্রব্য সোম। সোম যাগ সবনত্রয়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সোম-ঘটিত ক্রিয়াকেই সবন বলে।

অগ্নিষ্টোম যাগ পাঁচ দিনে সমাপ্ত হয়। যিনি অধীত-বেদ ও আহিতাগ্নি তিনিই এই যাগ করিবার অধিকারী। ইন্দ্র ও বায়ু আদি ইহার দেবতা।

এই যজ্ঞের কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ১৬ জন ঋত্বিক আবশ্যক। এই ঋত্বিক্‌গণ চারিভাগে বিভক্ত হইয়া আপন আপন কার্য্য সমাধান করেন। (১) হোতৃগণ (২) অধ্বর্য্যুগণ (৩) ব্রহ্মাগণ (৪) উদ্‌গাতৃগণ। এই চারিগণের প্রত্যেকগণে যে চারিজন করিয়া ঋত্বিক থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম যথাক্রমে লিখিত হইল।

হোতৃগণে—হোতা, প্রশাস্তা, অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তোতা।

অধ্বর্য্যুগণে—অধ্বর্য্যুঃ, প্রতিপ্রস্থতা, নেষ্ঠা ও উন্নেতা।

ব্রহ্মাগণে—ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণাচ্ছংশী, অগ্নীতৃ ও পোতা।

উদ্গাতৃগণে—উদ্গাতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্যঃ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই যাগ পঞ্চাহসাধ্য। ইহার প্রথম দিনে দীক্ষা ও দীক্ষনীয়াদি ও তদনুষ্ঠান। দ্বিতীয় দিবসে—প্রায়নীয় যাগ ও সোমলতা ক্রয়। তাহার পর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে প্রাতে ও সায়ংকালে প্রবর্গ্যোপসন্নামক যাগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই অগ্নিষ্টোম যাগে যে যে কার্য্য করিতে হয় ও তৎসমুদয় কার্য্য সম্পাদন সময়ে যে সমস্ত মন্ত্র পঠিত হওয়া উচিত তাহা যজুর্ব্বেদ সংহিতায় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। আমি তাহার সার সংগ্রহ করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

১। যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।— (অনুবাদ)

যে স্থলে সমস্ত দেবগণ প্রীতি উপভোগ করেন, আমি সেই পৃথিবীর দেব-জনন ভূমিতে যাইতেছি। দুস্তর জলধির ন্যায় অতি বিস্তৃত এই দেব-জনন-কার্য্য যেন আমরা গদ্যময় বানী যজুর, পদ্যময় বানী ঋকের এবং গীতিময় বানী সামের সাহায্যে অনায়াসে সন্তরণক্ষম হই ও উৎকৃষ্ট অন্নলাভ ও বহুপুষ্টি সাধন পূর্ব্বক অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি। (১)

অনন্তর যজমানের মস্তকের কেশ এবং শ্মশ্রু মুণ্ডিত হইবে! কেশমূল সকল উত্তমরূপে জল সিক্ত করিবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করা হয় "এই জল দেবতারা নিশ্চয় আমার কল্যাণকর হউন।" (২)

তৃতীয় মন্ত্রে অচিরজাত কতকগুলি কুশা ছেদন করতঃ শাণিত ক্ষুরের তৈক্ষ্ণ পরীক্ষা করিবে।—

"হে কুশা সকল! অতীক্ষ্ণধার (ভোঁতা) ক্ষুরের দ্বারা ক্ষৌরেই যে কষ্ট হ'তে পারে, তাহা হইতে ত্রাণকর অর্থাৎ তোমাদের দ্বারাই তাহা পরীক্ষিত হউক।" (৩)

চতুর্থ মন্ত্রে ক্ষৌর করিবে।

"হে ক্ষুর! তুমি যেন ইহার রক্তপাত করিও না" (৪)

ইহার পর স্নান করিবে, স্নান করার মন্ত্র—"মাতৃবৎ জীবন-রক্ষক জল দেবতারা আমাদিগকে শুদ্ধ করুন আমরা ঘৃতে পরিপ্লুত হইয়াছি, আমাদিগকে পবিত্র করুন, মস্তকোপরি দীয়মান বা বহমান এই জলধারার সহিতই আমাদের সমস্ত পাপ ভাসিয়া যাউক।" (৫)

মহাত্মা রাধিকা রমণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৮৯৫ সালের "ভারত দর্পণ"—২য় ভাগ ৫৫।৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

"নাপিত-দর্পণ" লিখিতে লিখিতে সৌভাগ্যক্রমে "ভারত-দর্পণ" আসিয়া মিলিল। নাপিত-দর্পণের প্রতিবিম্ব পাঠকের হৃদয়ে প্রতিফলিত না হইলেও ব্রাহ্মণ-সম্পাদিত "ভারত-দপণ" দ্বারা নিশ্চয়ই সে কার্য্য সমাধা হইবে আশা করি। সুতরাং অনেক উল্লেখযোগ্য বিষয় সংগৃহীত থাকিলেও অতি সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলিয়া পাঠকের নিকট হইতে আপাততঃ বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

১। উপরিউক্ত যজ্ঞের মন্ত্রে যে জলধারা ঢালিবার উল্লেখ আছে তদনুসারে অদ্যাবধি হিন্দু নাপিতেরা বিবাহ বা অভিষেক কালে কোন

কোন স্থলে যজমানের মাথায় জল ঢালিয়া থাকে। নাপিতের ত আর বেদে অধিকার নাই! সুতরাং অধীতবেদ ও আহিতাগ্নি পুরোহিত মহাশয় মন্ত্র পড়েন আর নাপিত মহাশয় জল ঢালেন! ফলে বেদ বিদ্যা-হীন নাপিতকে দাস ভাবাপন্ন দেখায়। নাপিতের উপাধির মধ্যে দাসও আছে। এই দাস মহাশয়দিগের অধিংকাংশই কিন্তু কলিকাতা অঞ্চল নিবাসী। কিন্তু দাস্যবৃত্তি ত দূরের কথা ইঁহাদের অনেকে ক্ষৌর বৃত্তিটাও বহুপুরুষ হইতে ত্যাগ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে দাস শব্দ দ্বিবিধ। একটী (দন্ত্য) স্যান্ত আর একটী (তালব্য) শ্যান্ত যথা—"দাস ঋত্বিজি তালব্যঃ ভৃত্যে দন্ত্যঃ।"—ইতি কৃৎপ্রদীপিকা। অর্থাৎ ঐ শব্দটীর দ্বারা ঋত্বিক্ বুঝাইলে শ্যান্ত আর ভৃত্য বুঝাইলে স্যান্ত হইয়া থাকে। নাপিত ঋত্বিক্ ছিল কি না, তাহা পাঠক বিচার করিবেন অপিচ "দাশ" ধাতু সম্প্রদানে (ভ্বাদিতে) অল্ করিয়া যে দাশ শব্দ হইয়াছে তাহার অর্থ, দানের পাত্র সুতরাং এই দাশের অর্থ ব্রাহ্মণ; আবার উড়িষ্যা পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানে দাশ-শর্ম্মা উপাধি যুক্ত ব্রাহ্মণ এবং ভারতের নানাস্থানে "ঠাকুর" উপাধিযুক্ত নাপিত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আমরা মনে করি চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় অথবা নাপিতদিগেরই মূর্খতাবশতঃ দন্ত্য সান্ত দাস উপাধি নাপিত সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। "অভিষেকের বারি" যজমানের মাথায় দিত বলিয়াই নাপিতের একটী উপাধি বারিক। ৩২ পৃষ্ঠা "উপাধি" দেখুন।

২। বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যেরূপ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দুই শ্রেণীতে দা-কুমড়া সম্বন্ধ, নাপিতদিগের মধ্যেও রাঢ়ী বারেন্দ্রের ঐরূপ ভেদ আছে। বিশেষতঃ রাঢ়ের "সপ্তগ্রামী" সমাজের সহিত বারেন্দ্র শ্রেণীর "মামুদসাহী" দিগের পাশাপাশি অবস্থান হেতু ইঁহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বে প্রায়ই সামাজিক সংঘর্ষ বাধিত। পরিণামে মামুদসাহীরা নাম পাইয়াছে "মামুদাবাজ"! সূত্রটি এই—"সাত গেঁয়ের কাছে মামুদাবাজী!"—তাই

আদম সুমারীর কাগজে, রিজলী সাহেবের রিপোর্টে ও নগেনবাবুর বিশ্বকোষে "মামুদাবাজ" বলিয়া নাপিতের একটী শ্রেণীর উল্লেখ আছে। কিন্তু নাপিত যে বর্ণই হউক, তাহারা যে জল আচরণীয় হিন্দু—একথা বোধ হয় সকলই জানেন সুতরাং যাবনিক "মামুদাবাজ্" কথাটা কি তাহাদের কোন শ্রেণীর নাম হইতে পারে? নদীয়া ও যশোহর জেলার মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে "মামুদসাহী" নামে যে "পরগণা" হইয়াছিল, ঐ পরগণার নামানুসারেই "মামুদসাহী" শ্রেণীর উৎপত্তি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ নাপিত-কুল-ধুরন্ধর গুণী, জ্ঞানী ও সুরসিক গোপাল ভাঁড়ের চেষ্টাতেই নাকি নাপিতদিগকে রাঢ়ীবারেন্দ্র দুই দলে বিভক্ত হইতে হয়। গোপালভাঁড় যেন নাপিত-তত্ত্ব বিলক্ষণ জানিতেন, এখনও বাজারে যে সকল "গোপালভাঁড়" বিক্রয় হয় তাহাতেও গোপালের বাক্যবাণ দ্বারা নাপিতের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩। সৎশূদ্রের মধ্যে পরিগণিত হইয়াও নাপিত জাতির মধ্যে বিদ্যা ও ধনের সম্পূর্ণ অভাব, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা নাই বলিলেই হয়। এতাদৃশ অবস্থায়ও তাহাদিগের মুখে "ছেলেদের চূড়া দেওয়া" কথাটী অদ্যাবধি শুনিতে পাওয়া যায়। কার্য্যতঃ কিন্তু "কর্ণবেধ" হইয়া থাকে। কর্ণবেধ অর্থাৎ কান-ফুড়ানকেই তাঁহারা অধুনা চূড়াকরণ বলিয়া গ্রহণ করেন। চূড়াকরণ-সংস্কার দ্বিজাতি ভিন্ন শূদ্রের হয় না। অধিকন্তু নাপিতেরা ঐ কর্ণবেধে "রজত-সূচী," অর্থাৎ রূপার গুঁজি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সূচী-সম্বন্ধে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ এই যে— ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য রজত-নির্ম্মিত সূচী ব্যবহার করিবেন। ক্ষত্রিয় স্বর্ণ-নির্ম্মিত সূচী ব্যবহার করিবেন এবং শূদ্র লৌহ-সূচী দ্বারা কর্ণবেধ করিবেন।

৪। বৌদ্ধযুগের অবসানে হিন্দুধর্ম্মরাজ-চক্রবর্ত্তী পঞ্চগৌড়েশ্বর বল্লাল-

সেন নাপিতকে নাকি "ঠাকুর" উপাধি দিয়াছিলেন অপিচ বল্লাল-চরিতে লেখা আছে—

নীচ-সেবি নাপিতা যে নীচজাতি-দ্বিজাতয়ঃ।
অযাজ্যা পতিতাস্তে চ তেষাং শুদ্ধির্ণজায়তে।
দানাদি গ্রহণাদ্ধেতোস্তেষাং পাতিত্য নিশ্চিতম্।
সৎসেবি-নাপিতা যেতু সংযাজ্যা সদ্দ্বিজাতিভিঃ। ৩৪।৩৫।
তেষাং দানাদি গ্রহণাৎ পাতিত্যং নৈব যাস্যতি। ৩৬।
সেবায়াং নাপিতো শ্রেষ্ঠস্তথা সংস্কার কর্ম্মসু
গোপ-নাপিতানাং কার্য্যে দেহাশৌচং ন মন্যতে॥

অর্থ—যে সকল নাপিত নীচজাতির সেবা (ক্ষৌরাদি) করিবে, তাহারা যাজনের অনুপযুক্ত হইবে এবং যে সকল ব্রাহ্মণ নীচজাতির পৌরহিত্য করিবে তাহারাও পতিত হইবেন তাহাদিগের কখনও শুদ্ধি হইবে না। কারণ নীচজাতির দান প্রভৃতি গ্রহণ হেতু তাহাদের পাতিত্য দোষ স্থির থাকিবে। কিন্তু যে সকল নাপিত সজ্জাতির সেবা করিবে সুব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের পৌরহিত্যাদি করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদিগের দান প্রভৃতি গ্রহণ করিলে পাতিত্য হইবে না। নাপিত জাতি সেবা (দেবসেবা) বিষয়ে এবং বিবাহাদি সংস্কার কার্য্যে শ্রেষ্ঠ। গোপ এবং নাপিতদিগের কার্য্যে তাহাদিগের দেহাশৌচও গণনীয় নহে।

পাঠক যদি ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ হয়েন, তবে অবশ্যই বুঝিয়াছেন—যে উপর্যুক্ত বচনাবলী বর্ত্তমান কালের একটী রাজকীয় সার্কুলার মাত্র! এবং উহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে গেলে—It is hereby notified that on and from date the Napits of Bengal will not be allowed to serve the low castes etc—এইরূপ বয়ান আসিয়া পড়ে; তবেই বুঝুন নাপিতের পূর্ব্বতন অবস্থা কিরূপ ছিল! কিন্তু

আমরা নাপিতের এই বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য বল্লালসেনকে দায়ী করিতে পারি না। দেশ-কাল বিবেচনা করিয়াই তিনি নাপিতগণের মৌলিকত্ব রক্ষার্থে ঐরূপ আইন জারী করিয়াছিলেন, বল্লালসেনের জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে নাপিতের অধঃপতন ঘটিয়াছিল। এবং সেই জন্যই নাপিতের ইতিহাসের খেঁই (ধারা) হারাইয়া গিয়াছে। বল্লালসেন বিদ্বান বুদ্ধিমান, মহাবল, পরাক্রান্ত, হিন্দু-কুল চূড়ামণি, সদাশয় নরপতি ছিলেন। যিনি দেবভাষায় "দানসাগর" রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং যিনি—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥— ইত্যাদি

আবিষ্কারপূর্ব্বক সনাতন হিন্দুত্বের প্রকৃত উপকরণগুলি বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি কি কখনও স্বেচ্ছাচার বা কোন লোক বিশেষের উপর ক্রোধবশতঃ কোন জাতিকে চিরদিনের জন্য লাঞ্ছনা ও মনঃপীড়ায় নিষ্পেষিত ও পাতিত করিতে পারেন ? আর তিনি পারিলেও বর্ণগুরু সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সেই অবিমৃষ্যকারিতার কোন প্রতীকার করেন নাই কেন? তিনি তো ব্রাহ্মণের বাক্য কখনও অমান্য করেন নাই! নিজের রাজত্বটাই একরূপ তিনি ব্রাহ্মণদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন! অধিকন্তু পিতা-পুত্রে বিবাদ করিয়া যখন লক্ষ্মণসেন বল্লালের রাজধানী ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন পিতার জীবনান্তে গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়া লক্ষ্মণসেন বল্লালপীড়িত জাতিসমুহকে পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠা করিলেও তো পারিতেন! বল্লালের অপরাধের বিষয়—এক নীচজাতীয়া পদ্মিনী-কন্যাকে অন্তঃপুরে আনয়ন করা! কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। পুরাকালে একাধিক স্ত্রী যে রাজার ছিল না, তিনি রাজোপাধির যোগ্যই হইতেন না! মহারাজ দশরথের নাকি সাড়ে তিন শত মহিলা ছিলেন! তন্মধ্যে কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা ব্যতীত অপরগুলি কোন্ জাতীয়া

এবং কোথা হইতে কি ভাবে গৃহীতা হইয়াছিলেন, কেহ বলিতে পারেন কি? অন্যেপরে কা কথা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহারও তখন যোলশত রমণী ছিলেন! তস্য সখা পরম ভাগবৎ অর্জ্জুনই কি এ বিষয়ে কম দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন? যে রাজাসনে বল্লালসেন বসিয়াছিলেন, সেই সিংহাসনের প্রতিষ্ঠাতা হিন্দুগৌরব আদিশূরও অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন! সুতরাং ঐ পদ্মিনীকে গ্রহণ করায় বল্লালের বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমা, তিতিক্ষাদি গুণ একেবারে লোপ পাইয়াছিল ইহাও কি কখনও সম্ভব? বিশেষতঃ তিনি শিবোপাসক ছিলেন, "যত্র জীব তত্র শিব"—ইহাই শৈব ধর্ম্মের বিশেষত্ব। অতএব আমার বিশ্বাস যদি বল্লালসেন কোন জাতিকে "পতিত" করিয়া থাকেন, তবে তিনি সর্ব্বাগ্রে ঐ জাতির নাপিত বন্ধ করিয়াছিলেন। বল্লালের উল্লিখিত শাসনই ইহার প্রমাণ। ফলতঃ ভারতের আর্য্য অনার্য্য নির্ণয় করিবার পক্ষেও হিন্দুনাপিতগণ প্রধান অবলম্বন স্বরূপ, অর্থাৎ মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে হিন্দু নাপিতে যে সকল জাতির যাজনিক ক্রিয়া করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই আর্য্য। নাপিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই অভাবগ্রস্থ ও দীনভাবাপন্ন; কিন্তু সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেও তাঁহারা কেহ স্বেচ্ছায় কোন অনার্য্য জাতিকে ক্ষৌর করেন না। যেখানে এই নিয়মের বিপর্য্যয় দেখিবে, সেইখানেই কোন বিষম গোলযোগ আছে বুঝিতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে মুসলমান ও খৃষ্টানগণকে তো হিন্দু নাপিতে ক্ষৌর করিয়া থাকে; অপিচ যখন মুচী, নমঃশূদ্র, ভূঁইমালী প্রভৃতি জাতি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান অথবা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তখন তো আর তাহাদের হিন্দু নাপিত পাইতে কষ্ট হয় না? ইহার সহজ এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে—রাজবিধান লঙ্ঘন করিবার ও আর্য্য, অনার্য্য নির্ণয় করিবার শক্তি নাপিতের

আর নাই ; আর—"দারিদ্র্য-দোষঃ গুণ-রাশি নাশিঃ।" কিন্তু পূর্ব্ব পুরুষেরা অনার্য্যজ্ঞানে যাজনা করেন নাই—এই সংস্কার পুরুষানুক্রমে দৃঢ়বদ্ধ থাকায় অনার্য্যজাতির যাজনা করিতে শ্রোত্রিয় আর্য্য-নাপিত এখনও সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। তবে মহামহোপাধ্যায়দিগের কল্যাণে বোধ হয় নাপিতের এই গরিমাটুকুও আর থাকিবে না। (১৩২০, ৪ঠা আষাঢ়ের "নায়ক" দ্রষ্টব্য)।

৫। ভগবতীর আদেশে মহাদেব হিমালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশীতে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য স্কন্দুক নামক এক নাপিতকে তাঁহার পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। (ইতি—হরিবংশ)

৬। ন্যূনাধিক ৯৪ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালার প্রান্তভাগে (কালা-পাহাড়ের পর) নাপিত পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। (১৩১৮। ৩১শে চৈত্রের বঙ্গবাসীতে প্রভুপাদ শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিত "উড়াপাঠ" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।)

৭। সন ১২৯৯ সালে মুদ্রিত পণ্ডিত-প্রবর মহেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের "জাতিমালা"তে আছে—

"ব্রহ্মা নাভিদেশ হৈতে বৈশ্যের উৎপত্তি।
এই মত বৈশ্য তাহে আগর বেনে জাতি" ॥
ব্রহ্মপাদ পদ্ম হতে শূদ্র জাতি হয়।
নিজ নিজ কর্ম্ম জন্য পাঁচ জাতি কয় ॥
শূদ্র ও কায়স্থ গোপ, বারুই, নাপিত।
তার মধ্যে ভেদাভেদ কহিব নিশ্চিত ॥"

মন্তব্য—নাপিত তাহা হইলে শূদ্র ছিল না এবং এখনও নহে।

৮। "নাপিত অতি বিশুদ্ধ জাতি। নাপিতের সাহায্য ব্যতীত বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কোন কার্য্যেই কোন হিন্দু শুচিত্বলাভ করিতে পারেন না। নাপিত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে প্রথম সৃষ্ট

নাপিতদ্বয় হাড়োদাস ও ব্রহ্মদাস, মহাদেব ও ভগবতীর ইচ্ছানুসারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ব্রহ্মদাস বংশীয়গণ ভগবতীর বরে উত্তরকালে মোদকবৃত্তি অবলম্বন করেন। এজন্য মোদক বা ময়রা, সমাজে নাপিতের শাখা বলিয়া গণ্য।" ইত্যাদি—(শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী কৃত "বঙ্গীয় সমাজ" দ্রষ্টব্য)।

মন্তব্য—গোড়ায় খাঁটী কথাই বলিয়াছেন। 'হাড়োদাস,' 'ব্রহ্মদাস,' বিম্বদাস, ডিম্বদাস এখন অশ্বডিম্ববৎ!

৯। রামানন্দ স্বামীর শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে সেন নামে এক শিষ্য এই সম্প্রদায় (সেনপন্থী) সংস্থাপন করেন। এক্ষণে কেবল ঐ সম্প্রদায়ের ও তৎপ্রবর্ত্তকের নাম মাত্র কেহ কেহ বিদিত আছেন। অপরাপর বৃত্তান্ত কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না। সেন ও তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি গন্দোয়ানার অন্তঃপাতী বন্ধুগড়ের রাজবংশের কুলগুরু হইয়া সাতিশয় খ্যাতি ও প্রভুত্বলাভ করিয়াছিলেন। ভক্তমালে এই সংঘটনার হেতুসূচক একটা কৌতুকাবহ উপাখ্যান আছে, পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে।

সেন পূর্ব্বে বন্ধুগড়ের রাজাদিগের কুলনাপিত ছিলেন। তিনি বিষ্ণু-ভক্তি পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা বৈষ্ণব সহবাসেই কালক্ষেপ করিতেন। একদা তিনি সাধুসঙ্গে প্রেমাভিভূত থাকিয়া কাল যাপন করিতেছিলেন, ক্ষৌর কর্ম্মের কাল অতীত হইয়াছে ইহা তাঁহার অনুধাবিত হয় নাই। ভক্ত-বৎসল ভগবান স্বীয় ভক্তের এরূপ অকপট প্রীতি দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং কি জানি রাজা তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন এই বিবেচনা করিয়া, সেনের আকার অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ সদনে গমন করিলেন ও সুচারুরূপ ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা রাজার সমধিক প্রীতি জন্মাইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা যদিও নাপিত-রূপী দেব-দেবের গাত্র হইতে একরূপ অসামান্য দৈব সৌরভের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি বিষ্ণুমায়া বুঝিতে পারিলেন না।

তিনি মনে করিলেন, ইহা আপনার গাত্র বিমর্দ্দিত সুগন্ধ তৈলেরই গন্ধ হইবে। কপট-বেশী নাপিত প্রস্থান না করিতে করিতেই প্রকৃত নাপিত উপস্থিত হইয়া আপনার বিলম্বের কারণ দর্শাইতে লাগিল। রাজা তাহাকে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমুদয় অবগত করিলেন এবং উভয়েই তখন সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন।

সূক্ষদর্শী রাজা অবিলম্বে সমস্ত ব্যাপার অনুভব করিয়া স্বীয় নাপিতের পদে শিরঃসমর্পণ করিলেন ও তাঁহাকে ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র জানিয়া গুরুপদে বরণ করিলেন।

(স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ১ম ভাগ ৭৪।৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। টিকা—অনাবশ্যক।

ঔর্ব্বাচার।

১০। মানসপুত্ররূপে সৃষ্টিকর্ত্তা (ব্রহ্মা) দশজন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করেন ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঐ দশজন ঋষি বা প্রজাপতি ছাড়া আরও কয়েকজন ঋষিকে ব্রহ্মা মানসপুত্ররূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন—ইহা পুরাণে প্রকাশ আছে। তন্মধ্যে ঔর্ব্বঋষি একজন। ইনি ব্রহ্মার উরুদেশ হইতে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর নাম ঔর্ব্ব (উরুশব্দ+জাতার্থে ষ্ণ) হইয়াছিল। এখানে দেখিতেছি ব্রহ্মার উরুদেশ হইতে জাত হইলেও বৈশ্য হয় না, ব্রাহ্মণ হয়! অপিচ ব্যুৎপত্তিগত অর্থও বেশ রহিয়াছে, কিন্তু বৈশ্য শব্দের সহিত ব্রহ্মার অঙ্গগত, নামগত, বা জাতিগত কোন সামঞ্জস্য নাই। যাহা হউক এই ঔর্ব্ব ঋষির কন্যা কন্দলীকে দুর্ব্বাসা মুনি বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহা সৃষ্টির গোড়ার কথা। এই কালে দেবতাদিগের সহিত এই পৃথিবীস্থ মানবের আদান প্রদান চলিত। এই দুর্ব্বাসা মুনিই আবার দ্বাপরের শেষভাগে ও পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে সশিষ্যে দ্রৌপদির হস্তে ভোজন

করিয়া দ্বাদশীর পারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে দ্বাপরের শেষভাগেও জাতিভেদ প্রথা প্রবল হয় নাই। কারণ মহাতপঃ সম্পন্ন, উগ্রপ্রকৃতি, ব্রাহ্মণত্ব-গর্ব্বিত দুর্ব্বাশা মুনি অবাধে ক্ষত্রিয়ার রন্ধনান্ন ভোজন করিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। আবার এই দুর্ব্বাসার শ্বশুর ঔর্ব্ব ঋষি কি করিতেছেন দেখুন!

"সূর্য্য বংশে বৃকের পুত্র বাহুক নামে একজন প্রজ্ঞাশক্তিসম্পন্ন রাজা উৎপন্ন হইয়াছিলেন; সেই ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধর্ম্মতঃ সমুদয় পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ মনুষ্য এবং অপর জীব সকল তৎকর্ত্তৃক নিজ নিজ বৃত্তিতে স্থাপিত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত বাহুক প্রকৃত ত্বিষাম্পতি শব্দের বাচ্য হইয়াছিলেন। কালক্রমে সেই রাজার সকল সম্পদের বিনাশক লোভের উদ্দীপক অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই অহঙ্কার প্রভাবে তিনি অসূয়াবিষ্ট চিত্ত হইয়া যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরিণামে সেই রাজা হৈহয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতি শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া বনগমন করেন। ভীরু শত্রুগণ গর্ভস্থ বালকের বিনাশ সাধনার্থ ঐ রাজার গর্ভিণী ভার্য্যার শরীরে অতি তীব্র বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সেই দুঃখী রাজা বাহুক গর্ভিণী ভার্য্যার সহিত বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে ঔর্ব্ব ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় নানাকষ্টে রাজার দেহান্ত হইলে ঔর্ব্ব ঋষির প্রসাদে উক্ত রাজমহিষীর গর্ভস্থ সন্তান "গর" অর্থাৎ বিষসহ ভূমিষ্ঠ হইল।

গরেণ সহিতং পুত্রং দৃষ্টা তেজোনিধির্মুনিঃ।
জাত-কর্ম্ম চকারসৌ নাম্নাচ সগরং তথা॥

(৯৯ শ্লোক—বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

সেই তেজোনিধি মুনি যথাবিধি সেই সদ্যোজাত বালকের জাতকর্ম্মাদি

সম্পাদন করিলেন! এবং বিষের সহিত প্রসূত হইয়াছিল বলিয়া উহার নাম সগার রাখিলেন।

কৃত্বা চৌড়াদি কর্ম্মাণি সগরস্য মুনীশ্বরঃ।
শাস্ত্রাণ্যধ্যাপপামায় রাজ যোগ্যানি মন্ত্রবিৎ॥

১০১ শ্লোক।

অর্থ—শাস্ত্রবিৎ মুনীশ্বর ঔর্ব্ব সগরের চূড়াদি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে রাজযোগ্য শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করাইলেন।

এই ঔর্ব্ব ঋষির প্রসাদেই সগর পুনরায় পিতৃরাজ্য অধিকার পূর্ব্বক ৬০হাজার সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। এই সগররাজ, সূর্য্য বংশে ভগবান রামচন্দ্রের একাদশ পুরুষপূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। (বংশাবলীর চিত্র দেখুন) তখনও আমরা নাপিতের বৃত্তির, কার্য্যের ও অস্তিত্বের প্রমাণ পাইতেছি; তবে সে কাল আর এ কাল—এই যা প্রভেদ! এইখানে আমরা একজন ঋষিকে নাপিতের কর্ম্ম করিতে দেখিলাম।*

১১। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় ৮ম শতব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কুমারীল ভট্ট ও মণ্ডন মিশ্রাদির সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারত হইতে বিতাড়িত করতঃ বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।—ইহা ঐতিহাসিক ও সমাজ-তাত্ত্বিক মনীষিগণ একরূপ স্থির করিয়াছেন। আমি কতিপয় নিরীহ, নিরক্ষর বয়োজ্যেষ্ঠ স্বজাতিকে শঙ্করাচার্য্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা অবাধে বলিয়া ফেলিলেন—"যিনি সঙ্কর করিয়াছিলেন" অর্থাৎ যিনি বর্ণ-সঙ্কর সাজাইয়া ছিলেন তিনিই "সঙ্করাচার্য্য"!—এই অদ্ভুত পরিভাষা তাঁহারা কোথায় পাইলেন জানি না, কিন্তু ঐ কথাটার যেন একটু মূল্য আছে। তিনি শঙ্কারবতার হইবার পূর্ব্বে তাঁহার অন্য নাম ছিল।

* মতান্তরে চ্যবন ঋষি সগরের জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন দেখা যায়। যাহা হউক ঔর্ব্ব ও চ্যবন সম-প্রবর ছিলেন। এই পুস্তকের (৪০ পৃষ্ঠা বাৎসীসূত দেখুন)।

কেহ কেহ আবার বলেন তিনি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন। পক্ষান্তরে "কোরাণ আগে না পুরাণ আগে"—এবিষয় লইয়া হিন্দু মুসলমানে বহুকাল হইতে একটী কূটতর্ক চলিয়া আসিতেছে। মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদের মদিনায় পলায়নের দিবস হইতে মুসলমানদিগের "হিজিরা" শকের আরম্ভ, উহা খৃষ্টীয় ৬২২ অব্দে সম্পন্ন হয়।—ইহা যখন ঐতিহাসিক সত্য, তখন কোন্‌টা আগে হইয়াছিল বুঝা কঠিন নহে, তবে এই কূটতর্ক এবং পূর্ব্বোক্ত ঐ অদ্ভুত পরিভাষার সাহায্যে একটী অতীত ঘটনার কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। যে ৮ম শতাব্দীতে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব, ঠিক তার পূর্ব্ব শতাব্দীতেই মুসলমানেরা ভারত আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যকে বৌদ্ধধর্ম্মের নিরাকরণান্তে স্বকীয় অদ্বৈতমত সংরক্ষণ কল্পে, ভবিষ্যতে অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম ভারতে একাধিপত্য সংস্থাপন করিতে না পারে, ইহাও অনুধাবন করিতে হইয়াছিল। সেই উদ্ভাবনীশক্তির পরিণামেও বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব এবং তদ্ধেতু ২।১ খানা অনুশাসনও প্রচার করা হইয়াছিল। ফলে মুসলমানেরা এদেশে আসিয়া ২।১ খানা পুরাণ তৈয়ারি হইতে দেখিয়াছিল। সেই জন্যই তাহাদের ঐরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। আমার বোধ হয়, শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবেই ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, পরশুরাম সংহিতাদি সঙ্কর-জাতি-সংক্রান্ত কতিপয় গ্রন্থ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছিল। দেব ভাষার গুণে এবং "সালে"র স্থলে "পুরাকালে" বলিয়া উল্লেখ থাকায় অর্থাৎ কোন ঘটনার তারিখ উল্লেখ না করায়, ঐ সকল গ্রন্থ আমাদের নিকট অতীব প্রাচীন, অনাদি অনন্তকাল পূর্ব্বে ঋষিগণের দ্বারা প্রণীত বলিয়া বোধ হয়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থ ভারতের চারিদিকে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার চারিজন প্রধান শিষ্যকে ঐ সকল মঠ রক্ষার ভারার্পণ করিয়া

যান। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ অন্যতম। এই গোবর্দ্ধন মঠের অধীশ্বর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ১১০৮ শ্রীমধুসূদন তীর্থস্বামী গত বৎসর (১৯১২ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতায় আসিয়াছিলেন—তাঁহাকে আমি এই প্রশ্নটী করিয়াছিলাম।—"জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারত হইতে নিরাকরণ পূর্ব্বক বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন করেন। কুমারিল ভট্ট ও মণ্ডন মিশ্রাদি মহাত্মাগণও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করেন। কিন্তু বুদ্ধদেব শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের অন্যূন এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করতঃ চীন, জাপান, সিংহলাদি দেশেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের তাৎকালিক সম্রাট অশোক চন্দ্রগুপ্তাদি মৌর্য্যবংশীয়গণ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সেই ধর্ম্মের প্রচার কল্পে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ না থাকায় অবশ্য এই ভারতবর্ষে বহুল পরিমাণে ঐ প্রথা তৎকালে বিনষ্ট হইয়াছিল, ৫০ বৎসর করিয়া এক একটা "পুরুষ" ধরিলেও ভারতবর্ষের তাৎকালীন অধিবাসীগণের প্রায় বিংশতি-পুরুষ বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল! এতাদৃশ অবস্থায় শঙ্করাচার্য্য কিরূপে আবার প্রাচীন চতুর্ব্বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইলেন?"

স্বামীজি সংক্ষেপে অথচ সরলভাবে উত্তর করিলেন—"উয়ো ঠিক্‌সে হুয়া নহী"। স্বামীজির কথার ভাবে বুঝিলাম—যাঁহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বলিয়া সুবিদিত ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যে তাঁহারা প্রায় এক হইয়া গিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুত্থানে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলেও উক্ত চতুর্ব্বর্ণের "বাছাই" ব্যাপারে অনেক "গল্‌তি" ঘটিয়াছিল। ফলে "ঘোষালের গরুও মিশালে পড়েছেন" এবং "হেঁটের মামুদও উপরে উঠেছেন। অতএব এই সূত্র ধরিয়া আমি আবার আমার বড় সাধের "জাতি-ভেদ-রহস্যের" অবশিষ্টাংশ পরে প্রকাশ করিব মনস্থ করিয়াছি।

উপসংহারে আরও ২।১টী বিষয় উল্লেখ করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। হিন্দুমাত্রই অদৃষ্ট-বাদী এবং মহাভারত-ভক্ত। কর্ম্মফলোপলক্ষে হিন্দুর পঞ্চম বেদ সেই মহাভারতে উল্লেখ আছে যে—"জীব তীর্য্যক (পশু-পক্ষী) যোনি হইতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া প্রথমতঃ পুক্কস বা চণ্ডাল যোনিতে সহস্র বৎসর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শূদ্রতা লাভ করে। তৎপর ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতীত হইলে তাহার বৈশ্যতা, বৈশ্যতা লাভের পর একলক্ষ অশীতি বৎসর হইলে ক্ষত্রিয়ত্ব, এবং ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের পর একশত অশীতি লক্ষ বৎসর অতীত হইলে পতিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। তৎপরে সেই পতিত ব্রাহ্মণকুলে দ্বিশত যোড়শ কোটী বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া **অস্ত্রজীবি ব্রাহ্মণের** কুলে, তৎপরে চতুষষ্টি অষ্টশত কোটী বৎসর অতীত হইলে গায়ত্রী সেবী ব্রাহ্মণবংশে এবং পরিশেষে ঐ বংশে দুইশত উনষষ্টিলক্ষ বিংশতি সহস্র কোটী বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া শ্রোত্রীয় গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করে।" ইত্যাদি।

(কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ **মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব**—দ্রষ্টব্য)

পাঠকগণ, আপনারা বোধ হয়—

"আশীলক্ষ যোনী ভ্রমণ,
করে দেহ পেলে এমন!"——— এইটুকু পর্য্যন্তই

অনেকে জানেন। অতএব উপরে যে কয়টি নাতি-ক্ষুদ্র (?) সংখ্যা দেওয়া হইল, উহার সঙ্গে উক্ত আশীলক্ষ যোনির ভ্রমণ-কালও যোগ করিতে হইবে বোধ হয়! তবে ত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের কুলে জন্মলাভ!!

যাহা হউক উল্লিখিত রূপক-জড়িত বর্ণনাতেও আমরা চণ্ডাল, শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, পতিত-ব্রাহ্মণ, অস্ত্রজীবি-ব্রাহ্মণ, গায়ত্রী-ব্রাহ্মণ এবং শ্রোত্রীয়-ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখিতেছি। তন্মধ্যে অস্ত্রজীবি-ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকলেরই অস্তিত্ব এই ভারতবর্ষেই দেখা যাইতেছে। অস্ত্রজীবি ব্রাহ্মণটীই

কি লোপ পাইল? খোলা কাটিতে অস্ত্রের দরকার হয় এবং "খোলাকাটা" বামুনের নামও শুনা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে খোলাকাটাই কোন ব্রাহ্মণের জীবিকা নহে। প্রশ্ন হইতে পারে যে দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি অস্ত্রজীবি-ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাদের অস্ত্র আর আধুনিক নাপিতের অস্ত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন! আমিও ইহা স্বীকার করি। যেহেতু তাঁহারা অসিজীবি—ঘটনাক্রমে অথবা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদেরও চূড়াকরণ ও উপনয়নাদি সংস্কারে নাপিতের আবশ্যক হইয়াছিল। সুতরাং অস্ত্রজীবি নাপিত দ্রোণাচার্য্যাদির বহুকাল পূর্ব্বে জন্মিয়াছিল। পক্ষান্তরে ঐ সকল অসিজীবি ব্রাহ্মণের বংশ লোপ পাইয়াছিল ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বলিবে, সূত্রধারও (ছুতার) ত অস্ত্রজীবি! আমার উত্তর—মহামান্য দয়ার সাগর শাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে "অস্পর্শির" দলভুক্ত করিয়া গিয়াছেন এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সম্মত পৌরহিত্য কর্ম্মে তাহাদের কোন আবশ্যকতা প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু নাপিত অস্ত্রজীবিও বটে, পৌরহিত্যে ব্রাহ্মণের সহকারীও বটে! মহর্ষি মনুও নাপিতকে স্বতন্ত্র বর্ণ বা বর্ণসঙ্কর জাতি বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, কোন লক্ষণাও দেখান নাই। অপিচ জাতকর্ম্মাদি সংস্কারের ব্যবস্থা দিয়া নাপিতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং নাপিতের অন্ন ব্রাহ্মণের ভোজ্য এ কথাও মনু স্বীকার করিয়াছেন। নাপিতের স্বকর্ম্মও প্রায়শঃ ঠিক আছে; ইহারা প্রচ্ছন্ন বা অস্পর্শী জাতিও নহে। অধিকন্তু ব্রাহ্মণত্বের প্রধান উপকরণ যে দারিদ্র্য ও স্বল্পে-সন্তুষ্টি, তাহারা নাপিতের চিরভূষণই আছে!

পক্ষান্তরে বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে কোন 'বেওয়ারিস' মালপত্রের মধ্যে ক্ষৌরকরণোপযোগী অস্ত্রাদি পাইলে ঐ সকল পুরোহিতকে দিবার জন্য

রাজবিধান ছিল! বৌদ্ধযুগে আমাদের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে সবিশেষ বর্ণিত হইবে।

পরিচিত আত্মীয় স্বজনের নিকট আমি বড়ই লজ্জিত আছি। চেষ্টার ক্রটী করি নাই। কিন্তু "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন দৈবং ন চ পৌরুষং" এক কথা যেন ঠিকই। তবু আশা করি অতি শীঘ্রই অপর খণ্ড ছাপান শেষ হইবে। তবে অব্যবসায়ীর হস্তে পড়িয়া "সাত রাজার ধন মাণিক" পাছে নষ্ট হইয়া পড়ে, তাই স্বজাতি মহাশয়গণের আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। জীবন ক্ষণ-ভঙ্গুর, কপালও হাভা'তে,! সুতরাং আশাপূর্ণ হইবে কি না বলিতে পারি না, কাজেই আর একটী লুপ্তরত্ন স্বজাতি মহাশয়গণকে উপহার দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। ইহার মধ্যে নাপিতের অতীত জীবনের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে। যথা—

কেশবম্ আনর্ত্তপুরং পাটলীপুত্রং পুরীমহিচ্ছত্রাম্।
দিতিমদিতিঞ্চ স্মরতাং ক্ষৌরবিধৌ ভবতি কল্যাণম্॥

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ত ল ব।

সমালোচনা

বঙ্গদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সুধী সজ্জনের নিকট হইতে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের যে সকল সমালোচনা ও প্রশংসাপত্র পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্য হইতে কতকগুলি এইখানে সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইল।

The "Bengalee" says :—The book Is a valuable contribution to Hindu Sociology. Probably no question in the near future will occupy a more important place in the estimations of the Hindu than the Historical Study of his Social system and to such readers we can confidently recommend this book.

The "A. B. Patrika" says :—The book would prove interesting to those who are interested in Hindu Sociology and also to the members of the Napit community to enable them to learn their true position in Society.

হিতবাদী (শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত) :—

আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। এই পুস্তকখানি নাপিত জাতির প্রাচীন ইতিহাস। অনেক শাস্ত্রীয় বচন ও প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লেখক নাপিত জাতির প্রাচীনত্ব ও হিন্দুর সামাজিক ব্যাপারে নাপিতের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকখানি প্রধানতঃ নাপিত জাতির সম্বন্ধে লিখিত হইলেও হিন্দু সমাজের প্রায় সকল জাতিরই বিবরণ অল্পাধিক পরিমাণে স্থান পাইয়াছে।

নায়ক (শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) :—

গ্রন্থকার হিন্দুর জাতিভেদ-রহস্য নির্ণয় করিতে গিয়া নাপিত জাতির উৎপত্তি, বিস্তৃতি, স্থিতি, অবনতি, পরিণাম অবস্থার কথা শাস্ত্রীয় যুক্তি ও নাপিতের জাতিতত্ত্বজ্ঞগণের কথা হইতে সরলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাঞ্জল ভাষায় জটিল বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার নাপিত জাতির ইতিহাস আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বর্ণপরিচয় সম্বন্ধেও ধীরভাবে অনেক বলিয়াছেন। ... ... ভারতের জাতীয় ইতিহাসের বিষয় যাঁহারা মাথা ঘামাইতেছেন, যাঁহারা ইতিহাস পড়িতে, ও জানিতে চাহেন, যাঁহারা সমাজের হিতৈষী ও মঙ্গলকামী তাঁহারা নিশ্চয় এ পুস্তক পড়িবেন। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কার প্রয়াসীরই এ পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় ভাগে কি বাহির হয় দেখিবার বিষয় বটে। গ্রন্থকার তাঁহার জাতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া নিজের প্রাণকে ও তাঁহার সজাতীয় লোকদিগকে প্রবোধ দিয়াছেন—

প্রহৃষ্যতি ন সম্মানে নাবমানেন কুপ্যতি।
নক্রুদ্ধঃ পুরুষ ক্রয়াদেতৎ সাধোস্তু লক্ষণম্॥

আমরাও বলি অনুতাপ করিয়া লাভ নাই, সকলেরই জাতির প্রকৃত উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলা ও উন্নতিবিধায়ক কার্য্যে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত।

যশোহর পত্রিকা—আমরা "জাতিভেদ-রহস্য" নামে একখানা পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রকাশক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়। পুস্তকে গ্রন্থকার নাম প্রকাশ করেন নাই। ফলাফল দেখিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে নাম প্রকাশ করিবেন বলিতেছেন। বিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল আলোকে সকল জাতিই উন্নতির

পথে অগ্রসর হইতেছে—বহু বিভিন্ন জাতি আপনাপন জাতি-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন। এখানিও তাহারই অন্যতম। কিন্তু ইহাতে আমূল তত্ত্বের আলোচনায় ও ভূয়োদর্শনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। গ্রন্থকার অনেক প্রচ্ছন্ন ও দুরূহ শাস্ত্রীয় তথ্যের আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গলায় জাতিভেদের তীব্রতা নাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে প্রধানতঃ নাপিত জাতিরই ইতিহাস বর্ণিত হইযাছে। নাপিত-বামুন এক নিদান-সম্ভূত ইহাই গ্রন্থকার সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সুতরাং বিষয়টি কিরূপ গুরুতর ও দায়িত্ব-পূর্ণ তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা গ্রন্থকারের সহিত সর্ব্বাংশে একমত হইতে না পারিলেও পুস্তকখানি পাঠ করিবার জন্য সকলকেই অনুরোধ করিতেছি। হিন্দু সমাজে জাতিভেদের উপকারিতা ও অপকারিতা কি তাহাও গ্রন্থকার একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা পুস্তকের সূচনাতেই দেখাইযাছেন। বর্ত্তমান যুগের এই নব জাগরণের দিনে ক্ষত বিক্ষত হিন্দু সমাজ সংস্কৃত ও পরস্পর মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, সুতরাং পুস্তকখানা সময়োচিত হইয়াছে। ভাষা অতি সরল ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। কালমাহাত্ম্যে যাহাই হউক বৈদিক ও শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণাদির সাহায্যে গ্রন্থকার কৃতকার্য্যতার পথে অনেক দূর অগ্রসরও হইয়াছেন। আমরা গুণের পক্ষপাতী। গ্রন্থকার যেরূপ পাণ্ডিত্য, সহিষ্ণুতা ও গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বস্তুতঃই প্রশংসার পাত্র। তিনি বলেন ব্রাহ্মণের অধঃপতনই জাতিভেদের গৌণ কারণ। পুস্তকখানির দ্বারা নাপিত সমাজের বিশেষ উপকার হইবে। বর্ত্তমান সংস্করণে যে সকল সামান্য ভ্রম প্রমাদ রহিয়াছে, আশা করি গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধন করিতে পারিবেন। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রবাসী—"জাতিভেদ-রহস্য" ১ম খণ্ড। এই পুস্তকখানির অপর নাম,

"নাপিত-কুল-দর্পণ"—প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয় জানাইয়া দ্যায়। ইহাতে নাপিতের উৎপত্তি রহস্য ; ব্যাসদেব ও চন্দ্রগুপ্তের সহিত নাপিতের সম্বন্ধ, নাপিত সম্বন্ধে বল্লাল সেনের মত, চৈতন্যদেব ও মধুনাপিত, নাপিতের সাঙ্কর্য্য খণ্ডন, নাপিতের বর্ত্তমান অবস্থা, বিবিধ নাম ও তাহার ব্যাখ্যা, সংখ্যা ও শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় পাঁচ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ জাতি বিশেষের উৎকর্ষ প্রতিপাদক হইলেও জাতিতত্ত্বের অনেক তথ্য ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

কুশদহ—"জাতিভেদ-রহস্য বা নাপিত-কুল-দর্পণ"—নাপিত সম্প্রদায়ের জাতি সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ইহাই প্রথম চেষ্টা বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে বিস্তারিত ভাবে নাপিত জাতির উৎপত্তি, বর্ণনির্ণয় এবং বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান সমাজে স্থান নির্দ্দেশ প্রভৃতি বেদসংহিতাদি হইতে উদ্ধৃত ও প্রমাণসহ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিশেষ দক্ষতার সহিত বিষয় ও প্রমাণগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার নহে। অবস্থা বৈগুণ্যে হীন ব্যবসায় অবলম্বন করিলেও নাপিতের উৎপত্তি ও বৃত্তি যে উচ্চতর ছিল তাহা তিনি সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে হিন্দুসমাজের অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহা নাপিত সমাজকে আত্মোন্নতির প্রবৃত্তি দান করিবে এবং আত্মসম্মানের ভাব জাগাইয়া তুলিবে। নাপিত সমাজ এজন্য গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রন্থকার সাধারণেরও কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। তিনি বহু পরিশ্রমে সাধারণের অজ্ঞাত তথ্য সংগ্রহ করিয়া হিন্দুসমাজ ও জাতি-তাত্ত্বিকগণের এবং ভবিষ্যৎ অভিধানকারগণের ভাবিবার মত অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকের ভাষা সংযত ও সুখপাঠ্য।

"মন্দারমালা"—সম্পাদক, "জাতিতত্ত্ব-বারিধি"-প্রণেতা বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন—

"আমরা নাপিত জাতিকে একটী উচ্চজাতি বলিয়াই অবগত। কাল-মাহাত্ম্যে যাহাই হউক, হিন্দু রাজত্বে প্রকৃত আর্য্যযুগে মহোচ্চ ব্রাহ্মণগণও দাস, নাপিত ও সগোপ প্রভৃতির অন্নভোজন করিতেন। এই জাতির মত বুদ্ধিমান ও কৃতজ্ঞ জাতি জগতে অতি বিরল। ইহাদের বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্য সন্দর্শনে ইহাদিগকে কিছুতেই হীনপ্রভব বলিয়া মনে হয় না। ... ... এই গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও বিষয় সকল সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। গ্রন্থকারের গভীর গবেষণা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। প্রত্যেক সাহিত্যসেবী ব্যক্তিরই এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত।

সুবক্তা, সর্ব্বজনপ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ ভাগবতরত্ন বি, এ, মহোদয় বলেন :—"জাতিভেদ-রহস্য বা নাপিত-কুল-দর্পণ" গ্রন্থের প্রথমভাগ পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। বৃহৎ ও প্রাচীন হিন্দু সমাজের অতীত ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন, জাতিবিশেষের ইতিহাস আলোচনায় অপর জাতীয় লোক অনেক সময়েই বিদ্বেষবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া অনেক কল্পিত ও ভ্রান্তমত প্রচার করিয়াছেন, এইরূপ ঘটনা যে কেবল সেকালে হইয়াছে তাহা নহে, একালেও তাহা যথেষ্ট পরিমাণ হইতেছে। আমরা বিচ্ছিন্নতার দ্বারা পীড়িত, আমরা একতার জন্য আকুল, সুতরাং এ সময়েও যাঁহারা জাতি বিশেষকে হীন বলিয়া সপ্রমাণ করিবার জন্য কল্পিত ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদের হস্ত হইতে যিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, তিনি কেবল বর্ণবিশেষের নহে, আমাদের সকলেরই বন্ধু। এই গ্রন্থে

গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অনেক লেখক এই নাপিত জাতিকে হীন বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকার এই সমস্ত লেখকের অসার যুক্তি খণ্ডন করিয়া শাস্ত্র ও ইতিহাসের সাহায্যে নাপিত জাতির প্রকৃত বিবরণ জন-সমাজে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

এই নাপিত জাতি চিরকাল যাবতীয় শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকর্ম্মে ব্রাহ্মণদিগকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত হিন্দু সমাজের বেদবিহিত কোন ক্রিয়াই সমাধা হয় না। তাঁহাদিগকে যদি হীন বলিয়া বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়।

প্রত্যেক জাতি স্বকীয় অতীত গৌরব অবগত হইয়া অন্য জাতির সহিত প্রকৃত মৈত্রীয় সম্বন্ধ অক্ষুন্নভাবে রক্ষা করিয়া এ কালের উপযোগী উন্নতিপথে অগ্রসর হউন। এই গ্রন্থখানি নাপিত জাতির মধ্যে এই নবজীবনের উদ্দীপন আনয়ন করুক, এই গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থখানি অন্যান্য সকলেও মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করুন, হিন্দুসমাজের অনেক গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। এই গ্রন্থে যে কেবল নাপিত জাতির ইতিহাসই আলোচনা করা হইয়াছে তাহা নহে। হিন্দু সমাজ, বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ বিষয়েও বহু শাস্ত্রবাক্যের সাহায্যে সুন্দর যুক্তির সহিত আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থপাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রমে এই গ্রন্থ রচনা করিয়া সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

কাশিমবাজারাধিপতি স্বনামধন্য, বিদ্যোৎসাহী মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বলেন :—

"জাতিভেদ-রহস্য ও নাপিত-কুল-দর্পণ" পুস্তকখানির লিখিত বিষয়ের মর্ম্ম আলোচনা করা হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাপ্রাপ্ত জনগণ

সকলেই যে স্ব স্ব জাতির তথ্যালোচনার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, ইহা ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য। লেখকের সংস্কৃত শাস্ত্রের তথ্যানুসন্ধানে সবিশেষ উৎসাহ আছে। গ্রন্থখানিতে নাপিত জাতির বহুতর তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া আমি সুখী হইলাম। চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝিয়া স্ব স্ব জাতির উন্নতি করিলে বিশেষ সুখী হওয়া যাইবে।

কলিকাতার প্রবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দেবশর্ম্মা তর্ক চূড়ামণি, কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ মহাশয় বলেন—

"জাতিভেদ-রহস্য" পুস্তকখানি পাঠে আশাতীত প্রীতিলাভ করিয়াছি। পুস্তকখানি যে এত মূল্যবান হইবে, ইহা সংগ্রহ-কর্ত্তাও মনে স্থান দিতে না পারিয়া নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই। পুস্তকখানি পড়িতে প্রথমেই বোধ হয় যেন ব্রাহ্মণকে গালি দিবার জন্যই গ্রন্থকার লেখনি ধরিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ এবং পুস্তকখানি গবেষণাপূর্ণ। গ্রন্থকর্ত্তাকে ভূয়োভূয়ো আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ দিতেছি যে তিনি মূল্যবান এবং দুর্জ্ঞেয় বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া সুললিত বঙ্গ ভাষায় জাতিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানি জাতি তত্ত্বের ভিত্তিস্বরূপ। বিশেষতঃ ইহাতে নাপিত জাতির নিদান নির্ণীত হওয়ায়, জাতিতত্ত্বান্বেষী সাহিত্যিকগণকে ও নাপিত সমাজের সকলকেই ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পুস্তকের ১৬৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার প্রাণের আবেগে যে কয়টী কথা বলিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার হৃদয় ও উদ্দেশ্য মোটামুটি বুঝা যাইবে। যথা—

হায় রে, হতভাগ্য নাপিত!

ফুলমালা-ভূষিত

চন্দন-চর্চ্চিত

ব্রাহ্মণ-পূজিত
আজিও ভবে !
শুধু দেখি অবিচার
তমঃ আর ব্যভিচার
ধরিয়াছে শাস্ত্রকার
আলোকে তাই অন্ধকার
দেখিছে সবে !!

নদীয়া—গোস্বামী দুর্গাপুর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আদ্যনাথ শর্ম্মা বিদ্যাভূষণ কাব্যতীর্থ মহাশয় বলেন—

জাতিভেদ-রহস্য নামক পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। গ্রন্থকার মহাশয়ের অধ্যাবসায় ও গবেষণা প্রশংসনীয়। আশা করি এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থকার অধিকতর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবেন। উল্লিখিত পুস্তকে নাপিত জাতির উৎপত্তি বিষয়ে শাস্ত্রকারদিগের যে অসামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বিচার্য্য। বস্তুতঃ নাপিত জাতিকে যতই কেন হীন মনে করা যাউক না, উহারা প্রকৃত পক্ষে ততটা হীন নহে। দ্বিজ-পদবাচ্য জাতির উপনয়ন, বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যে উক্ত জাতির প্রধান সহায়তা দৃষ্ট হওয়ায় উক্ত জাতি দ্বিজকুলের সমসাময়িক বলিয়াই প্রতীতি হয়। দ্বিজকুলের সমকালীন যদি বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাপিত বর্ণসঙ্কর হইল কিরূপে এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। দ্বিজ-উপনয়ন সংস্কার কালে নাপিতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উপনয়ন সংস্কার যখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে নাপিতও তখনই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে—ইহা যুক্তির অনুরোধে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নাপিত ভিন্ন অন্যজাতি নাপিত পদবাচ্য নহে এবং উহাদের বৃত্তিও কেহই আশ্রয় করেন নাই। লোম-নখাদি-

বপন-কার্য্য হীন বলিয়া লোকের প্রতীতি হওয়ায়, অনেকে উহাদিগকে ঘৃণিত বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু অদ্যাপি "জল আচরণীয়" হিন্দুজাতি মধ্যে নাপিতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। মুসলমান ও খৃষ্টান জাতি, রাজ-বংশীয় বলিয়া দণ্ডভয়ে উহারা ঐ দুইজাতির ক্ষৌর করিয়া আসিতেছে। বংশানুক্রমিক বৃত্তি যদি উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রধান বর্ণ দ্বিজগণের উপনয়ন, বিবাহাদি সংস্কার বিলুপ্ত হইবে। অতএব উক্ত জাতির অযথা অনাদর প্রকাশ না করিয়া যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রকাশ করাই সুধীজনের কর্ত্তব্য। আশ্রিত ও অনুগত জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে সমাজের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। ভিন্নরুচিসম্পন্ন মনুষ্য যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, আমার যাহা সদ্বিবেচনা হইল তাহাই প্রকাশ করিলাম।

কলিকাতা সেণ্ট্রাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক কথক-প্রবর শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ গোস্বামী তত্ত্বরত্ন, কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—

প্রিয় গ্রন্থকার মহাশয়,

আপনি "জাতিভেদ রহস্য" স্বজাতি-রহস্যে উদ্ঘাটন করিতে যে প্রকার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন ও যে সকল যুক্তিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন বাস্তবিকই এ সকল আপনার বহু গবেষণার ফল। একটু ভাবিয়া দেখিলে আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। কিন্তু বঙ্গীয় নাপিত জাতি ব্রাহ্মণের পাশে সহচররূপে থাকিয়া বঙ্গের সকল জাতির নিকট পরিচিত হইয়া আসিতেছে। অতএব সিদ্ধ জাতির জন্য এতটা শ্রম কেন? তবে যাঁহারা এ জাতিকে অন্য চক্ষে দর্শন করেন, তাঁহারা এ গ্রন্থ পাঠ করিলে ভিতরকার রহস্য অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। ইতি—

কাশিমবাজার রাজ-সভার সভাপণ্ডিত অশেষ গুণালঙ্কৃত, কবিরত্ন, বাচস্পতি, ভাগবত-ভূষণ উপাধি-সমন্বিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"জাতিভেদ রহস্য ও নাপিত-কুল-দর্পণ" নামধেয় গ্রন্থ খানি আমি আদ্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকারের নাম প্রকাশ না থাকিলেও তাঁহাকে আমি বহু বহু ধন্যবাদ প্রদান করি। "উগ্র-ক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি" ও "মাহিষ্য বিস্তৃতি" প্রভৃতি জাতি-তত্ত্ব মূলক অনেক অনেক গ্রন্থই দেখিয়াছি, কিন্তু এখানিতে যেমন আমূল তথ্যানুসন্ধান এবং ভূয়োদর্শন পরিলক্ষিত হইল, এরূপ কোনও পুস্তকে লক্ষিত হয় নাই! এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, তিনি বর্ত্তমান উপবীত-বিভ্রাটের যুগেও সে দিকে শ্রদ্ধালু নহেন। গ্রন্থের প্রায় সমস্ত তথ্যই শাস্ত্রীয় প্রমাণমূলক হইয়াছে, যে ২।৪টা স্থলে তাহা লক্ষিত হয় নাই, লেখকের যেরূপ অসামান্য উদ্যম, তাহাতে সে সকলও যে সংগৃহীত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। শ্রীশ্রীভগবান লেখকের মনোরথ সফল করুন। ইত্যলং বাহুল্যেন।

"ভূ-প্রদক্ষিণ" প্রণেতা, স্বনাম-ধন্য ব্যারিষ্টার ও প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহোদয় লিখিয়াছেন—

জাতিভেদ সম্বন্ধে আমার মত স্বতন্ত্র, আমি দেশ ভেদে জাতিভেদ বিদ্যমান, ইহা স্বীকার করি। আধুনিক জাতিভেদ প্রথা যে হিন্দুসমাজের একটা জুলুম ও জবরদস্তি এবং তদ্বারা যে ভারতের ভীষণ অনিষ্ট হইতেছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ এতকাল আপনা-দিগকে "ছোট" বলিয়া ভাবিয়া আসার দরুণ তাঁহারা তদ্রূপ ভাবনা বশতঃ বাস্তবিক যেন "ছোট" হইয়াই পড়িয়াছেন। পুরুষানুক্রমে "আমি ছোট" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমাকে প্রকৃতই ছোট হইতে হইবে, ইহা যেমন

অনিবার্য্য স্বাভাবিক নিয়ম, আবার তেমনি "আমি বড়" এই
দ্বারাও আমরা উন্নত হইতে পারি। এই জন্য আবার বলি, নাপিতের ন্যায় নবশায়কদের চেষ্টা সাধু, আর কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন ইহাতে আমি দুঃখিত, আমি তাহাদের উপদেশ দেই, একেবারে ব্রাহ্মণ হইবার উদ্যোগ করিতে। কারণ কায়স্থজাতির মধ্যে এমন বিস্তর লোক আছেন, যাঁহারা আধুনিক বহু ব্রাহ্মণ হইতে কোন অংশে বিদ্যা, বুদ্ধি, আচার, মহত্ত্ব প্রভৃতি সদ্গুণে কম নন, বরং কোথাও কোথাও এক কাঠি সরেশই দেখা যায়।

এই পুস্তকে নাপিতগণ নিজেদের দ্বিজত্ব প্রমাণ করিতে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে আজকাল অনেকে বিশেষ উন্নত হইয়াছেন, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থগণ সে সকল লোককে সহজে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং সমাজ এই জাতিকে আর ছুঁড়িয়া ফেলিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগকে হাত ধরিয়া তুলিতে আমরা বাধ্য। রাজপুতানা প্রভৃতি অনেক প্রদেশে আজও নাপিতগণ পাচকের কার্য্য করিয়া থাকেন। পৌরাণিকযুগেও দেখা যায় যে তাঁহারা বরাবর পাচকের কার্য্য করিয়াছেন। নাপিত, অর্দ্ধশিরা, গোপাল এই তিন জাতির প্রস্তুত অন্ন যে সমাজের উচ্চ নীচ সকলেই ব্যবহার করিতেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তারপর পৌরহিত্যের কার্য্য সম্বন্ধে নাপিতগণ যেরূপ অধিকার প্রাপ্ত ছিলেন, গ্রন্থকার বিশেষ গবেষণা দ্বারা তাহা সাব্যস্থ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। পাঠকগণ সে বিষয়ে অনুশীলন করিলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। এরূপক্ষেত্রে নাপিতগণকে আমরা অন্যান্য আর্য্য সন্তানের ন্যায় দ্বিজ বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি করিতে পারি না।